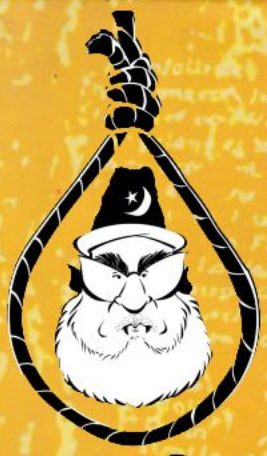

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই!

আমারবই.কম

চেতন ভগত'র

থ্রি মিসটেক্স অব মাই লাইফ

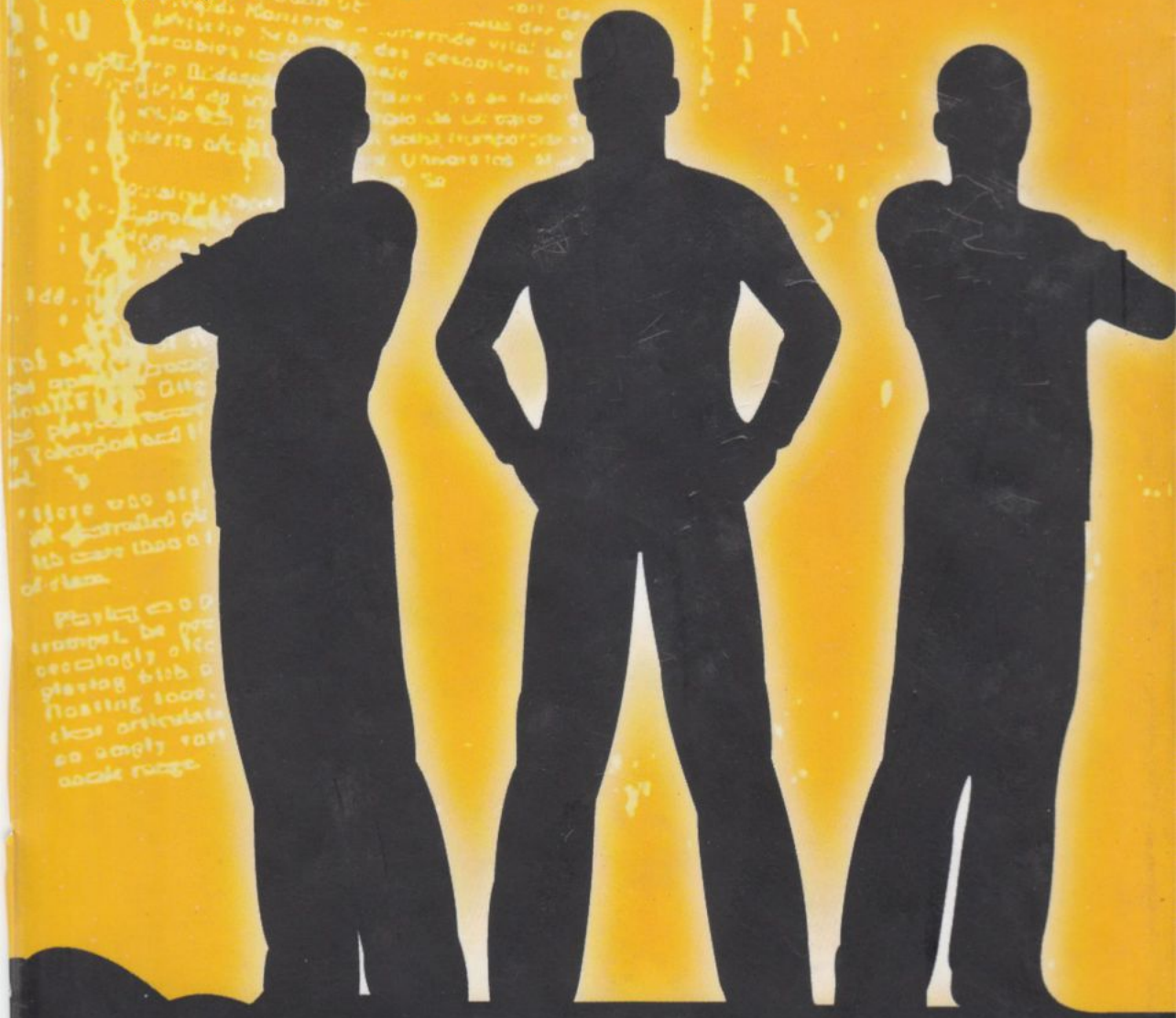

অনুবাদ : ইশতিয়াক আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

ভারতের ইংরেজিভাষী লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় চেতন ভগতের জন্ম নিউ দিল্লিতে। দিল্লি আর্মি পাবলিক স্কুল সমাপ্ত করে যোগ দেন দিল্লির IIT-তে, পরে আহমেদাবাদের IIM থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন তিনি। ২০০৪ সালে তার প্রথম উপন্যাস *ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান* প্রকাশ হলে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এরপর *ওয়ান নাইট অ্যাট দি কলসেন্টার* প্রচুর জনপ্রিয়তা পেলে সেটা নিয়ে মুম্বাইতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। তবে তার তৃতীয় উপন্যাস *থ্রি মিসটেক্স অব মাই লাইফ* রেকর্ডসংখ্যক চল্লিশ লাখ কপি বিক্রি হলে সবাই নড়েচড়ে বসে। রাতারাতি তিনি হয়ে ওঠেন ভারতের একজন সেলিব্রেটি।

মুম্বাইতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে এগারো বছর হংকংয়ে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার হিসেবে কাজ করেছেন চেতন ভগত। তার স্ত্রী আনুশা। ইশান এবং শ্যাম নামের দুটো জমজ সন্তান আছে তাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

মিসটেক্‌স অব মাই লাইফ

মাঝরাতে লেখকের কাছে অদ্ভুত এক ই-মেইল আসে—এক তরুণ আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন লেখক। সেই তরুণকে থামানোর জন্য উঠেপড়ে লাগেন তিনি। তারপর অসাধারণ এক কাহিনী জানতে পারেন সেই লেখক :

তিন বন্ধুর তিন রকমের অবসেশন—গণিত, ক্রিকেট আর ধর্ম! তাদের মাঝখানে এসে পড়ে বিস্ময়কর বালক আলী। তাকে ঘিরে স্বপ্ন, নিজেদের ব্যবসা, প্রেম আর ভারতের রাজনীতি জট পাকিয়ে তিন বন্ধুকে দাঁড় করায় কঠিন এক বাস্তবতায়। গুজরাটের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা এলোমেলো করে দেয় তাদের জীবন। তারপর...

সেই তিন বন্ধুর অসাধারণ এক কাহিনী *থ্রি মিসটেক্‌স অব মাই লাইফ*। সমগ্র ভারতে চল্লিশ লাখ কপিরও বেশি বিক্রি হওয়া এই উপন্যাসটি বাংলাভাষাভাষী পাঠকের জন্য অনুবাদ করা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

থ্রি মিসটেক্স
অব
মাই লাইফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

চেতন ভগত'র

থ্রি মিসটেক্‌স অব মাই লাইফ

অনুবাদ : ইশতিয়াক আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ : ইশান
এবং
শ্যাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাককথন

কান এক শনিবার সকালবেলা। তেমন ঘটনা রোজ রোজ ঘটে না। কম্পিউটারের ামনে বসতেই নিচের ই-মেইলটি পাওয়া গেল :

প্রেরক : Ahd_businessman@gmail.com
তারিখ : ১২/২৮/২০০৫ রাত ১১:৪০
প্রাপক : info@chetanbhagat.com
বিষয় : শেষ চিঠি

প্রিয় চেতন,
এই ই-মেইলটা একইসাথে আত্মহত্যার স্মারক এবং স্বীকারোক্তিপত্র। মানুষ আমার ব্যাপারে হতাশ, আমার আর বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। আপনি আমাকে চেনেন না। আহমেদাবাদের সাধারণ এক ছেলে আমি, যে কিনা আপনার বইয়ের একজন পাঠক। সেই সূত্রে আপনার কাছে চিঠি লেখাটা সঙ্গত হবে বলেই মনে হল। কোন মানুষের কাছেই বলতে পারছি না নিজেকে নিয়ে আমি যা করছি। সেটা হল, এই চিঠির একটা ক'রে বাক্য শেষ হবে আর একটা ক'রে ঘুমের বড়ি আমার মুখে ঢুকবে—ভাবলাম কথাটা আপনাকেই বলি।

AMARBOI.COM

কফির কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলাম। গুণে দেখি এরই মধ্যে পাঁচটা ফুলস্টপ পেরিয়ে ফেলেছি।

তিনটা ভুল আমি করেছি; সেগুলোর বিস্তারিত এখানে বলছি না।
আমার আত্মহত্যা কোন আবেগঘন সিদ্ধান্ত নয়। ভাল ব্যবসায়ী হিসেবে অনেকের কাছেই আমি পরিচিত কারণ আমার মাঝে আবেগ খুবই কম। কথার কথা নয় এটা। এক একটা দিন ইশের নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে তিনটা বছর কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু গতকাল সে আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার পরে এই সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় আমার সামনে আর খোলা ছিল না।
তবে কোন অনুশোচনা নেই আমার। হয়ত আমি বিদ্যার সাথে আরও একবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে চাইতাম কিন্তু এই মুহূর্তে সেটাকেও তেমন ভাল কিছু মনে হচ্ছে না।

আপনাকে জ্বালাতন করার জন্য দুঃখিত। তবু মনে হল কারো কাছে কথাগুলো বলা দরকার। লেখক হিসেবে নিজের মান আরও বাড়ানোর সুযোগ আপনার আছে যদিও উপযুক্ত মানের বইয়েরই লেখক আপনি। আপনার সপ্তাহান্ত সময়টা শুভ হোক।

শ্রদ্ধাসহ
জনৈক ব্যবসায়ী

১৭, ১৮ এরপর ১৯। তার মানে দাঁড়াল আহমেদাবাদের তরুণ 'সাধারণ' এক ছেলে আমার কাছে এই মেইলটা লেখার সময় উনিশটা ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলেছে। তারপর আমার সপ্তাহান্ত সময়টা যেন ভালমত যায় সেই শুভ কামনাও রেখেছে সে। গলার ভিতর দিয়ে কফি ঢুকছে না আমার। ঠাণ্ডা ঘামে শরীর ভিজে যাচ্ছে।

"নাম্বার এক, ঘুম থেকে উঠবে দেরিতে। নাম্বার দুই, সকালে পয়লা কাজ হচ্ছে কম্পিউটারের সামনে গেঁথে বসে থাকবে। পরিবার পরিজন বলে যে কিছু রয়েছে সেই খেয়াল কি তোমার আছে?" আনুশার গলা। কথার ওজন শুনে যদি বোঝা না যায় তাহলে বলে রাখি, আনুশা আমার স্ত্রী।

তার সাথে ঘরের আসবাবপত্র কিনতে যাওয়ার কথা আমার–দশ সপ্তাহ আগে কথা দিয়েছিলাম তাকে।

কফির মগটা আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে চেয়ারের পেছনে টোকা দিয়ে সে বলল, "ডাইনিং চেয়ার দরকার। কী ব্যাপার, চিন্তিত নাকি?"

মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করলাম তাকে।

"জনৈক ব্যবসায়ী?" পুরো মেইলটা পড়ে বলল সে। দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তাকেও ভালমত নাড়া দিয়েছে।

"আহমেদাবাদ থেকে এসেছে, এরচে বেশি কিছু জানি না," বললাম আমি। "তুমি নিশ্চিত এটা বাস্তব?" গলাটা কেঁপে গেল তার। "স্পাম মেইল তো নয়। আমার ঠিকানাতেই পাঠানো হয়েছে।"

আমার স্ত্রী একটা টুল টেনে বসল। বুঝতে পারলাম লেখালেখি করার জন্য আমাদের আরও চেয়ার আসলেই দরকার।

"ভেবে দ্যাখ। কাউকে ব্যাপারটা জানানো আমাদের দায়িত্ব। তার বাবা মাকে জানানো যায়।"

"কীভাবে? কোন্ জায়গা থেকে যে এল তাও তো আমি জানি না। আহমেদাবাদে কাকেই বা চিনি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাদের দেখা হয়েছিল সে তো আহমেদাবাদেই, মনে পড়ে?" আনুশা বলল।

তার কথায় কোন যুক্তি আছে ব'লে মনে হল না। হুম, আই.আই.এম-এ'তে কয়েক বছর আগে আমরা একই ক্লাসে পড়তাম। "তো?"

"ইনস্টিটিউটে ফোন ক'রে দ্যাখ। প্রফেসর বসন্ত বা অন্য কাউকে।" দীর্ঘশ্বাস টেনে কথাটা বলে ঘর ছেড়ে গেল সে। "আরে আরে, ডাল দেখি পুড়ে যাচ্ছে।" নিজের চাইতে স্মার্ট বউ পাওয়ার অনেক সুবিধা আছে। রহস্য গোয়েন্দা হওয়া আমার কাজ নয়।

ইন্টারনেট ঘেঁটে ইনস্টিটিউটের নাম্বার বের ক'রে ফোন করলাম। অপারেটর প্রফেসর বসন্তের বাড়িতে লাইন ধরিয়ে দিল। সময় দেখে নিলাম, সিঙ্গাপুরে সকাল ১০টা আর ভারতে সকাল সাড়ে সাতটা। সাত সকালে কোন প্রফেসরকে ঝামেলায় ফেলা ঠিক না।

"হ্যালো?" ঘুম জড়ানো গলায় কেউ বলল। প্রফেসরই হবেন।

"প্রফেসর বসন্ত। চেতন ভগত বলছি, আপনার পুরনো ছাত্র, চিনতে পেরেছেন?"

"কে?" গলা শুনে মনে হল বিন্দুমাত্র কৌতুহলও তিনি বোধ করছেন না। জমল না শুরুটা।

তিনি আমাদের কোন কোর্সটা নিয়েছিলেন বললাম। ক্যাম্পাসে যে তাকে আমরা সবচাইতে বান্ধব প্রফেসর নির্বাচিত করেছিলাম সে কথাও বললাম। এত তোষামোদেও কোন কাজ হল না।

"ওহ্, চেতন ভগত," মনে হল স্বল্পমাত্র চেতন ভগতকে চেনেন তিনি। "তুমি এখন লেখক, তাই না?"

"আজ্ঞে স্যার, আমিই সেই লোক।"

"তো বইপত্র লেখালেখি শুরু করলে, কারণ কী?"

"কঠিন প্রশ্ন, স্যার," আমতা আমতা করা শুরু করলাম।

"ঠিক আছে সহজ প্রশ্নই করি। শনিবার দিন এত সকালে ফোন করার কী কারণ?"

ব্যাপারটা তাকে জানিয়ে মেইলটা ফরোয়ার্ড ক'রে দিলাম।

"কোন নাম তো নেই হে বাপু, হুঁ?" মেইল পড়ে বললেন তিনি।

"আহমেদাবাদের কাছে কোন হাসপাতালে মাত্র ভর্তি হয়ে সেখানেই আছে হয়ত। এতক্ষণে হয়ত মরেও গিয়েছে। আর নয়তো সে বাড়িতেই আছে। পুরো ব্যাপারটাই একটা ধাপ্পা," আমি বললাম।

বেশি কথা বলে ফেলছি আমি। আসলে তার কাছ থেকে সাহায্য চাচ্ছিলাম–ওই ছেলেটা আর আমার উভয়ের জন্য। প্রফেসর প্রশ্নটা ভালই করেছিলেন। বইপত্র লেখালেখি করি কেন আমি–এই সব উটকো ঝামেলায় জড়ানোর জন্য?

"হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পরে," প্রফেসর বললেন। "কিছু ছাত্রকে দায়িত্ব দিয়ে দিব। কিন্তু নামটা পাওয়া গেলে কাজে দিত। আচ্ছা দাঁড়াও, ছেলেটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিমেইল অ্যাকাউন্ট আছে। অরকাটেও তাকে পাওয়া যাবে হয়ত।"

"অর...কী বললেন?" নিজের চাইতে বেশি স্মার্ট লোকের সাথে কথা বলতে গেলে জীবনটা কঠিনই হয়ে যায়।

"হাল আমলের খোঁজ-খবর তুমি খুব একটা রাখ না, চেতন। *অরকাট* একটি নেটওয়ার্কিং সাইট। জিমেইল ইউজাররা সেখানে সাইন-আপ করে। সে যদি সেখানকার সদস্য হয়ে থাকে তাহলে ভাগ্য ভাল হলে আমরা তার প্রোফাইল চেক ক'রে দেখতে পারব।"

তার টাইপের শব্দ শুনতে পেলাম। নিজের পিসির সামনে বসে পড়লাম আমিও। অরকাট সাইটে ঢুকেছি সেই সময়ে প্রফেসর বসন্তের গলা শুনতে পেলাম আবার। "আহা, আহমেদাবাদের ব্যবসায়ী। সংক্ষিপ্ত একটা প্রোফাইল আছে এখানে। নাম লেখা আছে শুধু জি.প্যাটেল। আগ্রহের বিষয় ক্রিকেট, ব্যবসা, গণিত আর বন্ধু-বান্ধব। মনে হচ্ছে না *অরকাট* খুব একটা ব্যবহার করে।"

"প্রফেসর বসন্ত, এগুলো কী বলছেন? আজ সকালে ঘুম ভেঙে এই সুইসাইড নোটটা পেলাম, একেবারে আমাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে। তার শখের জিনিস কী কী সেই কথা শোনাচ্ছেন আমাকে! আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন, নাকি..."

একটা বিরতি, তারপর, "কিছু ছাত্রকে বলব আমি। জি. প্যাটেল। যুবা বয়স। অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি খেয়েছে। এমন কোন নতুন রোগী এসেছে কিনা সেটা খুঁজে বের করাই হবে তাদের কাজ। তেমন কিছু পেলে ফোনে জানিয়ে দিব, ঠিক আছে?"

"আচ্ছা স্যার।" দীর্ঘ সময় পরে ঠিকমত নিঃশ্বাস নিতে পারলাম আমি।

"আর আনুশা কেমন আছে? দু'জনে তো আমার ক্লাস পালাতে অভিসারে যাওয়ার জন্য। তারপর ঠিকই এখন আমাকে ভুলে গিয়েছ।"

"ভাল আছে, স্যার।"

"ভাল, আমার সবসময়ই মনে হতো সে তোমার চাইতে বেশি স্মার্ট। যাই হোক, ওই ছেলেটাকে খোঁজ করাই এখন আমাদের কাজ।" টেলিফোন রেখে দিলেন তিনি।

আসবাবপত্র কেনা ছাড়াও অফিসের একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কাজ আছে আমার। আমার এবং মিচেলের বস্ নিউইয়র্ক থেকে আসবেন। তাকে খুশি করানোর জন্য মিচেল আমাকে গ্রুপের একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে বলেছে। পঞ্চাশটা চার্ট থাকতে হবে তাতে। পরপর গত তিনরাত একটা পর্যন্ত কাজ করেও মাত্র অর্ধেক এগুতে পেরেছি।

"একটা পরামর্শ দিচ্ছি তোমাকে। ভুল বোঝার দরকার নেই। স্নানটা একবার সেরে নিলে হয় না," আমার স্ত্রী বলল।

তার দিকে তাকালাম।

"একটা অপশন দিলাম মাত্র," সে বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় মাঝে মাঝে সে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে পড়ে। গীবত করার অভ্যেস আমার নেই।

"হ্যা হ্যা, হয়। সারব দাঁড়াও," বলে আবার কম্পিউটারের দিকে চোখ ফেরালাম।

নানা রকম চিন্তা কিলবিল করছে মাথায়। হাসপাতালে কি নিজেই ফোন করব? আমার সাথে কথা বলার পরে প্রফেসর বসন্ত আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা তাই বা কে জানে, তখন কী হবে? যদি তিনি এই কাজে ছাত্র জোগাড় করতে না পারেন? যদি জি. প্যাটেল মারা গিয়ে থাকে? আর আমি নিজেই বা কেন এতসব ঝামেলায় জড়াচ্ছি?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্নানটা সেরে নিলাম। অফিসের প্রেজেন্টেশনটা খুললাম বটে তবে একটা শব্দও টাইপ করার ক্ষমতা আমার নেই।

সকালের জলখাবারটা বাদ দিয়ে দিলাম, কিন্তু পরে গিয়ে বিপত্তিটা টের পেলাম–ক্ষুধা আর চিন্তা একসাথে থাকলে ঠিকমত চলে না।

দুপুর ১টা বেজে ৩৩ মিনিট। আমার ফোনটা বেজে উঠল।

"হ্যালো," নির্ঘাত প্রফেসর বসন্তের গলা। "সিভিল হাসপাতালে একজনকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। নাম গোবিন্দ প্যাটেল, পঁচিশ বছর বয়স। আমার সেকেন্ড ইয়ারের এক ছাত্র তাকে খুঁজে পেয়েছে।"

"তারপর?"

"সে বেঁচেই আছে। তবে কথা বলতে নারাজ। এমনকি পরিবারের সাথেও না। প্রচণ্ড কোন মানসিক আঘাত পেয়েছে মনে হয়।"

"ডাক্তারদের কী বক্তব্য?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কিছুই না। সরকারী হাসপাতাল। বুঝোই তো। যাহোক, পাকস্থলি ওয়াশ ক'রে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। এখন এটা নিয়ে বেশি আর মাথা ঘামাতে চাই না। সন্ধ্যেবেলা আরেকবার দেখার জন্য এক ছাত্রকে বলব।"

"কিন্তু তার কাহিনীটা কী? কী হয়েছে?"

"কিচ্ছু জানি না। একটা ব্যাপার শুনে রাখ। এসব ব্যাপারে এত জড়াতে যাবে না। ইন্ডিয়া বড় দেশ। সারাক্ষণই এসব ঘটনা ঘটে। যত ঘাঁটবে পুলিশের হাতে হেনস্থা হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়বে।"

তারপর সিভিল হাসপাতালে ফোন লাগালাম। ওখানকার অপারেটর এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। ওয়ার্ডে যে লাইন লাগিয়ে দিবে সে সুযোগও ওখানে নেই।

ছেলেটা নিরাপদে আছে জেনে আনুশাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারপর সারাদিনে তার যে পরিকল্পনা, সেই ঘোষনা শুনিয়ে দিল সে–ডাইনিং চেয়ার অনুসন্ধান। আলেক্সান্দ্রা রোডের আইকি থেকে তার শুরু।

তিনটার দিকে আইকিতে গিয়ে পৌছলাম। জায়গা কম লাগবে এরকম ডাইনিং সেটগুলো খোঁজা শুরু করে দিলাম আমরা। একটা ডাইনিং টেবিল পাওয়া গেল–চার ভাঁজ করে সেটাকে কফি টেবিল বানানো যায়। ভালোই মানাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিড়বিড় ক'রে বললাম, "পঁচিশ বছর বয়সী ব্যবসায়ী লোকটার কী হল জানা দরকার।"

"আগে সুস্থ হয়ে উঠুক। তখন ঠিকই তাকে খুঁজে পাবে। যুবক বয়সের কোন উন্মাদনার কারণেই এসব ক'রে থাকবে–হয়ত প্রেমে প্রত্যাখ্যান, পরীক্ষায় কম নম্বর বা মাদক–কিছু একটা হবে।" কিছু বললাম না আমি। "মাত্র ইমেইল করেছে সে তোমাকে। তোমার বইয়ের প্রচ্ছদেই তো আইডি আছে। আসলেই তোমার এসব ব্যাপারে জড়ানোর দরকার নেই। আমরা কিনব কয়টা–ছয়টা নাকি আটটা?" ওক কাঠের তৈরী একটা সেটের দিকে এগিয়ে গেল সে।

বাধা দিলাম আমি। একসাথে এত মেহমান আমাদের বাড়িতে খুব কমই আসে। ছয়টা চেয়ারই যথেষ্ট।

"দুটো চেয়ারের প্রান্তিক উপযোগ শতকরা দশ ভাগেরও কম হবে," আমি বললাম।

"তোমরা পুরুষেরা, তোমাদের কাছ থেকে সহযোগিতা কমই পাওয়া যায়," মাথাটা পেছন দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল সে। তারপর ছয়টা চেয়ারই বেছে নিল।

আবারও সেই ব্যবসায়ীর কথা ভাবতে শুরু করলাম আমি।

হ্যা, সবাই ঠিক কথাই বলছে। আমার জড়ানো উচিৎ না। তারপরও কথা থাকে। দুনিয়ায় এত লোক থাকতে শুধু আমাকেই সে কথাগুলো লিখে পাঠিয়েছে। নিজেকে না জড়িয়ে পারলাম না তাই।

আইকির পাশের ফুডকোর্টে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম আমরা।

"এবার আমাকে যেতে হবে," চলমন রাইস খেতে খেতে স্ত্রীকে বললাম। "কোথায়? অফিসে? ঠিক আছে, তুমি এখন মুক্ত। আমার কেনাকাটাও শেষ," আমার স্ত্রী বলল।

"না, আমি আহমেদাবাদে যেতে চাই। গোবিন্দ প্যাটেলের সাথে সাক্ষাত করতে।" তার চোখের দিকে তাকালাম না। আমার কথাবার্তা হয়ত পাগলাটে শোনাচ্ছে।

"তুমি কি পাগল?"

আমার ধারণা শুধু আমাদের প্রজন্মেই ইন্ডিয়ান মহিলারা স্বামীদের মুখের উপরে কথা বলা শুরু করেছে।

"আমার মন ওখানেই পড়ে আছে," বললাম।

"তোমার প্রেজেন্টেশনের কী খবর? মিচেল তোমাকে মেরে ফেলবে।"

"জানি। বসের মন না পেলে তার পদোন্নতি হবে না।" আমার স্ত্রী আমার দিকে তাকাল। চেহারা দেখে আমার গোঁ বুঝে ফেলল। সে জানে ছেলেটার সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি স্বাভাবিক হতে পারব না।

"আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে একটা মাত্র সরাসরি ফ্লাইট আছে। সন্ধ্যে ছ'টায়। দেখো টিকিট পাও কি না।" সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে ডায়াল ক'রে ফোনটা আমার হাতে দিল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নার্সরা আমাকে সেই কামরায় নিয়ে গেল। রহস্যজনক নীরবতা আর অন্ধকার বিরাজ করছে সেখানে। আমার পায়ের আওয়াজ জোরে জোরে শোনা যাচ্ছে। দশটা আলাদা যন্ত্র বিপ্ বিপ্ শব্দ ক'রে চলেছে। একটু পরপর লাল বাতি জ্বলে উঠছে। যন্ত্রপাতিগুলো থেকে বিভিন্ন তার বেরিয়ে এসে লোকটার গায়ে লাগানো রয়েছে। সেই লোকটা–হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে যাকে আমি দেখতে এসেছি–গোবিন্দ প্যাটেল।

প্রথমেই তার কোঁকড়ানো চুল চোখে পড়ল। গায়ের বর্ণ গমরঙা। ঘন লোমশ ভ্রু। ওষুধে ওষুধে পাতলা ঠোঁট দুটো শুকনো হয়ে এসেছে।

"হাই, আমি চেতন ভগত, যে লেখকটার কাছে আপনি লিখেছিলেন," আমি বললাম। নিশ্চিত ছিলাম না সে আমাকে চিনতে পারবে কি না।

"ও...কিভাবে...আমাকে খুঁজে পেলেন?" সে বলল। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তার।

"হয়ত ভাগ্য," আমি বললাম।

করমর্দন ক'রে বসে পড়লাম। তার মা রুমে এলেন। মনে হচ্ছে তারই ঘুমের দরকার বেশি, একটা ঘুমের ওষুধ তাকেও খাইয়ে দেওয়া যায়। নমস্কার জানালাম তাকে। চা আনার জন্য বাইরে চলে গেলেন তিনি।

ছেলেটার দিকে আবার তাকালাম। দুটো ইচ্ছে করছে আমার–এক, কী হয়েছে সেটা জিজ্ঞাসা করা, দুই, তাকে একটা থাপ্পড় মারা।

"ওভাবে আমার দিকে তাকাবেন না," বিছানায় পাশ ফিরে বলল সে, "আপনি নিশ্চয় রেগে আছেন। দুঃখিত, ঐ মেইলটা লেখা উচিৎ হয় নি আমার।"

"মেইলের কথা ভুলে যান। যেটা করেছেন, সেটা করাই আপনার উচিৎ হয় নি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। আমার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে তারপর অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাল।

"এতে বীরত্বের কিছুই নেই। কাপুরুষরাই বড়ি খায়।"

"আমার জায়গায় থাকলে আপনিও একই কাজ করতেন।"

"কেন? আপনার কী হয়েছে?"

"সেটা যাইহোক না কেন।" তার মা চা নিয়ে এলে আমরা চুপ ক'রে গেলাম। নার্স এসে তার মাকে বাড়ি চলে যেতে বলল। কিন্তু তিনি নারাজ। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার হস্তক্ষেপ করলে রাত ১১.৩০-এ তিনি চলে গেলেন। আমি রুমেই থেকে গেলাম। ডাক্তারকে কথা দিলাম শীঘ্রই চলে যাব। আমরা একলা হলে বললাম, "আপনার কাহিনীটা আমাকে বলেন।"

"কেন? আপনি কী করবেন? যা হয়েছে তাতো বদলাতে পারবেন না," ক্লান্ত কণ্ঠে বলল সে।

"অতীতকে পাল্টানোর জন্যই যে শুনতে হবে, তাতো না। কী হয়েছে সেটা শোনাও মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি একজন ব্যবসায়ী, লোকজন শুধু নিজ স্বার্থেই আমার সাথে লেনদেন করে। তাতে আপনার কী? আপনাকে বলে আমি সময় নষ্ট করব কেন?"

কোমল মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এর আড়ালেই এত কাঠিন্য লুকিয়ে আছে। "কারণ, আমি সেটা অন্যদেরও বলতে চাই; আমি বললাম।

"ওটাই আমার অনুপ্রেরণা ছিল। কিন্তু লোকজন তাতে গা করবে কেন? আমার কাহিনী IIT বা কল সেন্টারের মত ফ্যাশনেবল বা সেক্সি নয়।" বুকের উপর থেকে লেপটা সরিয়ে রাখল সে। হিটার এবং আমাদের কথোপকথনের কারণে রুমটা উষ্ণ হয়ে আছে।

"আমার মনে হয় তারা গা করবে," আমি বললাম, "এক তরুণ আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। সেটা ঠিক বলে মনে হয় না।"

"কেউ আমাকে পোঁছে না।"

চেষ্টা করেও ধৈর্য্য ধরাটা কঠিন বলে মনে হল। আবারও তাকে চড় মারার কথা ভাবলাম। "শোনেন," হাসপাতালে গলা যতটা জোরালো করা যায় সেভাবেই বললাম। "আপনার শেষ মেইলটা পাঠানোর জন্য আমাকেই বেঁছে নিয়েছিলেন। তার মানে কিছুটা হলেও আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন। আপনার ঠিকানা বের করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উড়াল দিয়ে এখানে চলে এসেছি। তারপরও বলছেন আমি গা করব কিনা? এই ধরনের ঔদ্ধত্য দেখানোই কি আপনার ব্যবসার অংশ? বন্ধুর মত কথা বলতে পারেন না আমার সাথে? বন্ধু কাকে বলে সেটাও কি জানেন না?" আমার জোরালো গলা শুনে রুমে উঁকি দিয়ে একটা নার্স এলে আমরা চুপ মেরে গেলাম। ঘড়িতে মাঝ রাত তখন। স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে সে। আজ সবাই তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করেছে। উঠে দাঁড়িয়ে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

"বন্ধু কি আমি জানি," শেষমেষ বলল সে। তার পাশে বসে পড়লাম। "বন্ধু কি তা ভাল করেই জানি। কারণ আমারও দুটো বন্ধু ছিল। দুনিয়ার মাঝে তারা সেরা।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১

ইন্ডিয়া বনাম সাউথ আফ্রিকা ৪র্থ ওয়ান ডে ম্যাচ,
ভাদোদরা
১৭ মার্চ, ২০০০
ওভার ৪৫

"শালা কী জন্যে আবার তোকে নড়তে হল?" টিভিতে স্টেডিয়ামের হৈ চৈ ছাড়িয়ে শোনা গেল ইশের কণ্ঠটা। মেঝে থেকে সোফায় এসে বসেছি আমি।

"হুহ্?" আমি বললাম। ইশানের বাড়িতে আছি আমরা–ইশান, অমি এবং আমি। ইশানের মা আমাদের জন্য চা আর খাকরা নিয়ে এসেছেন। "সোফায় বসে নাশতা খেতে বেশি আরাম লাগে। এজন্যই নড়ে বসলাম।"

"টেন্ডুলকার আউট হয়ে গেছে। ধুর, এরকম সময়ে তুমি, কোনো রকম নড়া চড়া করবি না। পরের পাঁচ ওভারে কেউ যেন না নড়ে।"

টিভির দিকে তাকালাম আমি। জেতার জন্য ২৮৩ লক্ষ্য নিয়ে এগুচ্ছিলাম আমরা। এক বল আগে ইন্ডিয়ার স্কোর ছিল পঁয়তাল্লিশ ওভার শেষে দুই উইকেটে ২৫৬। আট উইকেট বাকি আছে। পাঁচ ওভারে সাতাশ রান দরকার। ক্রিজে আছে টেন্ডুলকার। সহজ ব্যাপার। পরিস্থিতি এখনও ইন্ডিয়ার অনুকূলে। কিন্তু টেন্ডুলকার আউট হয়ে গেছে। সেই কারণেই ভাঁজ পড়েছে ইশানের কপালে।

"খাকরাগুলো মচমচে," অমি বললে ইশান তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। জাতীয় দুর্যোগের এই সময় তার চটুল আনন্দের জন্য ভর্ৎসনা দেখা গেল সেই দৃষ্টিতে। অমি এবং আমি চায়ের কাপ পাশে রেখে দিলাম। বিষন্ন দেখাচ্ছে আমাদের।

টেন্ডুলকার চলে যাবার সময় লোকজন হাত তালি দিচ্ছে। জাদেজা ক্রিজে এসে আরো ছয় রান যোগ করল। ছেচল্লিশ ওভার শেষ। ইন্ডিয়া তিন উইকেটে ২৬২। হাতে সাত উইকেট আছে। চার ওভারে জেতার জন্য আরো একুশ রান দরকার। ওভার ৪৬।

"১২২ করেছে সে। তার কাজ সে করে দিয়ে গেছে। আর মাত্র কয়েকটা শট মারতে পারলেই হল। এত উত্তেজিত কেন তুই?" বিরতির সময় বললাম। চায়ের কাপের জন্য হাত বাড়ালাম আমি। কিন্তু ইশান আমাকে হাত দিতে বারণ করল। ম্যাচের নিয়তি নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোন কিছুতে মাতব না। ইশান কোন কারণে আমাদের উপর খুব বিরক্ত। ম্যাচ চলছে ভাদোদরায়। আহমেদাবাদ থেকে মাত্র দু'ঘণ্টা দূরত্বে। তারপরও আমরা যেতে পারি নি–এক, কারণ আমাদের টাকা নেই, দুই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'দিন পরে আমার করেস্পন্ডেন্স পরীক্ষা। অবশ্য টিভিতে খেলা দেখেই সারাটা দিন মাটি করেছি। কাজেই দুই নম্বর কারণটাকে খুব জোরালো বলা যাবে না।

"ওভার প্রতি ৫.২৫ রান দরকার," আমি বললাম। গাণিতিক হিসেব না ক'রে আর পারলাম না। এই একটা কারণে আমি ক্রিকেট পছন্দ করি। এতে অনেক গাণিতিক হিসেব থাকে। "এই টিমটারে তোরা চিনিস না। টেন্ডুলকার চলে গেছে। এখন ভয় পেয়ে গেছে ওরা। গড় রানের ব্যাপার নয় এটা। এ যেন রাণী মৌমাছির মরে যাওয়া, এখন মৌচাকে কোন শৃঙ্খলা নেই," ইশান বললে অমি মাথা নেড়ে সায় দিল। ইশান ক্রিকেট নিয়ে যাই বলুক না কেন সে এভাবেই সায় দেয়।

"যাহোক, বোধহয় ম্যাচ দেখার জন্য আজ আমরা এখানে এক জায়গায় হই নি। মিঃ ইশান ভবিষ্যত জীবনে কী করবে সেটাই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ঠিক কি না?" আমি বললাম।

একবছর আগে এনডিএ থেকে পালিয়ে আসার পর থেকেই ইশান এই ব্যাপারটা এড়িয়ে যাচ্ছে। তারা বাবা ইতিমধ্যেই বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করেছে, "তোর নিষ্কর্মা জীবনের এক বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য আজ একটা কেক কাট।"

অবশ্য আজ আমার একটা পরিকল্পনা আছে। ইশানকে এক জায়গায় বসিয়ে আমাদের জীবন নিয়ে আলোচনা করা দরকার। অবশ্য ক্রিকেটের বিপরীতে জীবন হচ্ছে দ্বিতীয় অগ্রাধিকারের বিষয়।

"পরে," ইশান বলল।

"পরে কখন, ইশান? আমার একটা আইডিয়া আছে। আমাদের সবার জন্য সেটা কাজে দেবে। অনেক বেশি চয়েজ আমাদের সামনে নেই, ঠিক কি না?

"আমাদের সবার জন্য? আমার জন্যেও?" অমি বলল, উত্তেজিত সে। তার মত নির্বোধরা যেকোন কিছুতেই অংশ নিতে চায়। অবশ্যই এই ক্ষেত্রে অমিকে আমাদের দরকার।

"হ্যা, তোরও খুব দরকারী ভূমিকা আছে, অমি। কিন্তু পরে কখন, ইশ? কখন?"

"ওই, থাম তো, দ্যাখ ম্যাচ শুরু হচ্ছে। আচ্ছা, ডিনার শেষ হোক। আমরা গোপীতে যাব," ইশ বলল।

"গোপী? টাকা দেবে কে?" ম্যাচ শুরু হয়ে যাওয়ায় বাধা পড়ল আমার কথায়। বিপ্, বিপ্, বিপ্ একটা গাড়ির হর্নে আমাদের আলাপচারিতা ভেঙে গেল। মহল্লার বাইরে একটা কার এসেছে। "ধুর, এই জারজটাকে একটা উচিৎ শিক্ষা দেব," জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ইশ বলল, "আরে, কী হয়েছে?"

"বড়লোক বাবার জঘন্য এক ছেলে, প্রতিদিন এসে আমাদের বাড়ির চারদিকে চক্কর দেয়।"

"কেন?" আমি বললাম।

"বিদ্যার জন্য, ওর সাথে একই কোচিং ক্লাসে ছিল ছেলেটা। বিদ্যা ওর ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখানেও অভিযোগ করেছিল," ইশ বলল। বিপ্, বিপ্, বিপ্, কারটা আবারও বাড়ির কাছাকাছি এল।

"ধুর, এই ম্যাচটা মিস করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই," ইন্ডিয়া চার মেরেছে দেখে বলল ইশ। নিজের ব্যাটটা হাতে তুলে নিল সে। আমরা দৌড়ে বাড়ির বাইরে গেলাম। রূপালি রঙের *এস্টিম* গাড়িটা মহল্লার চারদিকে ঘুরে আরেকবার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে বাজনা বাজানোর জন্য এলে ইশ সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে গাড়ি থামাতে বলল। এস্টিমটা ঠিক ইশের সামনে থামলে কিশোর বয়সী ড্রাইভারের কাছে গেল ইশ।

"এক্সকিউজ মি, তোমার হেডলাইটটা ঝুলে আছে।"

"তাই নাকি?" বলে ছেলেটা ইগনিশন বন্ধ করল। বাইরে বেরিয়ে সামনে চলে এল সে। পেছন থেকে ছেলেটার মাথা ধরে বনেটের সাথে জোরে ঠুকে দিল ইশ। ব্যাট দিয়ে হেডলাইটে বাড়ি মারার জন্য এগিয়ে গেল সে। কাঁচ ভেঙে বাল্ব বেরিয়ে পড়েছে।

"আপনার সমস্যা কী?" ছেলেটা বলল। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে তার।

"কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করছিস আমাকে? হর্ন বাজাতে ভালো লাগে, না?" ইশ বলল। তার কলার ধরে মুখের উপরে একটানা ছয়বার চড় মারল সে। অমি ব্যাটটা হাতে নিয়ে উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে চুরমার করে দিল। অজস্র খণ্ডে ভেঙে গেল কাঁচটা। আমাদের চারপাশে জড়ো হল রাস্তার সব লোকজন। রাস্তাঘাটে মারামারি দেখার মত মজার জিনিস আর নেই। ব্যথা আর ভয়ে ছেলেটা কাঁপছে। তার ভাঙা গাড়ি আর চেহারা নিয়ে তার বাবাকে কী বলবে সে?

হাঙ্গামা শুনে ইশের বাবা বাড়ির বাইরে এলেন। ইশ বগল দাবা করে ছেলেটাকে ধরে রেখেছে। হাঁফাচ্ছে ছেলেটা।

"ওরে ছেড়ে দে," ইশের বাবা বললেন। ইশ তাকে আরো শক্ত ক'রে ধরে থাকল।

"বললাম ছেড়ে দে," ইশের বাবা চিৎকার ক'রে উঠলেন, "কী হচ্ছে এখানে?"

"গত সপ্তাহ থেকে বিদ্যাকে ডিস্টার্ব করছে সে," ইশ বলল। হাঁটু দিয়ে ছেলেটার মুখে লাথি মেরে ছেড়ে দিল তাকে। রাস্তায় বসে পড়ে হাঁফাচ্ছে ছেলেটা। ইশের শেষ লাথিটাতে তার নাকের রক্ত মুছে মুখে লেগে গিয়েছে।

"আরে কী করছিস তুই?" ইশের বাবা তাকে বললেন।

"ওকে উচিৎ শিক্ষা দিচ্ছি," কথাটা বলে ইশ উইন্ডস্ক্রিনে আঁটকে থাকা তার ব্যাটটা ছাড়িয়ে নিল।

"তাই নাকি? তো নিজের শিক্ষাটা শিখবি কখন?" ইশের বাবা তাকে বললে ইশ মুখ ঘুরিয়ে নিল।

"তুমি এবার চলে যাও," ইশের বাবা গাড়িওয়ালা ছেলেটাকে বললেন। দু'হাত জোড় করে আছে সে। কিন্তু কেউ তার এই ক্ষমা চাওয়াটাকে আমলে নিচ্ছে না দেখে আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে চলে গেল ছেলেটা।

ইশের বাবা তার প্রতিবেশীদের দিকে ফিরলেন। "পুরো একটা বছর সে বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে আছে। নিজ দেশের আর্মি থেকে পালিয়ে এসে এখন অন্যকে শিক্ষা দিতে চায়। নিজের বন্ধুদের নিয়ে সারাদিন বাড়ির চারপাশে কী সব ঘুরঘুর করে।"

বাবার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে ইশ বাড়ি ফিরে গেল।

"কোথায় যাচ্ছিস এখন?" ইশের বাবা বললেন।

"ম্যাচ দেখতে। কেন? আরো গালি গালাজ করতে চাও নাকি?" ইশ বলল।

"পুরো জীবনটাই তো বরবাদ ক'রে দিয়েছিস, এখন আর দেখার কী আছে?" ইশের বাবা বললেন। প্রতিবেশীরাও সহানুভূতি দেখিয়ে একটু মাথা নেড়ে সায় দিল তার কথায়।

ম্যাচের শেষ পাঁচ ওভার মিস্ করেছি আমরা। সৌভাগ্যক্রমে ইন্ডিয়া জিতে গিয়েছে, তাই ইশকে আর হতাশ হতে হল না।

"হ্যা, হ্যা, হ্যা," ইশ লাফিয়ে উঠল। "আজ রাতে গোপীতে আমার ব্যাপারে কথা হবে।"

আমি নির্বোধদের ভালবাসি, তবে ইশান নির্বোধ নয়। অন্তত অমির মত নির্বোধ তো নয়ই। ব্যাপার হল তারা দু'জনেই গণিতে কাঁচা আর এই বিষয়টাতে আমি হলাম একেবারে পাকা। কাজেই সেই তকমাটাও আমার আছে। যেমন ধরুন, তিনজনের মধ্যে আমিই হচ্ছি সবচাইতে গরীব। যদিও একদিন আমিই সবচেয়ে বড় ধনী হবো। অবশ্য ইশান এবং অমিও তেমন একটা বড়লোকও নয়। ইশানের বাবা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে চাকরি করেন। বাড়িতে অনেকগুলো ফোন থাকলেও তার বেতন খুব সীমিত। অমির বাবা স্বামীভক্তি মন্দিরের পুরোহিত। মন্দিরটা আসলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অমির মায়ের পরিবারের মালিকানায় আছে। ওটা থেকে তেমন বেশি আয়ও হয় না, তারপরও তারা আমার এবং আমার মায়ের চেয়ে অনেক বেশি সচ্ছল। আমার মা একটা ছোট্ট গুজরাটি জলখাবারের ব্যবসা চালান। টিউশন থেকে যে সামান্য কিছু টাকা পাই তাতে করেই আমাদের চলে যায়।

"আমরা জিতে গেছি। ৩-১'এ আমরা সিরিজ জিতে গেছি," টিভি স্ক্রিন দেখে অমি বলল। অবশ্য তার পক্ষে এ ধরণের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা অনেক বড় ব্যাপার। কেউ কেউ বলে জন্মগতভাবেই অমির বুদ্ধি কম, আবার কেউ বলে ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় একটা কর্ক বল তার মাথায় আঘাত করার পর থেকেই এই অবস্থা হয়েছে তার। অবশ্য কারণটা আমার ঠিক জানা নেই। তবে পুরোহিত হওয়াটাই তার জন্য সর্বোত্তম ব'লে আমার মনে হয়। অন্যথায় জীবনে তেমন বড় কিছু সে করতে পারবে না। বারো ক্লাসে দু'বার অঙ্কে কম্পার্টমেন্ট পরীক্ষা দিয়ে কোনমতে পাস ক'রে গেছে সে। কিন্তু পুরোহিত হওয়ার পরিকল্পনা তার নেই তাই আমার পরিকল্পনাটাই তার জন্যে সবচেয়ে ভাল হবে।

আমি খাকরা খেলাম। আমার মা এর চাইতে ভাল খাকরা বানায়। হাজার হলেও আমরা যে এসব ব্যাপারে পেশাদার।

"আমি জামা-কাপড় পাল্টাবার জন্যে বাড়ি যাব। তারপর গোপীতে আসব, ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে?" আমি বললাম। ইশ্ এবং অমি তখনও নাচানাচি করছে। ইন্ডিয়া জিতে গেলে নাচানাচি করা একটা আচারের মত ব্যাপার। এগার বছর বয়স থেকে আমরা এটা শুরু করেছি, তের বছর বয়সেই সেটা থেমে যাবার কথা। তাপরও এখানে এই একুশ বছর বয়সে ছোকরাদের মত হুটোপুটি খাচ্ছি আমরা। যাহোক, আমরা জিতেছি, কাজেই কারো না কারো সেটা করতেই হয়। আর গণিতের ভাষায় যদি বলি, জেতার সম্ভাবনা তো ভালই ছিল- কাজেই এত লাফালাফির কী আছে?

*

হেটে বাড়ি চলে এলাম।

পুরনো শহরটার সরু রাস্তাগুলো সান্ধ্যকালীন ভীড়ে গমগম করছে। আমার আর ইশানের বাড়ি মাত্র আধ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এইটুকু দূরত্বের মাঝখানেই আমার পুরো দুনিয়া। নানা পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম ইন্ডিয়া জিতে গেছে বলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বহু পোলাপান পার্কে ক্রিকেট খেলা শুরু ক'রে দিয়েছে। আমার স্কুল জীবনের প্রায় প্রতিদিন এখানটাতে আমরা খেলতাম।

সময় সময় এখনও এখানে আসা হয়। তবে আমার বাড়ির কাছে যে পরিত্যাক্ত ব্যাংক কম্পাউন্ডটা আছে ওই জায়গাটাই আমরা বেশি পছন্দ করি।

একটা টেনিস বল আমার পায়ের কাছে এসে পড়লে দেখলাম বারো বছরের একটা ছেলে ঘামে ভিজে দৌড়ে এল আমার কাছে। বলটা তুলে তাকে দিলাম। ইশান আর অমির সাথে এই নানা পার্কেই প্রথম দেখা হয়েছিল আমার। সে আজ পনের বছর আগের কথা। কোন বিশেষ নাটকীয়তার ভেতর দিয়ে এই বন্ধুত্বের শুরু হয় নি। খেলার মাঠে ছ'বছর বয়সী ছেলে শুধু আমরাই ছিলাম হয়তো। একই সাইজের। সেজন্যেই একসাথে খেলাধুলা শুরু।

আর দশজন পড়শীর মত আমাদেরও স্কুল ছিল বেলরামপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুল। নানা পার্ক ধরে আরো একশ মিটার যেতে হয়। অবশ্য পড়াশোনায় মন কেবল আমারই ছিল। ইশ আর অমি সুযোগ পেলেই ছুটে যেত পার্কে।

সরু গলিটায় তিনটা বাইসাইকেল একটা আরেকটাকে টেক্কা দিয়ে যেতে চাইছে। পথ ছেড়ে দিয়ে কাজী রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ভাজা ধনে আর রসুনের গন্ধে ছোট ঘরটা ভরে আছে। ইন্ডিয়া জিতে গেছে ব'লে বাবুর্চি আজ একটু বেশি পরিমাণেই রান্না করছে। সস্তা খাবার আর অসাধারণ মাটনের লোভে ইশান আর আমি মাঝে মাঝে এইখানে আসতাম (অবশ্যই অমিকে না জানিয়ে)। মালিক লোকটা আমাদের জন্য 'ছোট সাইজের মাটনের' ব্যবস্থা ক'রে রাখত। মানে শুধু খাসির মাংস থাকত, গরুর না। গরুর মাংস বিক্রি করলে এলাকায় সে টিকতে পারবে না। কাজেই তার কথায় বিশ্বাস ছিল। গোপীতে না খেয়ে এখানে খাওয়ার ইচ্ছা আমার। কিন্তু অমির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে কথা দিয়েছি, গোপীতেই খাব। ওখানকার খাবারটাও দারুন। গুজরাটে লোকজনের কাছে খাবার জিনিসটা প্রবল আসক্তির বিষয়। শুষ্ক রাজ্য, বিশেষ ক'রে সেই কারণে মানুষ এখানে বুঁদ হয়ে খাবার খায়।

হ্যা, আহমেদাবাদ আমার নিজের শহর। আজব এক জায়গা সেটা। তারপরও দীর্ঘকাল ধরে কোন শহরে সুখের সময় কাটালে সেটাই হয়ে যায় নিজের কাছে দুনিয়ার সেরা শহর। আহমেদাবাদ নিয়ে আমার অনুভূতিটাও সে রকম। দিল্লি, বোম্বে বা ব্যাঙ্গালোরের মত হাল ফ্যাশনের শহর আহমেদাবাদ নয়, সেটা জানি। ওখানে যারা থাকে তারা এটাকে ছোট শহর বলেই মনে করে। তারপরও ব্যাপারটা আসলে তা নয়। আহমেদাবাদ ইন্ডিয়ার ষষ্ঠ বৃহত্তম শহর। জনসংখ্যা পঞ্চাশ লাখেরও উপরে। যদিও সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আমি হলপ ক'রে বলতে পারি আহমেদাবাদে দিল্লির চেয়েও ভাল বহুতল ভবন, বোম্বের চেয়ে সুন্দর রাস্তা কিংবা ব্যাঙ্গালোরের চাইতেও ভাল রেস্টুরেন্ট আছে। কিন্তু বললেই তো আর সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিংবা বিশ্বাস করলেও কুচ পরোয়া করবে না। বেলরামপুর বান্দ্রা নয়, সে কথা জানি। কিন্তু হেয় ক'রে আমাকে ছোট শহরের বাসিন্দা বললে সেটা মেনে নেব কেন? একটা মজার ব্যাপার হল–লোকে বলে ছোট শহরগুলোই নাকি আসল ইন্ডিয়া। একটা ব্যাপার বোধহয় তারা বোঝে, বড় বড় শহরগুলোতে যে ইন্ডিয়ার দেখা মেলে সেটা একদিক থেকে আসলে ভূয়া। হ্যা, আহমেদাবাদের পুরনো শহরের লোক আমি এবং এ নিয়ে গর্বও করি। অন্য শহরের মত অত ফ্যাশন শো'র বালাই আমাদের নেই। আমরা এখনও মহিলাদের সংক্ষিপ্ত বসনে দেখতে চাই না। এই না চাওয়ার মাঝে বেঠিক কিছু নেই।

কাজী রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে অমির মন্দির মুখো মহল্লার দিক ধরে বাড়ির উদ্দেশ্যে হাটা শুরু করলাম আমি। মন্দিরটার আসল নাম স্বামীভক্তি মন্দির। কিন্তু আমরা ডাকি অমির মন্দির বলে। একসময় অমি ওখানেই থাকত কিনা। সরু গলিটায় ঢুকে দেখি দু'জন লোক জনাকীর্ণ মহল্লাটার চারপাশে ময়লা ফেলা নিয়ে ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসেছে।

আমার এই ছোট শহরটার চারপাশে কিছু ব্যাপার আমি পাল্টে ফেলতে চাই। আহমেদাবাদের বাকি এলাকার চেয়ে এই দিকটা এখনও পশ্চাদপদ। এক নম্বর, সমগ্র পুরনো শহরটাকে আরো পরিষ্কার করা যায়। সবরমতি নদীর অন্য পাড়ে যে নতুন শহর হয়েছে, চকচকে কাঁচ আর ইস্পাতের ভবন চোখে পড়ে সেখানটায়। আর এই পুরনো এলাকার বর্জ্য ময়লা সময়মতো পরিষ্কারও করা হয় না।

আরো একটা জিনিস পাল্টানোর ইচ্ছে আছে আমার। অন্য মানুষজন নিয়ে লোকজনের গল্প-গুজব ছড়ানোর যে অভ্যেস আছে সেটা পাল্টানো দরকার। এই যেমন অমির ব্যাপারেই বলি। ক্রিকেট বলের আঘাত পেয়ে অমির বুদ্ধি কমে গেছে–এই গল্পটা বহুল প্রচলিত–একদম ভিত্তিহীন কথা। তারপরও বেলরামপুরের প্রতিটি মহল্লায় সবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখে এই কথা। কিংবা ইশকে নিয়েও গল্প বানানো হয়েছে। এনডিএ থেকে সে আসলে পালায় নি, তাকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছে। আমি জানি, এই সব গল্প মিথ্যে। কিছু না বুঝে মেনে নেওয়ার স্বভাব ইশের ধাতে নেই। সেনাবাহিনী বলতে পাগলই ছিল সে (এছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না তার)। তারপরও জীবনের আরো দুটো দশক ধরে কিছু মেজরের হুকুম তামিল ক'রে বেড়াতে হবে সেটা তার সহ্য হল না। এর মাশুলও তাকে গুণতে হল। বাবা-মা অসুস্থ বা এটা সেটা বলে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সোজা বেলরামপুরে পালিয়ে এল সে।

আরো একটা ব্যাপার আমি অবশ্যই থামাতে চাই–আজব এক গল্প চালু হয়েছে–বাবা যেদিন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তারপর থেকেই নাকি আমি অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছি। দশ বছর আগে মা আর আমাকে ছেড়ে বাবা চলে যান। কারণটা আমরা পরে জানতে পেরেছিলাম যে, শহরে বাবার আরো একটা বউ আছে। যতোদূর মনে পড়ে, আবেগ অনুভূতি আমাকে কখনোই খুব একটা নাড়া দিতে পারে নি। গণিত আর যুক্তিবিদ্যা আমার প্রিয়। আবেগের কোন স্থান এগুলোতে নেই। আমার মনে হয় আবেগ নিয়ে মানুষ বড্ড বেশি সময় অপচয় করে। জ্বলন্ত উদাহরণ আমার মা। বাবা চলে যাওয়ার পরে মাসের পরে মাস ধরে কান্নাকাটি করেছেন তিনি। প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি মহিলা আসতো তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। কোন গ্রহদোষে বাবাকে ধরেছে, কবে সেই গ্রহ অবস্থান পাল্টাবে তাই নিয়ে জ্যোতিষীদের কাছে ধর্না দিয়ে আরো একবছর কাটিয়েছেন তিনি। তারপর দাদা আর নানারা এসে ভীড়ল তার সাথে থাকার জন্য। কারণ তিনি একা থাকতে পারতেন না। তারপর আমার যখন পনের বছর বয়স হল, দুনিয়াটা বুঝতে শিখলাম, তাকে রাজি করিয়ে জলখাবারের ব্যবসাটা খুললাম। অবশ্য শুধু আমার জোরাজুরিতেই যে কাজটা হয়েছে তাও না। ততদিনে তার সমস্ত গয়না বিক্রিও শেষ।

তার হাতে তৈরি জলখাবারগুলো দারুণ হয়। কিন্তু ব্যবসা তার কম্ম না। আবেগপ্রবণ লোকের আবার ব্যবসা কিসের! বাকিতে বেচে নগদে কিনবে তারা–ছোটখাট ব্যবসায় এটা হচ্ছে এক নম্বর ভুল। তারপর কোন হিসেবের বালাইও রাখবে না। গৃহস্থালির খরচের সাথে ব্যবসার খরচ গুলিয়ে ফেলেন আমার মা। প্রায় মাসেই অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, হয়তো খাওয়ার চাল নয়তো গোলমরিচ যেকোন একটা কেনার সামর্থ্য থাকে না।

এরইমধ্যে যতটা সম্ভব পড়াশোনা করলাম। আমাদের স্কুল তো আর অক্সফোর্ড নয়। পড়াশোনার তেমন গুরুত্ব সেখানে নেইও। ছেলেপুলের চাইতে শিক্ষকেরাই স্কুল পালায় বেশি। তারপরও প্রতি বছর অঙ্কে আমার নম্বরই সবার উপরে থাকে। ক্লাস টেনে অঙ্কে একশ পাওয়ার পরে সবাই ভাবল অঙ্কে আমার সহজাত দক্ষতা আছে। আমার কাছে সেটা খুব একটা কঠিন মনেও হয় না। গুজবের হাওয়ার কারণে পরীক্ষায় আমার নম্বরের খবর পুরো মহল্লা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তাতে ক'রে রোজগারের একটা নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপায় জুটে গেল আমাদের–টিউশনি। অংকে খারাপ নম্বরের মহামারী চলেছে তখন বেলরামপুরে। আর আমিই ছিলাম অঙ্কের একমাত্র টিউটর। প্যাটেল পরিবারে তাই খামান আর খাকরার সাথে সাথে ত্রিকোণমিতি এবং বীজগণিত থেকেও টাকা আসতে শুরু করল। গরীব এলাকা, কাজেই টাকা খুব একটা পাওয়া যেত না। তারপরও মাসে অতিরিক্ত আরো এক হাজার টাকা লাইফস্টাইল পাল্টে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট। ফ্যান ছেড়ে আমরা কুলার ধরলাম। চেয়ার বাদ দিয়ে কিনলাম সেকেন্ডহ্যান্ড সোফা। জীবনটা আরো বেশি স্বচ্ছন্দ হয়ে গেল।

অমির মন্দিরে পৌঁছে গেলাম আমি। ছন্দ করে ঘণ্টা বেজে চলেছে। সে প্রচণ্ড আওয়াজে চিন্তায় ছেদ পড়ল আমার। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যে ছ'টা–প্রতিদিনের আরতির সময় এখন। দূর থেকে দেখলাম অমির বাবা চোখ বন্ধ ক'রে মন্ত্র জপছেন। আমি নিজে অজ্ঞেয়বাদী হলেও তার মুখে যেন বিস্ময়কর কিছু দেখলাম–ঈশ্বরের জন্য নিখাদ এক অনুভূতির বহির্প্রকাশ। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এলাকায় তিনি অন্যতম জনপ্রিয় মানুষ। অমির পাশেই তার মা দাঁড়িয়ে আছেন। খয়েরি-লাল শাড়িতে মাথা ঢাকা তার। দু'হাত ভাঁজ করে রাখা। তার পাশেই আছে বিট্টু মামা। অমির মামা সে। সাদা ধুতি আর গেরুয়া রঙের চাদর পরা। হাত ভাঁজ ক'রে রাখায় তার পেশীবহুল হাত দুটো আরো বেশি বলিষ্ঠ দেখাচ্ছে। তার দু'চোখ স্থির হয়ে আছে কৃষ্ণ আর রাধার মূর্তির আরাধনায়।

দেরি ক'রে আরতিতে পৌঁছানোর জন্য আমি ঝামেলায় পড়তে পারত। যদিও এটাই যে তার প্রথমবার দেরি করা তা নয়, যেহেতু নানা পার্কের ম্যাচগুলো সন্ধ্যে ছ'টার দিকেই বেশ জমে ওঠে।

AMARBOI.COM

*

"ম্যাচ কেমন হল রে?" বাড়ি পৌঁছালে মা'র জিজ্ঞাসা। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। বিয়ের অনুষ্ঠানের একটা ভাড়া করা অটো গাড়িতে সদ্য তৈরি করা ধোকলা ভরে মাত্র শেষ করেছেন। শেষতক ডেলিভারি দেওয়ার মত কাজগুলো নিয়মিত করতে পারছেন। তার রাঁধুনিপনা চোখে পড়ছে এখন। অটো থেকে আমার জন্য একটা ধোকলা তুলে নিলেন। খদ্দেরের জিনিস থেকে এভাবে কিছু তুলে নেওয়াটা নিঃসন্দেহে খারাপ কাজ।

"দারুণ খেলা হল। বেশ ভালভাবে আমরাই জিতলাম," ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে ঘরের ভেতর টিউবলাইট জ্বালিয়ে দিলাম আমি। আমাদের মহল্লার বাড়িগুলোতে দিনের বেলাতেও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়।

"দিওয়ালি মৌসুমে ভাল কাজ পাওয়া গেলে তোর জন্যে একটা রঙিন টিভি কিনে দেব," মা কথা দিলেন।

"দরকার নেই," আমি বললাম। গোসল করার জন্য জুতো খুলে প্রস্তুত হলাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাড়াতাড়ি আরো বড় একটা গ্রিন্ডার মেশিন দরকার তোমার। ছোটটা খুব বেশি কাঁপাকাঁপি করে।"

"বাড়তি টাকা পেলে তবেই রঙিন টিভি কেনা হবে," তিনি বললেন।

"আরে না। বাড়তি টাকা পেলে সেটা দিয়ে ব্যবসায় খাটাও। এসব অকাজের জিনিস কেনার দরকার নেই। ইশানের বাড়ি গেলে রঙিন টিভিতেই তো ম্যাচ দেখি।"

ঘর থেকে বেরুলেন তিনি। মা জানেন আমার সাথে তর্ক করা বৃথা। বাবা নেই এখন তাই বাড়িতে আমার মতামতের বিস্ময়কর গুরুত্ব আছে। আমি কেবলই চাই ইশান এবং অমি আমার কথা শুনুক।

টিউশনি করা শুরুর পর থেকেই ব্যবসার জন্যে আমার মাঝে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। টাকা হাতে আসছে দেখতে ভালই লাগে। টাকায় ভর ক'রে যে শুধু কুলার আর সোফাসেটই আসলো তা নয়, আরো একটা জিনিস সেই সাথে এল–শ্রদ্ধা। দোকানীরা আর আমাদের অবজ্ঞা করে না, আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে আবারও বিয়ের দাওয়াত আসা শুরু হল। বাড়িওয়ালা বাড়িতে এলে আমাদের আর কোনো হাঙ্গামা পোহাতে হয় না। তারপর রোমাঞ্চকর একটা ব্যাপার তো আছেই–আমি টাকা আয় করছি। কোন মনিবের অধীনে কাজ করে কিংবা ভিক্ষা করে নয়, আমার ভাগ্য আমার নিজের হাতে, কতজন ছাত্র-ছাত্রি পড়াব, কতঘণ্টা ধরে ক্লাশ নেবো–সবকিছুতে আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আমরা গুজরাটিরা ব্যবসা পছন্দ করি, আর আহমেদাবাদীদের কথা বললে ব্যবসার চেয়ে প্রিয় জিনিস তাদের কাছে নেই। গুজরাটই ইন্ডিয়ার একমাত্র রাজ্য যেখানে চাকরির চেয়ে ব্যবসা করলে আপনার সম্মান বেশি হবে। দেশের বাকি অংশের কথা বললে সেখানে লোক আরামের কোন চাকরি চায় যাতে ভাল বেতন পেয়ে থিতু হয়ে বসতে পারে। আহমেদাবাদে চাকরি হল দুর্বল লোকদের জন্যে। সেজন্যই আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন একদিন অনেক বড় ব্যবসায়ী হওয়া। একমাত্র বাধা হচ্ছে মূলধনের অভাব। কিন্তু আস্তে আস্তে টাকা জমিয়ে আমার সেই স্বপ্নও একদিন সত্যি হবে। ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমে ঢোকার স্বপ্নটা সফল হয় নি ইশের–তবে শুরুতে এরকম স্বপ্ন দেখাটা বোকামি। বিলিয়ন লোকের দেশে শীর্ষ এগারোর ভেতরে ঢুকে পড়ার স্বপ্ন দেখা কঠিন স্বপ্নই বটে। বেলরামপুরে ইশ সবার উপরে থাকলেও সে তো আর টেন্ডুলকার নয়। আমার স্বপ্নটা বরং আরো বাস্তবসম্মত। আস্তে আস্তে আমি বড় ব্যবসায়ী হতে চাইছি। হাজার থেকে লাখ, তারপর কোটি, তারপর শতশত কোটি টাকা।

গোসল সেরে এসে জামা কাপড় পরে নিলাম।

"কিছু খেয়ে নে, নাকি?" রান্নাঘর থেকে এই কথাটাই মার মুখে সবচেয়ে বেশি শোনা যায়।

"না, খেয়ে কাজ নেই। ইশ আর অমির সাথে গোপীতে যাচ্ছি।"

"গোপীতে কীজন্যে আবার? আমিও তো বাড়িতে একই জিনিস তৈরি করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখানে নতুন কী পাবি?"

ভাবলাম বলি, ওখানে শান্তি আর নীরব একটা পরিবেশ পাওয়া যাবে।

"ইশ খাওয়াবে। ওদের সাথে একটু ব্যবসা নিয়ে কথাও বলব।"

"তার মানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষাটা আরেকবার দিবি না," রান্নাঘর থেকে মা বেরিয়ে এলেন। টিউশন করে আর মা'র ব্যবসায় দেখাশুনা করার পর এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করার সময় কমই হয়। আইআইটি কিংবা সেরা কোন ইনস্টিটিউটের জন্য এন্ট্রান্স দেই নি।

সুদূর কুচে এক কলেজে ঢোকার জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে আমার টিউশনের রোজগার, বন্ধু-বান্ধব, নানা পার্কে ক্রিকেট আর মা'কে ছেড়ে যওয়াটা মানতে পারছিলাম না। কোন আবেগে পড়ে গিয়েছিলাম যে তাও নয়। কিন্তু ব্যাপারটাকে ঠিক ব'লে মনে হচ্ছিল না। তার চেয়ে এখানে আহমেদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কে অনার্স করি, সাথে টিউশনির পাশাপাশি ব্যবসার জন্যও চিন্তা ভাবনা করা যাবে। কুচ কলেজে পড়লে চাকরি নিশ্চিত যে তাও তো নয়।

"ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা নেই, মা। আমার মন টানছে ব্যবসায়। দু'বছর তো কলেজে পার করেই ফেললাম। আর একটা বছর, তারপরেই গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাব।"

"তা হবা। কিন্তু অঙ্কে গ্র্যাজুয়েটকে চাকরি দেবে কে?"

কথাটা ঠিক। টাকা পয়সার কথা বিবেচনা করলে অঙ্কে অনার্স করাটা বোকামি।

"তা ঠিক। একটা ডিগ্রির দরকার ছিল। আরেকটু পড়লেই তো সেটা হাতে পাচ্ছি," মাকে বললাম, "আমি ব্যবসায়ী হবো। এর কোন নড়চড় হবে না।"

মা আমার গাল টেনে ধরলেন। তাঁর হাতের ময়দা মুখে লেগে গেল।

"যা ইচ্ছা করো। সবার আগে তুমি আমার ছেলে।" তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। এই জিনিসটা আমার পছন্দ হয় না। আবেগের চাইতে আবেগের প্রদর্শনীটা আমার বেশি অপছন্দের।

"গেলাম তাহলে।"

*

"এই নিয়ে দশটা চাপাতি হল তোর," অমিকে কথাটা বলল ইশ।

"নয়টা। তো কী হয়েছে? বুফে খানাদানা চলছে। ঘিটা দিবি এদিকে?"

"খালি এটাই তোর দরকার। এত খাওয়া ভাল না," ইশ বলল।

"দুশ' বুকডন। নানা পার্কে দশটা চক্কর। আর বিট্টু মামার জিমে এক ঘণ্টা। ব্যস। আমার মত কর প্রতিদিন, দেখবি গপগপ ক'রে খেলেও আর চিন্তা থাকবে না।"

"অমির মত খদ্দেরদের কাছ থেকে কেউ লাভ করতে পারে না। গোপীর লোকজন কোনভাবেই তার কাছ থেকে লাভ আদায় করতে পারবে না।"

"আমরস আর রসমালাই। ধন্যবাদ," ওয়েটারকে বলল অমি। ইশ আর আমিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে একই জিনিস চাইলাম।

"তাহলে কী দাঁড়াল ব্যাপারটা? বলো, শুনছি আমি," আমরসের শেষ চামচটা মুখে দিতে দিতে ইশ বলল।

"আগে খাওয়া শেষ কর। চা খেতে খেতে বলা যাবে," আমি বললাম। ভরা পেটে লোকজন তর্ক কম করে।

"চায়ের টাকা আমি দিতে পারব না। এক থালির বেশি আমার দ্বারা সম্ভব না," ইশান বাধা দিল।

"ঠিক আছে, আমি দেব," বললাম আমি।

"দাঁড়া দাঁড়া। আমি তো মজা করলাম। মিস্টার অ্যাকাউন্টস, সামান্য কৌতুকও বোঝে না। ঠিক না, অমি?" অমি হাসল।

"যাইহোক, আজ সবার সামনে কথাটা পাড়ার দরকার। আরেকটা কথা, আমাকে আর মিস্টার অ্যাকাউন্টস বলে ডাকবি না।"

ওয়েটার আমাদের প্লেটগুলো নিয়ে গেলে চা আনতে বলে দিলাম।

"আমার কথা ভাল করে শোন, ইশ। জীবনে কী করার পরিকল্পনা তোর? আমরা তো আর এখন বাচ্চা নই," আমি বললাম।

"সেটাই বাস্তব," ইশ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল। "ঠিক আছে, চাকরি-বাকরির জন্য দরখাস্ত দেওয়া শুরু করব, দেখি এনআইআইটি-এর কম্পিউটার কোর্সটা প্রথমে করা যায় কিনা। নাকি কোন বীমা কোম্পানির চাকরি নেব? তোদের কি মনে হয়?"

ইশের চেহারাটা দেখলাম। হাসার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু তার কষ্টটা আমি ঠিকই দেখতে পাচ্ছি। বেলরামপুরের চ্যাম্পিয়ন ব্যাটসম্যান কিনা বীমা কোম্পানির সেলস্‌ম্যান হবে। বেলরামপুরের বাচ্চাগুলো নানা পার্কে তার বাউন্ডারির গুণগান করতে করতে বড় হল। এখন তার নিজের জীবন যখন সম্ভাবনাহীন, তখন অন্য মানুষের জীবনের বীমা ক'রে চলতে হবে তাকে।

অমি আমার দিকে তাকাল। ভাবল আমার মাথা থেকে ভাল কোন চিন্তা বোধহয় বের হবে। ওদের ঠেকা দিতে দিতে আমি শেষ।

"ব্যবসা শুরু করার ইচ্ছা আমার," আমি বলা শুরু করলাম।

"না, আর না," ইশ বলল। "ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। শেষমেষ কী হবে? ফলের ব্যবসায়ী? ধুর! সারাদিন তরমুজ ওজন করা আমার দ্বারা হবে না। এইবার আমাদের পাগলাটার পালা। অমি, তুই কী ভেবে রেখেছিস?"

"কার এক্সেসরিজ," ও বলল। "এতে অনেক টাকা আসে," চায়ে শব্দ ক'রে শেষ চুমুকটা দিতে দিতে অমি বলল।

"কী? সারাদিন সিট কাভার লাগাবো? দরকার নেই। আরেকটা হইলো– স্টক ব্রোকার।"

"এটা আবার কী?" ইশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানতে চাইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাহলে কোন বালটা ফেলতে চাও? বীমা কেনার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরবে? নাকি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রেডিট কার্ড বেচবে?"

"ইশ, তুই মিলিটারি স্কুল ছেড়ে ভাগছিস," এটুকু বলে দম নিলাম আমি। "আর তুই তো বারো ক্লাসেই দু'বার কম্পার্টমেন্ট পেয়েছিস। তোকে পুরোহিত হলে মানাবে, অমি। কিন্তু আমাদের কী হবে?"

"পুরুত হওয়ার ইচ্ছা আমার নাই," আস্তে ক'রে বলল অমি।

"তাহলে আমি কথা শুরুর আগেই কেন বাঁধা দিস্? আমি একটা ভাল জিনিস ভেবেছি। তোদেরও ভাল লাগবে।"

"কী?" ইশ বলল।

"ক্রিকেট," আমি বললাম।

"কী!" ওরা দু'জন একসাথে বলে উঠল।

"যাক, তোরা তবে মন দিয়ে এবার আমার কথাগুলো শুনছিস। বলি তাহলে?"

"অবশ্যই," ইশ হাত উঁচিয়ে বলল।

"ক্রিকেট শপ খুলব আমরা," বললাম আমি।

তারপর ইচ্ছে করেই টয়লেট রুমের দিকে চলে গেলাম।

"কিন্তু কীভাবে?" ফিরে আসার পরে অমি প্রশ্ন করলো আমাকে। "ক্রিকেট শপটা কী?"

"খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রির দোকান। বেলরামপুরে ক্রিকেটই সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। তাই ক্রিকেটের জিনিসপত্রই বিক্রি করব আমরা।"

ইশ চুপ ক'রে আছে দেখে বুঝলাম আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছে সে।

"ছোট খুচরা বিক্রির দোকান হবে। দোকানের জন্য টাকার আমানত একটা সমস্যা। এজন্যে অমির সাহায্য দরকার।"

"আমার?"

"হ্যাঁ, স্বামী মন্দির কমপ্লেক্সের ঠিক ভেতরেই দোকানটা হবে। ফুল আর পূজার দোকানের পাশেই। ওইখানে একটা খালি দোকান দেখেছি আমি। মন্দিরেরই জায়গা ওটা।"

"মন্দির কমপ্লেক্সে হবে ক্রিকেট শপ?" ইশের প্রশ্ন।

"দাঁড়া। অমি, তুই কি এই ব্যবস্থাটা করতে পারবি? না পারলে আমাদের পুরো পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।"

"কুবের মিষ্টান্নের কথা বলছিস? দোকানটা তো সেদিন বন্ধ হয়ে গেল। মন্দির ট্রাস্টের লোকজন শিগগীরই ওইটা ভাড়া দেবে আবার। দেখা যাবে মন্দিরের দরকারি জিনিস বিক্রি করে এই রকম কোন দোকানের জন্যেই ওরা ভাড়া দেবে," অমি বলল।

"জানি। কিন্তু তুই তোর বাবাকে বুঝাবি। উনিই তো মন্দির ট্রাস্ট চালান, নাকি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তা চালান, কিন্তু দোকানের দিকটা দেখাশুনা করে মামা। আচ্ছা, আমরা কী ভাড়া দেব?"

"দেব," দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আমার। "কিন্তু এক্ষুণি না। দু'মাসের জন্যে ছাড় পাওয়া দরকার আমাদের। আর আমানত শোধের সামর্থ্যও আমাদের নেই।"

"মাকে বলে দেখতে হবে," অমি বলল। যাক তবু তার মাথাটা খেলছে এখন।

"একটা কথা বলি, কিছু মনে করিস না আবার। মন্দির কমপ্লেক্সে ক্রিকেট শপ? কিনবে কারা? সত্তর বয়সের মাসি-পিসিরা ক্রিকেট ব্যাট কিনে নিয়ে যাবে?" ইশ ফোড়ন কাটল।

ওয়েটার সামনে বিল রেখে দিয়ে আমাদের চা'র পেয়ালাগুলো নিয়ে গেল। গোপীর নিয়ম হচ্ছে দুই মিনিটের ভেতরে এখন আমাদের রেস্টুরেন্ট ছেড়ে যেতে হবে।

"প্রশ্নটা ভালই। মন্দিরের মধ্যে ক্রিকেট শপ বেখাপ্পাই শোনায়। কিন্তু একটা ব্যাপার ভেবে দেখ, বেলরামপুরে কি একটাও খেলার দোকান আছে?"

"তা নেই। সামান্য চামড়ার বল দরকার হলেও কিনতে পাওয়া যায় না। একেবারে কাছে বলতেও এলিস বৃজ পর্যন্ত যাওয়া লাগে," ইশ বলল।

"এইটা গেল এক নম্বর। দুই নম্বর হইলো, মন্দিরে লোকজন পরিবার পরিজন নিয়ে আসে। ওখানকার পিচ্চি পোলাপানগুলোর মতন একঘেঁয়ে জীবন আর কারোর নেই। বাইরে যে একটু ঘুরতে বের হবে সেই জায়গা কই ওদের?"

"ঠিক কথা। সেই জন্যেই তো এত বেলুনওয়ালা ঘুরঘুর করে।"

"এইখানে আবার ইশের দরকার। লোকে জানে তুই ভাল খেলতি। পোলাপান যারা কিনতে আসবে তাদের তুই ভাল টিপস্ দিতে পারবি। আস্তে আস্তে আমাদের নাম ছড়িয়ে পড়বে।"

"কিন্তু খৃস্টান আর মুসলমান বাচ্চাগুলো? ওরা তো আর আসবে না, তাই না?" ইশ বলল।

"প্রথম প্রথম আসবে না। কিন্তু দোকানটা তো মন্দিরের বাইরে হবে। নাম ছড়িয়ে পড়লে তারাও আসবে। তাছাড়া ওদেরই বা কী উপায় আছে?"

"আমরা যা বিক্রি করব সেগুলা পাবো কোত্থেকে?" ইশ বলল।

"বস্ত্রপুরে এক লোক আছে, খেলার সাজ-সরঞ্জাম বিক্রি করে। একমাসের জন্য ধারে দিবে সে। জায়গা ঠিক করতে পারলে নগদ টাকা ছাড়াই আমরা জিনিসগুলো নিতে পারব।"

"কিন্তু দোকান না চললে তখন কী হবে?" ইশ সন্দেহের সুরে বলল।

"চরম খারাপ অবস্থা হবে। পুরো দোকান তখন লোকসানে বেচে দেব। বাকিটা আমার টিউশনের টাকা থেকে যা জমিয়েছি তাই দিয়ে মিটিয়ে দেব। কিন্তু দোকান চলবে। তোমরা মন লাগিয়ে কাজ করলে ঠিকই চলবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা দু'জনে চুপ ক'রে থাকল।

"দ্যাখো বাবারা, এই কাজে কিন্তু তোমাদের আমার দরকার। ব্যবসা আমার করতেই হবে। পার্টনার না পেলে করা সম্ভব না। ক্রিকেট নিয়েই তো কাজ," ইশকে ইঙ্গিত ক'রে বললাম কথাটা।

"আমি আছি," অমি হেসে বলল। "আমার আর পুরুত হওয়া লাগবে না। বাড়িতে বসেই কাজ করতে পারব। অতএব আমি তোমাদের সাথেই আছি।"

"টাকা-পয়সা নিয়ে দেখাশোনা আমি করতে পারব না। আমার কাজ হবে ক্রিকেট নিয়ে," ইশ বলল।

আমি হেসে ফেললাম। ঠিক কথাই বলেছে সে।

"অবশ্যই। ভাবছিস নগদ টাকা আমি তোর হাতে দেব? তাহলে আমরা পার্টনার হলাম, নাকি?"

অমি আমাকে হাই-ফাইভ করলে ইশও তার সাথে যোগ দিল।

"দোকানের নামটা কী হবে??" অটোর ভেতরে বসে অমি জিজ্ঞেস করল।

"ইশরে বল," আমি বললাম। নামটা ইশের মুখ থেকে বেরুলে ভাল হবে। আমরা যে উদ্যোগটা নিলাম, সে যে তার সাথেই আছে সেটা তাহলে আরো ভাল করে মনে থাকবে তার।

"*টিম ইন্ডিয়া ক্রিকেট শপ* নামটা কেমন হয়?" ইশ তার প্রস্তাবনা জানালো।

"দারুণ নাম," আমি বললাম। সেই সন্ধ্যায় এই প্রথম দেখলাম ইশ হাসছে।

বেলরামপুরে আমার মহল্লার কাছে এসে অটোটা থামল। "একেকজন দুই রুপি পঞ্চাশ পয়সা করে দে," বললাম।

"যাই, মিস্টার অ্যাকাউন্টস," বলে ইশ তার টাকাটা দিয়ে দিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ২

২৯ এপ্রিল সকালবেলা একটা নারকেল ভেঙে যাত্রা শুরু হল টিম ইন্ডিয়া ক্রিকেট শপের। আমাদের আশপাশের সব বাড়ি থেকে লোকজন এল। আমার মা এবং অমির বাড়ির লোকজনকে হাসিখুশি দেখাচ্ছে। কিন্তু ইশের বাবা-মা চুপচাপ। তাদের কল্পনায় ইশ এখনও একজন আর্মি অফিসার, বেলরামপুরের কোন দোকানি সে নয়।

"তোমরা পরিশ্রমী ছেলে। লক্ষ্মীর আশীর্বাদ তোমাদের উপরে বর্ষিত হোক," চলে যাওয়ার আগে অমির মা বলে গেলেন।

একটু পরেই লোকজন চলে গেল। আমাদের বিশ ফুট বাই দশ ফুটের দোকানে এখন শুধু আমরাই আছি। "কাউন্টারটা ভেতরে আন। শার্টার বন্ধ হবে না নইলে," ইশ অমিকে চিৎকার ক'রে বলল। ভারি কাউন্টারটা এক ইঞ্চি পেছাতে গিয়েই অমির কপাল ঘামে ভিজে গেলো।

সাইনবোর্ডটা কেমন হয়েছে দেখা দরকার। সেইজন্যে এই নিয়ে দশবার দোকানের বাইরে এসে রাস্তার অন্যপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। বোর্ডটা চওড়ায় ছ'ফুট আর লম্বায় দু'ফুট। ইন্ডিয়ান টিমের রঙ নীল তাই আমরাও নীল রঙ করেছি বোর্ডটায়। মাঝখানে ইন্ডিয়ার পতাকার ভেতরে লিখে দিয়েছি *টিম ইন্ডিয়া ক্রিকেট শপ*। শাহপুরের অতি উচ্ছ্বসিত এক পেইন্টার টেন্ডুলকার আর গাঙ্গুলির মুখ মাগনা এঁকে দিয়েছে। গাঙ্গুলির চোখ হয়ে গিয়েছে টেরা আর টেন্ডুলকারের ঠোঁটে মনে হচ্ছে মৌমাছি কামড় দিয়েছে। কিন্তু এসবে যেন একটা জেলুস বেড়ে গেছে।

অমিও এসে আমার সাথে বোর্ডটা দেখতে লাগল। "সুন্দর দেখাচ্ছে," বলল ও।

দুপুর বারোটায় আমাদের প্রথম খদ্দের এসে জুটল। দশ বছরেরও কম বয়সী এক ছেলে। তার মা পূজার ফুল কিনছে। এই সময়ে আস্তে আস্তে হেটে সে আমাদের দোকানের সামনে এল। আমরা তিনজন লাফিয়ে উঠলাম। কাজ করার জন্য তৈরি আমরা।

"কী চায় জিজ্ঞেস করব নাকি?" অমি ফিস্‌ফিস্ ক'রে আমাকে বলল।

মাথা নাড়লাম আমি। বেশি উৎসাহ দেখালে মনে হবে আমরা বিক্রি করার জন্যে খুব মরিয়া।

টেনিসবলগুলোর দিকে তাকাচ্ছে ছেলেটা। কয়েকটা বল হাতে নিয়ে বাউন্স করল সে। বেলরামপুরে কেউ টেনিস খেলে না। কিন্তু ছোট ছেলেরা টেনিস বল দিয়েই ক্রিকেট খেলে।

"বলের দাম কত?" স্থানীয়ভাবে তৈরি বলগুলোর দিকে গেল ছেলেটা। বোঝাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে দাম নিয়ে যথেষ্ট সচেতন আমাদের খদ্দের। পাঁচটা বল নিয়ে মাটিতে বাউন্স ক'রে দেখল সে।

"আট টাকা। নিবা একটা?" আমি বললাম।

মাথা নেড়ে সায় দিল সে।

"তোমার কাছে টাকা আছে?"

"মামণির কাছে আছে," বলল ছেলেটা।

"কোথায় তোমার মামণি?"

"ওই দিকে," অন্য দোকানগুলোর দিকে ইশারা করল সে। যে বলগুলো নিয়ে বাউন্স করেছে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ডালার ভেতরে রেখে দিলাম।

আর মা দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের দোকানে এসে ঢুকল।

"সোনু, বোকা ছেলে। এইখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন," কনুই ধরে ছেলেটাকে বাইরে নিয়ে গেল তার মা।

"মামণি, বল," শুধু এই ক'টা কথাই সে বলতে পারল।

"চিন্তার কিছু নেই। আমরা ঠিকই বেচে ফেলব," আমার পার্টনারদের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি।

তাড়াতাড়ি আমাদের প্রথম বিক্রিটা হয়ে গেল। দোকানে এল আনকোরা জামাকাপড় পরা কম বয়সী দুই ভাই।

তাদের একজন বলল, "টেনিস বলের দাম কত?"

"অ্যারোগুলার দাম আট টাকা আর স্থানীয়গুলোর দাম ছয় রুপি," ইশ বলল।

স্থানীয়ভাবে তৈরি বলগুলো যে ডালায় রাখা আছে ছেলে দুটো সেদিকে গেল। আগের মতই আবার বল বাউন্স করা শুরু করল দু'জন।

"ক্রিকেট খেলো কোথায় তোমরা?" ইশ জিজ্ঞেস করল। "স্যাটেলাইটে," বড় ছেলেটা বলল।

স্যাটেলাইট সবরমতী নদীর ওপাশের জায়গা। দামি মার্কেটের পাশের এলাকা সেটা।

"এই পুরনো শহরের দিকে কী করতে এসেছ?" ইশ বলল।

"মন্দিরে এসেছি। আজ হর্ষ ভাইয়ার জন্মদিন," ছোট ছেলেটা বলল।

বুঝলাম রিয়েল এস্টেট সোনায় দাও মেরেছি আমরা। মন্দিরটা তো পুরনো। নতুন শহরের লোকজনও এখানে ছুটে আসে। আর জন্মদিনের কথা যখন বলল, পকেট নিশ্চয়ই ভারি হয়ে আছে।

"ক্রিকেট ব্যাট দেখবা?" ক্যাশ কাউন্টার থেকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

ছেলে দুটো মাথা নাড়ল।

আমার দিকে ফিরে চুপ থাকতে ইশারা করল ইশ।

"শুভ জন্মদিন, হর্ষ। তুমি বোলার নাকি ব্যাটস্‌ম্যান?" ইশ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হর্ষ ইশানের দিকে মুখ তুলে তাকাল। পূর্ণ বয়স্ক একটা লোক এগারো বছরের এক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করছে, সে বোলার নাকি ব্যাটসম্যান। নিঃসন্দেহে বিরাট সম্মানের ব্যাপার সেটা। তার মানে দাঁড়ায় নিজে হয়ত সে ব্যাপারটা ভেবে দেখে নি, কিন্তু না ভাবলেও যথেষ্ট বড় সে হয়ে গিয়েছে। লোকে তাকে এখন ফেলনা মনে করে না।

"ব্যাটসম্যানই থাকি বেশিরভাগ সময়," হর্ষ বলল।

"ডিফেন্সিভ নাকি অ্যাটাকিং?" ইশের প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে সে বোধহয় ESPN-এ টেন্ডুলকারের সাক্ষাতকার নিচ্ছে।

"হুহ্?" হর্ষ বলল।

"শট মারতে ভাল লাগে?" ইশ জিজ্ঞাসা করল। কোন্ বাচ্চার না ভাল লাগে?

হর্ষ মাথা নেড়ে সায় দিল।

"তুমি কীভাবে ব্যাট হাতে দাঁড়াও দেখাও তো দেখি," ইশ বলল। আমার দিকে ফিরে একটা ব্যাট চাইল সে। উইলো ব্যাটের স্টকের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ল-গার্ডেনে এক কাশ্মিরী লোকের কাছ থেকে ওগুলো কেনা হয়েছে। সে-ই সরাসরি এসব জিনিসের সাপ্লাই দেয়। ছেলেটার জন্য উপযুক্ত মাপের ব্যাট তুলে আনলাম ওখান থেকে। ছ'নম্বর সাইজের আর দুইশ রুপি দামের। এগুলোই যে সেরা ব্যাট তা নয়। কিন্তু এর চাইতে ভাল ব্যাট আনলে সেটা এখানে বিক্রি হবে না।

দোকানের সামনের খোলা জায়গার দিকে একবার তাকালো হর্ষ। তারপর সব বাচ্চারাই যেমন করে সেভাবে শরীরের পুরো ওজনটা ব্যাটের ওপরে চাপিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে। ইশ গিয়ে হর্ষের পিঠটা আলতো ক'রে সোজা ক'রে দিল। কব্জি ওপরের দিকে তুলে দু'পায়ে সমান ভর দিয়ে দাঁড়াতে বলল তাকে।

"এইবার যখনই তুমি অ্যাটাক করবে এগোনোর সময় সামনের পা আগে বাড়াবে। কিন্তু পেছনের পায়ের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এইটা তোমার সাপোর্ট, অনেকটা নোঙরের মতো। টেন্ডুলকারকে দেখেছ, এক পা কেমন এক জায়গায় আঁটকে রাখে?"

হর্ষ অবাক। শূন্যে কয়েকবার ব্যাট চালিয়ে প্র্যাকটিস করল সে।

"আমারেও কিছু শিখিয়ে দেন," ছোটটা আবদার ধরল।

"প্রথমে আমি, চিনু," বলল হর্ষ।

ইশ চিনুর দিকে ফিরল। "তুমি কোন্টা করো, চিনু?"

"অল-রাউন্ডার," চিনু চট ক'রে উত্তর দিলো।

"সাবাস। বল ধরো কীভাবে দেখাও তো দেখি।"

ছেলে দুটোর বাবা-মা শেষ পর্যন্ত আমাদের দোকানটা খুঁজে পেল। মন্দিরে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে তখন।

"মামণি, আমি বল নিবো," চিনু বলল।

"কত দাম?" তার মা জিজ্ঞাসা করল।

"ছয় রুপি," ইশ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ রুপির একটা নোট বের ক'রে তিনি আমাকে দুটো বল দিতে বললেন। "আমি ব্যাট নেব, মামণি। দাও না।" হর্ষ আবারও দাঁড়ানোটা একবার প্র্যাকটিস ক'রে নিলো। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা ভালই শিখে ফেলেছে সে। কিন্তু তার মা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করল না।

"এইটার দাম কত?" জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

"দুশ' রুপি," আমি বললাম।

"চড়া দাম। ব্যাট রাখো, হর্ষ, নেওয়া লাগবে না।"

"না না। আমার জন্মদিনের উপহার। কিনে দাও না, মামণি," হর্ষ বায়না ধরল।

"দেবো, কিন্তু বেটা, এই মন্দিরের দোকান থেকে কেনার কী দরকার। পুরনো শহরে ভাল জিনিস পাওয়া যায় না। নবরংপুর মার্কেটে যাব আমরা।"

"এইটার মান অনেক ভাল, পিসি। এক কাশ্মিরী সরাসরি এনে আমাদের দেয়। বিশ্বাস করুন," ইশ বলল।

'পিসি' সন্দেহের চোখে আমাদের দিকে তাকালেন।

"পৌরসভার সব কয়টা স্কুলের টিম ক্যাপ্টেন ছিলাম, পিসি। এই ব্যাটটা আমার নিজের পছন্দ করা," অমির বাবা যে আকুতি নিয়ে প্রার্থনা করে, ইশ সেরকম করেই কথাগুলো বলল।

"মামণি দাও না, প্লিজ," শাড়ি টেনে ধরে বলল হর্ষ। টান দিতেই পিসির মানিব্যাগ থেকে দুশ' রুপি বেরিয়ে এল।

যাক, পাওয়া গেল তাহলে। সেদিনের মত বেচাকেনা শেষ। ব্যাটটা আমাদের একশ' ষাট রুপি দিয়ে কেনা। কাজেই লাভ হল চল্লিশ রুপি। মনে মনে অবাক হয়ে গেলাম আমি।

"ঠিক আছে চ্যাম্পিয়ন, আবার দেখা হবে," হর্ষের দিকে হাত নেড়ে বলল ইশ।

"আমার যেদিন হ্যাপি বার্থডে হবে আপনার দোকানে আসব," চিনু বলল।

"হুম! তুমি একটা চিজ, ইশ," আমি বললাম। তারপর সবাইকে বিদায় জানিয়ে দিলাম।

"ছেলেটার শেখার গুণ আছে ভাল। প্র্যাকটিস করলে আরো ভাল করবে। অবশ্য দশ ক্লাশে ওঠার পরে দেখা যাবে, তার মা তাকে পড়াশুনায় ব্যস্ত ক'রে রেখেছে। তখন আর ক্রিকেট না, শুধু পড়ার টেবিলেই তাকে পাওয়া যাবে," ইশ বলল।

"হতাশ হওয়ার কিছু নেই," আমি বললাম। "ব্যাটটাতে লাভ হয়েছে চল্লিশ আর দুটো বলে লাভ চার। আমাদের পুরো লাভ হচ্ছে চুয়াল্লিশ রুপি, স্যার।"

পরের দু'ঘণ্টায় কিছু ক্যান্ডি আর আরো দুটো বল বিক্রি হল। সেদিনের মোট লাভ হল পঞ্চাশ রুপি। ব্যাট আর বলের ডালা ভেতরে ঢুকিয়ে পূজা শেষে সন্ধ্যে সাতটার দিকে দোকান বন্ধ ক'রে দিলাম। আমাদের আরম্ভটা উদযাপন করার জন্য বেছে নিলাম চানা-ভাটুরার দোকানটা। এক প্লেট চার রুপি ক'রে ব্যবসার টাকা থেকে খরচ করা যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিছু টাকা বাড়ি নিতে পারব? আমার প্রথম মাইনে মাকে' দেওয়ার খুব ইচ্ছা," অমি বলল। গরম ভাটুরার মরিচ গোগ্রাসে খাচ্ছে সে।

"আরে, এইটা তো আমাদের আসল লাভ না। এইটা হইলো গিয়ে দান। ঘরভাড়াটা আগে উঠুক, তারপরে দেখা যাবে।" আমার খালি প্লেটটা দোকানে ফিরিয়ে দিলাম। "অভিনন্দন সবাইকে। শেষমেষ ব্যবসায় নেমেই পড়লাম।"

তিন মাস পর

আট হাজার তিন, চারশ' আর পাঁচশ'," ক্যাশিয়ার বাক্সটা খালি করতে করতে বললাম। "ভাড়া শোধের পরে এই হল আমাদের পয়লা মাসের লাভ। খারাপ না, মোটেই খারাপ না।"

আমি যারপনাই সন্তুষ্ট। মোক্ষম সময়ে দোকানটা দিয়েছি আমরা। গ্রীষ্মের ছুটির শুরু হয়েছে। সাউথ আফ্রিকার সাথে এক দিনের সিরিজে ইন্ডিয়া জিতেও গিয়েছে। পকেটে টাকা পেয়ে সেইদিনই বাচ্চা ছেলেগুলো টিম ইন্ডিয়া ক্রিকেট শপে দলে দলে এসে ভীড়ছে। ছুটিতে হাতে অনেক সময় আবার এদিকে ইন্ডিয়াও জিতে গেছে, দেশের প্রতি তাদের টানটাও বেশি।

কেউ কেউ টাকা ছাড়াই চলে এসছে। শুধু ইশের সাথে দেখা করা আর ক্রিকেট টিপস্ পাওয়াই তাদের লক্ষ্য। আমাদের সময়টা তাতে ক'রে ভালই যাচ্ছে। কাজেই এতে কিছু মনে করার কিছু নেই। দোকান চালানো একটা একঘেঁয়েমির কাজ। ন'টা থেকে সাতটা পর্যন্ত খুলে বসে থাকতে হয়। দিনে যদি বিশটা খদ্দেরও আসে, তার মানে দাঁড়ায় ঘণ্টায় প্রায় দু'জন।

"তাহলে এখন যে যার ভাগ পেয়ে যাচ্ছি?" অমির গলায় উত্তেজনা।

টাকাটা চার ভাগে ভাগ করলাম আমি। প্রথম তিনভাগে পনেরশ' রুপি ক'রে। এই টাকাটা প্রত্যেকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে। বাকি চার হাজার ব্যবসায় খাটানো হবে।

অমি খুশি মনে রুপির নোটগুলো গুনছে। এমন সময় ইশ বলল, "খাটানো হবে মানে? খাটানোর দরকার কী?"

"ইশ, আমাদের কিছু টাকা জমিয়ে রাখা দরকার। কখনো ব্যবসা চাঙ্গা করার দরকার হলে প্রচারণা চালানোর জন্যে টাকার দরকার হবে। কাঁচের একটা ভাল কাউন্টারটপ বা আলো দিয়ে সুন্দর ক'রে সাজানো–এসব কি তুই চাস না?"

ইশ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

"আমরা অবশ্যই চাই। আর...দোকানটা আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে আমার," আমি বললাম।

"কী?"

"নবরংপুর চার রাস্তায় একটা নতুন শপিংমল তৈরি হচ্ছে। আগে থেকে বুকিং দিতে পারলে দোকান ভাড়ায় ছাড় পাওয়া যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আবার ভাড়া কিসের? দোকান তো আছেই," ইশ বলল। অবাক আর বিরক্ত হয়ে গেছে সে।

ইশের অসন্তোষের কারণ আমি জানি। দোকানে একটা টিভি কিনতে চেয়েছিল সে। রেডিওতে খেলা শুনে মজা পায় না।

"না ইশ, ভালরকম একটা দোকান দরকার। অল্পবয়সী লোকজন জমকালো দোকানই পছন্দ করে। এইরকমই একটা দরকার। আমাদের দোকানে ব্যবসা ভালই চলছে। কিন্তু নতুন শহরে দোকান না নিলে ব্যবসা বাড়বে না।"

"এই জায়গাটা আমার খুব পছন্দ," অমি বলল, "নিজেদের এলাকা। এখানে যা বিক্রি হয়, ছেলেপেলে নানা পার্কে সেগুলো দিয়েই খেলে।"

"এত ছোট চিন্তা আমার নেই। মলে একটা দোকান খুলব, তারপর পরের বছর আরো একটা দোকান দেব। ব্যবসা বাড়াতে না পারলে একসময় থেমে যাবে।"

"আরো একটা দোকান বানাবা? মানে আমরা একসাথে কাজ করবো না?" অমি বলল।

"গোবিন্দ মার্কা কথাবার্তা। শুরুই করলাম মাত্র। এরই মধ্যে তার ধীরু ভাই আম্বানি হওয়ার খায়েশ।"

"একটা টিভি আমরা কিনতে পারব না?" ইশ বলল, "চারহাজার অগ্রিম দিতে পারলে শাহ্ ইলেকট্রোনিক্স থেকে কিস্তিতে পাওয়া যাবে।"

"সম্ভব না। ওই চারহাজার ব্যবসার জন্যেই রাখা হয়েছে।"

"টিভিটাও তো ব্যবসার কাজেই লাগবে, নাকি?"

"লাগবে কিন্তু এর থেকে যেন আয় তো আসবে না। আরো অনেক পথ পাড়ি দেওয়ার আছে আমাদের। মাসে তিন হাজার কিছু না। আর ইশ তো নোটবুক, পেন্সিল এসবও রাখতে দেয় না।"

"বললাম তো, এইটা হচ্ছে খেলার দোকান। ছেলেপেলে এখানে এসে পড়াশুনার চিন্তা মাথায় রাখবে না।"

ইশ আর আমার মাঝে এই নিয়ে আগেও তর্ক হয়েছে। আমার কাছে এটাকে সহজ সুযোগ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু ইশ এটারই বিরোধী।

"ঠিক আছে, তাহলে শুধু নোটবুক রাখা যাবে। মনে রাখিস, পাঠ্যবই না। আর টিভিটা কিনতে হবে। খেলা আমার দেখাই লাগবে। এই যে আমি পনেরোশ' দিচ্ছি।"

আমার দিকে টাকাটা ছুঁড়ে দিল সে।

অমিও তার টাকা সামনে ফেলে দিল। আর নিয়মমাফিক বোকাদের কাছে পরাজয় মেনে নিতেই হল আমাকে।

"ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের আয় বাড়ানো দরকার। তিন মাসে বিশ হাজার রুপি চাই।"

আমার কথায় কান দিল না ওরা। কোন্ ব্র্যান্ডের টিভি কিনবে সেই আলাপ জুড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে। আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম। কীভাবে আয় বাড়ানো যায় বলে ঠিক করেছি এসব কথাই বলতে লাগলাম কেবল।

"তুই কি কোচিং ক্লাস করাবি?" ইশকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"কী?"

"ছেলেপেলে তোর টিপস্ খুব পছন্দ করে। টাকার বিনিময়ে কোচিং করালেই তো পারিস, নাকি?"

"আমি করাব? অত ভাল পারি না আমি। আর করাব কোথায়? মন্দিরে?"

"না, মন্দিরে কেন। এসএবিআই কম্পাউন্ড পড়ে আছে, ওখানে করাবি।"

"আরে, এসবের কী দরকার? আমি নিশ্চিত আমাদের আয় বেশ ভালই হচ্ছে। কি কম হচ্ছে?" অমি বলল।

"আয় আর কোথায়। তিন মাসে পঞ্চাশ হাজারের ইচ্ছা আমার। তুই তো ছেলেপেলের ফিটনেস ট্রেনিং দিতে পারিস, অমি।"

"মানে আমাদের কাজ বেড়ে গেল। তুই কি বলিস?"

ইশ বলল, "আমি আবার অংকের টিউশনি শুরু করব।"

"এখানে?"

"হ্যা, এখানেই একজোড়া পড়াব। আর নয়তো এসবিআই কম্পাউন্ড আছে, ওখানে পড়াব। তোরা ক্রিকেট কোচিং দিবি আর আমি পড়াব।"

অমি আর ইশ আমার দিকে যেভাবে তাকাল যেন মনে হল পৃথিবীর সবচাইতে ক্ষুধার্ত হাঙরটা আমিই।

"...আমি তোদের নিশ্চিত ক'রে বলছি, ভাল একটা ব্যবসা জমে গেছে আমাদের।"

"তা ঠিক। কিন্তু দোকানটা খুব একঘেঁয়ে ব্যাপার, ইশ," অমি বলল। বাচ্চাদের প্র্যাকটিস করাচ্ছে এই ব্যাপারটা ভেবে সে খুব উত্তেজিত বোধ করছে।

"হ্যা, অন্তত ক্রিকেটের পিচে থাকতে পারছি এটাই বা কম কিসের," ইশ বলল।

আমিও আমার পনেরশ' দিয়ে দিলে ওইদিনই টিভি কিনে আনলাম আমরা। স্থায়ীভাবে স্পোর্টস চ্যানেলেই সেট ক'রে দিলাম টিভিটা। মাদুর আর তাকিয়া এনে অমি টিভির সামনে বিছিয়ে দিলাম। যেদিন ম্যাচ থাকত, খদ্দের না আসলে আমরা ওখানেই বসে থাকতাম। স্বীকার করতেই হবে, সারাদিন সময়টা তাতে ক'রে দ্রুতই কেটে যেত।

দোকানের উপরে বোর্ডটা পাল্টে ফেললাম। *টিম ইন্ডিয়া ক্রিকেট শপ*-এর নিচে লিখে দিলাম 'স্টেশনারি, ক্রিকেট-কোচিং এবং অঙ্কের টিউশনির ব্যবস্থা রয়েছে।' দোকানের সাইজ হয়তো বাড়লো না, কিন্তু পণ্যের বৈচিত্র এল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৩

ক্রিকেট ছাড়াও বেলরামপুরে ব্যাডমিন্টন হচ্ছে আরেকটি জনপ্রিয় খেলা, আসলে শুধু মেয়েরাই ব্যাডমিন্টন খেলে। দারুণ ব্যবসা এটা। শাটল কক নতুন কেনার দরকার পড়ে, র‍্যাকেটের তার নতুন ক'রে লাগানোর দরকার হয়। ক্রিকেট ব্যাটের মত ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট বেশিদিন স্থায়ী হয় না।

পরের সপ্তাহগুলোতে স্কুলের স্টেশনারি আইটেমগুলো সাংঘাতিক বিক্রি হল, খেলাধুলা করে মাত্র কিছু বাচ্চা, কিন্তু প্রত্যেক বাচ্চার জন্যেই নোট বই, কলম পেন্সিলের দরকার হয়। সব ধরণের সমাধানই আমরা দিচ্ছি। শীঘ্রই স্বয়ং সাপ্লায়াররাও আমাদের কাছে আসতে লাগল। তারা পরে শোধ করার জন্য বাকিতে জিনিস রাখত–চার্ট পেপার, গাম বোতল, ইন্ডিয়ার ম্যাপ, পানির বোতল এবং টিফিন বাক্স। দোকান খুললে তবেই বুঝতে পারবেন, ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট ইন্ডাস্ট্রির প্রসার কত বেশি।

ক্রিকেট কোচিং এবং টিউশনির দর একই রেখেছি আমরা–মাসে ২৫০ রুপি। উঁচু চাহিদা এবং আমার রেকর্ড ভাল থাকার কারণে গণিতের টিউশনির খদ্দের সহজেই পাওয়া যেত। সকাল বেলা এসবিআই কম্পাউন্ডে আমি পড়াতাম আর ইশ দু'ছাত্রকে ওখানে ক্রিকেট শেখাতো।

বেলরামপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের সেরা খেলোয়াড় তারা। তিন মাসের জন্যে ক্রিকেট কোচিং করার জন্য বাবা-মার সাথে রীতিমতো লড়াই করেছে ছেলেগুলো। অবশ্য এখনও আমাদের বেশির ভাগ সময় দোকানেই ব্যয় হয়।

"গৃটিং কার্ডও শুরু করব নাকি?" এক সাপ্লায়ারের দেয়া একটা স্যাম্পল প্যাকেট খুলতে খুলতে ভাবছিলাম। খুচরা দাম পাঁচ রুপি আর কেনা দাম দুই রুপি হলে কার্ড কেনাবেচায় লাভ অনেক বেশি হয়। অবশ্য বেলরামপুরের লোকজন একে অন্যকে গৃটিং কার্ড দেওয়া-নেওয়া করে না।

"এটা হল ইন-সুইঙ্গার আর এটা হচ্ছে অফ-সুইঙ্গার। দুই সপ্তাহে এটাই হচ্ছে তৃতীয় বল। কী ব্যাপার, তপন?" এক নিয়মিত খদ্দেরকে ইশ জিজ্ঞেসা করল। তের বছর বয়সী তপন স্কুলে তার সমবয়সীদের মাঝে অন্যতম সেরা বোলার। ইশ ক্রিকেট বলটা হাতের মুঠোয় ধরে তাকে কব্জির নড়াচড়াটা দেখাল।

"আলীই আমাদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। ও শট মারলে বল হারিয়ে যায়। কেন যে সে আমাদের স্কুলে এল?" হাফ প্যান্টে বল মুছতে মুছতে তপন বলল।

"আলী?, নতুন ছাত্র নাকি? এখানে তাকে দেখি নি তো?" ইশ বলল। সব ভাল খেলোয়াড়েরাই আমাদের দোকানে আসে এবং ইশ ব্যক্তিগতভাবে তাদের সবাইকে চেনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যা, ব্যাটসম্যান। আমাদের স্কুলে মাত্র যোগ দিয়েছে। তাকে আপনার একটু দেখে আসা উচিত। সে এখানে আসবে না, বুঝেছেন?" তপন বলল।

মাথা নেড়ে সায় দিল ইশ। আমাদের কিছু মুসলমান খদ্দের আছে। তবে তাদের বেশির ভাগই অন্য হিন্দু ছেলেদের মাধ্যমে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে।

"তুমি ক্রিকেট কোচিংয়ে ভর্তি হতে চাও। ইশ নিজে তোমাকে শেখাবে, জেলা পর্যায়ে খেলে সে।" আমাদের আরেকটা যে সার্ভিস আছে তার প্রচার না ক'রে পারলাম না।

"মা রাজি হবে না। বলেছে, শুধু পড়াশোনার টিউশনি নিতে পারব। খেলাধুলার জন্য কোন কোচিং হবে না," তপন বলল।

"ঠিক আছে, খেলাধুলায় ভাল করো," ছেলেটার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে ইশ বলল।

"দেখলি তো, এই জন্যেই ইন্ডিয়া সব ম্যাচে জেতে না," তপন চলে যাওয়ার পরে ইশ বলল।

হ্যা, ইশের একটা হাস্যকর তত্ত্ব আছে : প্রতিটি ম্যাচেই ইন্ডিয়াকে জিততে হবে। "আমাদের সব ম্যাচে জেতার দরকার নেই। তাহলে আর সেটা খেলা থাকবে না," বলে ক্যাশ বাক্স বন্ধ ক'রে দিলাম।

"আমাদের দেশে এক বিলিয়নেরও বেশি লোক আছে। আমাদের সবসময়ই জেতা উচিত," ইশ নাছোরবান্দা।

"পরিসংখ্যানের দিক থেকে সেটা অসম্ভব।"

"কেন? অস্ট্রেলিয়ায় লোকসংখ্যা বিশ মিলিয়ন। তারপরও তারা প্রায় প্রতিটি ম্যাচে জেতে। আমাদের লোকসংখ্যা তাদের চেয়ে পঞ্চাশগুণ বেশি, কাজেই মেধাও পঞ্চাশগুণ বেশি। তাছাড়া ক্রিকেট হচ্ছে ইন্ডিয়ায় একমাত্র খেলা। আর অস্ট্রেলিয়ার তো রাগাবি, ফুটবল, আরো কত কী আছে। কাজেই তাদের কাছে হেরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। বন্ধু, পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে বললে, অস্ট্রেলিয়ার কাছে আমাদের পরাজয়টা হওয়া উচিত ব্যতিক্রম কোন ঘটনা।"

"তাহলে এরকম হয় কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"ঐ বাচ্চাটারে দেখলি তো। ত্রিকোণমিতি আর ক্যালকুলাস বাস্তব জীবনে কখনো কাজে আসে না। এইসব শেখানোর জন্য বাবা-মা হাজার হাজার রুপি খরচ করবে। কিন্তু স্পোর্টস কোচিংকে মনে করবে টাকার অপচয়।"

"চিন্তা করিস না। সেই কাজটা আমরা ক'রে দিচ্ছি। আমাদের দোকান এখন দু'ধরণের সার্ভিসই দেবে।"

"এটা ব্যবসার কথা না, গোবিন্দ। তোর কাছে কি এটাকে শুধু টাকার ব্যাপার বলে মনে হয়?"

"টাকা ভাল জিনিস..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই বাচ্চাগুলোরে দ্যাখ, গোবিন্দ। তের বছর বয়স। গর্ব ভরে হাতে ব্যাট ধরে রেখেছে। আরো ভাল ক'রে কিভাবে বল করা যায় সেজন্য কী রকম আগ্রহ, দ্যাখ। নানা পার্কে ছোটখাট প্রতিটা ম্যাচের আগে তাদের চোখে আগুন দেখা যায়। ইন্ডিয়া জিতলে তারা নাচানাচি করে। শুধু এদের মাঝেই আমি এরকম ভক্তি দেখি। ওদের সাথে থাকতেই ভাল লাগে আমার।"

"যাই হোক," আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

"অবশ্য দু'বছর পরেই তারা ক্লাশ টেনে উঠবে। ব্যাটের জায়গায় ফিজিক্স বই দেখা যাবে তখন। চোখের আগুনও ফিকে হতে শুরু করবে। শীঘ্রই তারা বিষন্ন বয়সী মানুষে পরিণত হবে।"

"সেটা সত্য না, ইশ। প্রত্যেকেরই একটা আকাঙ্খার দরকার হয়। আমারও সেরকম কিছু আছে।"

"তাহলে বেশির ভাগ পূর্ণ বয়স্ক মানুষ এরকম বদমেজাজি হয় কেন? নানা পার্কের বাচ্চাদের মত তারাও এত হাসাহাসি করে না কেন? এত উত্তেজিত হয় না কেন?"

"এবার তুই বদমেজাজ থামিয়ে দোকান পরিষ্কার করার জন্য আমাকে সাহায্য করতে পারবি?"

*

"ঠিক আছে, ঠি আছে, আমরা একটা মদের পার্টি দেব," আমি হাসতে হাসতে বললাম। অমি আর ইশ দু'পাশ থেকে আমাকে শক্ত ক'রে ধরেছে। শেষমেষ তাই রাজি হলাম।

"আমার বাবা অমি কোথায়?" দোকান বন্ধ করার সময়ে বিট্টু মামা ভেতরে এসে ঢুকলেন। নিজের ভাগ্নেকে জড়িয়ে ধরার জন্য এগিয়ে গেলেন তিনি। লাল মখমলের কাপড়ে মোড়া এক প্যাকেট মিষ্টি তার হাতে।

"এত দিন কোথায় ছিলেন, মামা?" অমি বলল, দোকান খোলার পর থেকে তিনি কখনো আমাদের দেখতে আসেন নি।

"পারেখজি'র সাথে পুরো গুজরাট ঘুরলাম। দারুণ অভিজ্ঞতা! এই যে কিছু বেশন লাড্ডু নিয়ে এসেছি। একেবারে বারোদা থেকে," বিট্টু মামা বললেন, আমি একটা ফ্রুটির অর্ডার দিলাম। ইশ টুল টেনে বের করল। আমরা বাইরে বসলাম। একটা লাড্ডু তুলে নিলাম আমি।

"এইটা কী, অমি? জুতো পরে আছিস?" বিট্টু মামার চোখে সুরমা লাগানো। কপালের মাঝখানে লাল টিক্কা দেওয়া।

"মামা?" অমি আমতা আমতা করে বলল। আমি আমার পায়ের দিকে তাকালাম, নকল রিবক স্লিপার পরে আছি আমি। ইশ তার পুরনো স্নিকারটা পরে আছে।

"তোমাদের দোকানটা একটা মন্দিরের ভেতরে আর তুমি জুতো পরে আছ? ব্রাহ্মণ পুরুতের ছেলে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মামা, দেখেন, এইটা মন্দিরের বাইরে। অন্য দোকানীরাও..."

"অন্য দোকানীরা অপদার্থ বেনিয়া। তো তুমিও কি তাদের মতই হতে চাও? দোকান খোলার সময় প্রতি দিন কি তুমি পূজা করো?"

"হ্যা, মামা," অমি সোজা মিথ্যা বলে দিল।

"তোমরাও করো?" ইশ এবং আমার দিকে ইঙ্গিত ক'রে মামা বললেন, "তোমরা হিন্দু ছেলে। এরকম একটা পবিত্র জায়গায় তোমাদের দোকান। অন্তত জুতো খুলে প্রদীপ জ্বালিয়ে তো রাখবে।"

"আমরা এখানে কাজ করার জন্য আসি, আচার পালনের জন্য না," আমি বললাম। এই দোকানটার জন্য আমি এখন পুরো ভাড়াটাই দিই। ব্যবসা কিভাবে চালাতে হবে সেকথা কেউ আমাকে বলে দেয় নি।

মামাকে বিস্মিত দেখাচ্ছে। "তোমার নাম কী যেন?"

"গোবিন্দ।"

"গোবিন্দ কী?"

"গোবিন্দ প্যাটেল।"

"হিন্দু, না?"

"আমি অজ্ঞেয়বাদী," বললাম। দোকান বন্ধ ক'রে বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে সেজন্যে বিরক্ত হয়ে আছি।

"অজ্ঞেয়...?

"ভগবান আছে নাকি নেই সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত নয়," ইশ ব্যাখ্যা ক'রে দিল।

"ভগবানে বিশ্বাস করে না? তোর বন্ধু-বান্ধবেরা কী রকমের রে, অমি?" মামা যারপরনাই হতাশ।

"না, ওটাকে তো নাস্তিক বলে," আমি পরিষ্কার ক'রে দিলাম ব্যাপারটা। "অজ্ঞেয়বাদী মানে ভগবান থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। আমি জানি না আর কি।"

"তোমরা অল্প বয়সী ছেলেপেলে," বিট্টু মামা বললেন, "কী লজ্জা! আমি এসেছিলাম তোমাদের দাওয়াত দেয়ার জন্য, তোমাদের দেখে যাবার জন্য।"

অমি আমার দিকে তাকালে আমি দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম।

"গোবিন্দের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না, মামা। সে বিভ্রান্ত।" আমার ধর্মীয় অবস্থানকে কেউ বিভ্রান্তি হিসেবে চিহ্নিত করলে সেটা আমার ভাল লাগে না। কেন আমাকে কোন বিষয়ে বিশ্বাস করতেই হবে কিংবা করতে হবে না?

ইশ বিট্টু মামাকে ফ্রুটিটা দিলে কিছুটা নরম হয়ে এলেন তিনি।

"তোমার কী অবস্থা?" মামা ইশকে জিজ্ঞেসা করলেন।

"হিন্দু, মামা। আমি প্রার্থনা এবং আর যা যা আছে সব কিছুই করি," ইশ বলল। হ্যা, ঠিকই, ম্যাচে ছয় বল বাকি থাকলে কেবল তখনই সে এরকম ক'রে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামা একটা বড় চুমুক দিয়ে অমি এবং ইশের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তার দৃষ্টি সীমার মাঝে আমি নেই।

"আমাদের দাওয়াত করতে চেয়েছিলেন কী জন্যে মামা?" অমি বলল।

লাল মখমলের কাপড়টা তুলে তিন ফুট লম্বা একটা ত্রিশূল বের করলেন তিনি। দোকানের টিউবলাইটের আলোয় এর ধারালো ফলাগুলো চকচক করছে।

"সুন্দর। কোথায় পেলেন?" অমির জিজ্ঞাসা।

"পারেখজি'র উপহার। তিনি বলেছেন, আমার মাঝে পার্টির ভবিষ্যতকে দেখতে পান তিনি। দিনরাত কাজ করেছি আমি। গুজরাটের প্রত্যেকটা জেলা ঘুরেছি। তিনি বলেছেন, 'বিট্টুর মতো আরো লোক আমাদের থাকলে, মানুষ হিন্দু হওয়ার জন্যে আবার গর্ব বোধ করবে,' আহমেদবাদের তরুণ লোকজনকে রিক্রুট করার দায়িত্ব তিনি আমার ঘাড়ে দিয়েছেন।"

ব্যাপারটা বোঝার জন্য ইশ এবং আমি অমির দিকে তাকালাম।

"পারেখজি হিন্দু পার্টির সিনিয়র লিডার। বরোদার সবচেয়ে বড় মন্দির ট্রাস্ট তিনিই চালান," অমি বলল।

"কী! তিনি মুখ্যমন্ত্রী বা এ ধরণের লোকজনকে চেনেন, মামা?"

"পারেখজি মুখ্যমন্ত্রীকে শুধু চেনেনই না, দিনে দু'বার তার সাথে কথাও বলেন," বিট্টু মামা বললেন। "আর পারেখজি'কে আমি তোর ব্যাপারে বলেছি। অমি, হিন্দুত্বের গর্ব লোকজনকে শেখানোর সম্ভাবনা আমি তোর মাঝে দেখতে পাই।"

"কিন্তু মামা, আমি তো ফুলটাইম কাজ করছি..."

"তোকে তো সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিতে বলছি না। কিন্তু আমাদের আরো বড় যে দায়িত্ব কর্তব্য আছে সেগুলোর প্রতিও খেয়াল রাখবে থাক। যে সব পুরুত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শুধু মুখস্থ শ্লোক আওড়ে যায়, আমরা তো তাদের মত নই। ইন্ডিয়ার ভবিষ্যত প্রজন্ম যাতে ক'রে যথাযথভাবে হিন্দুত্বকে বুঝতেও পারে সেটাও আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। পারেখজি'র বাড়িতে একটা বড় ভোজ সভায় তোদের নেমন্তন্ন করতে চাই। তুমিও আসবে, ইশ। পরের সোমবার, গান্ধি নগরে।"

অবশ্য আমার মত ঈশ্বরবিরোধীকে কোন নিমন্ত্রণ দেয়া হল না।

"ধন্যবাদ মামা। ভালই তো, কিন্তু আমরা পারব কিনা জানি না," ইশ বলল। কিছু লোক যে কিভাবে এত বিনয়ী হয় বুঝতে পারি না।

"কেন? চিন্তার কিছু নেই। শুধু যে পুরুতরাই আসবে তাতো নয়। অনেক তরুণ, কর্মজীবী লোকও আসবে সেখানে।"

"আমি রাজনীতি পছন্দ করি না," ইশ বলল।

"হুহ্?" এটা রাজনীতি না, বাবা। এটা জীবন বিধান।"

"আমি আসব," অমি বলল।

"কিন্তু তোমাকেও আসতে হবে, ইশ। আমাদের তরুণ রক্ত দরকার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইশ ইতস্তত করতে থাকল।

"ও?" তুমি ভাবছ পারেখজি পুরনো আমলের রক্ষণশীল লোক। জোর করে তোমাকে ধর্মগ্রন্থ পড়াবে। পারেখজি কোন্ কলেজে পড়েছে জানো? কেমবৃজ, হারার্ভাডে। আমেরিকায় তার বিরাট হোটেল ব্যবসা ছিল। সেটা বেচে তিনি চলে এসেছেন। তোমার ভাষাতেই কথা বলেন তিনি। আর তিনি ক্রিকেটও খেলতেন, কেমবৃজ কলেজ টিমের হয়ে।"

"গোবিন্দ আসলে আমিও আসব," নির্বোধ ইশ বলল।

মামা আমার দিকে তাকালেন। তার দৃষ্টিটা এমন যেন শুধু আমার কারণেই হিন্দু সংস্কৃতির সাম্প্রতিক অবক্ষয়গুলো ঘটেছে।

"আচ্ছা, তোমাদের তিনজনেরই নেমন্তন্ন করার জন্য এসেছিলাম আমি। সে তো বলেই দিয়েছে সে ভগবানে বিশ্বাস করে না।"

"আমি ওটা বলি নি," আমি বললাম। ভাবলাম ব্যাপারটা ভুলে থাকতে পারলেই ভাল হয়।

"তাহলে তুমিও এসো," মামা উঠে দাঁড়ালেন। "তোমরা তিনজনেই। অমির কাছে আমি ঠিকানা দিয়ে দেব। গান্ধি নগরের সবচেয়ে রাজকীয় বাড়ি এটা।"

লোকজন আমাকে বলে মিঃ অ্যাকাউন্টেন্ট, লোভী, কৃপন ইত্যাদি। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, আমার দোকানের পার্টনারদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমি নিজ খরচে একটা মদের পার্টি দিয়েছি। আহমেদবাদে মদ পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার আর বিয়ারের মোটা বোতল তো দূরের কথা। আমার পরিচিত একজন রোমি ভাই, হাজার রুপির বিনিময়ে এক ক্রেট কড়া বিয়ার যোগান দিতে রাজি হয়েছেন।

পার্টির দিন সন্ধ্যা ৭টার সময় রোমি ভাই এসবিআই কম্পাউন্ড এনট্রান্সে কাপড়ে মুড়ে বিয়ার রেখে গেলেন। গেটে এসে আমি রোমি ভাইকে ঐদিনের খবরের কাগজটা দিলাম। খবরের কাগজের তৃতীয় পৃষ্ঠায় একশ রুপির দশটা নোট স্ট্যাপল ক'রে রেখেছিলাম। তিনি হ্যা-সূচক মাথা নেড়ে চলে গেলেন।

কাপড়ে মোড়ানো পোটলাটা ভেতরে টেনে এনে রান্নাঘরে বরফ ভরা যে তিনটি ঝুড়ি রেখে দিয়েছিলাম তাতে বোতলগুলো রেখে দিলাম। বোতল খোলার যন্ত্রটা বের করলাম রান্নাঘরের তাক থেকে। এই তাকটাতেই আমরা সবকিছু রেখে দিই ম্যাগি নুডলস থেকে শুরু করে ম্যাচে ইন্ডিয়ার জিত হলে ফোটানোর বাজি, সবকিছু।

অন্য কেউ দেখলে পরিত্যাক্ত এসবিআই শাখাকে রহস্যজনক পার্টি ভেনু হিসেবে মনে করবে। একটা বুড়ো লোকের হাভেলি ছিল এটা। মালিক টাকা শোধ করতে পারে নি বলে ব্যাংক সম্পত্তিটা নিয়ে নেয়। তারপরে ব্যাংক ঐ হাভেলিতে একটা শাখা খুলে বসলেও মালিক মারা যাওয়ার পরেই তার পরিবার মামলা করে বসে। এখনও সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাদের মীমাংসা হয় নি। ঐ পরিবার আদালতের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছে, ব্যাংক এই সম্পত্তি ব্যবহার ক'রে কোন লাভ করতে পারবে না। ইতিমধ্যে এসবিআই উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, ছোট ছোট গলির বেলরামপুর শাখা অফিস খোলার জন্যে বাজে জায়গা। ঐ এলাকা ছেড়ে দিয়ে তারা আদালতের কাছে চাবি দিয়ে দিয়েছে। আদালতের কর্মকর্তারা এলাকায় আস্থাভাজন লোক অমির বাবার কাছে একটা চাবি রাখে। আদালত বন্ধ থাকাকালীন যদি কর্মকর্তারা ঐ সম্পত্তি দেখতে চায়, সেজন্যেই এই ব্যবস্থা। অবশ্য এ পর্যন্ত তেমন কেউ এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি। ফলে ঐ চাবিগুলো মাঝে মধ্যে অমি ব্যবহার ক'রে থাকে।

সম্পত্তিটা ছয়শ' বর্গ গজের একটা প্লট, বেলরামপুরের বিচারে বিশাল কিছু। সামনের প্রবেশ পথটা সরাসরি শোবার ঘর পর্যন্ত গিয়েছে। এখন ঘরটা পরিত্যাক্ত ব্যাংক কাস্টমার সার্ভিস এরিয়া। দুই তলার বেডরুম তিনটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের অফিস, ডাটা রুম এবং লকার রুম। ম্যানেজারের অফিসে ছয় ফুটের একটা বিশাল ভল্ট আছে। সিন্দুকটা খালি থাকে বলে আমাদের ক্রিকেটের উপকরণগুলো ওখানেই রেখে দেই।

হাভেলির উঠোনেই মূলত আমাদের সময় কাটানো হয়। হাভেলির সুবর্ণ সময়ে একটা ধনী পরিবারের লন ছিল এটি। আর ব্যাংকের ব্রাঞ্চ যখন এখানে ছিল তখন এটা গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা ছিল। তবে ব্যবহৃত হত কমই। এখন এটাই আমাদের প্র্যাকটিস পিচ।

বরফের ঝুড়িতে বিয়ারের বোতলগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমপরিমাণে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলাম। দেখতে পেলাম ইশ ব্যাংক চেকছে।

"অনেক দেরি হল," আমি বললাম, "এখন ৮টা ৩০ বাজে।"

"দুঃখিত, ক্রিকেট হাইলাইটস দেখছিলাম। ওয়াও, কড়া বিয়ার," একটা বোতল তুলতে তুলতে ইশ বলল। নিচ তলায় পুরনো কাস্টমার ওয়েটিং এরিয়ার সোফায় বসলাম আমি। কিছু ভুজিয়া আনার জন্য ইশ রান্না ঘরে চলে গেল।

"অমি এখানে আছে?" প্যাকেট খুলতে খুলতে ইশ বলল।

"না। আমি হলাম এখানকার একমাত্র বোকা। ডেলিভারিটা গ্রহন করে জায়গাটা পরিষ্কার করেছি, তারপর আমার প্রভুরা কখন এসে পৌছাবে সেই প্রতীক্ষায় বসে আছি।"

"পার্টনার বন্ধু, পার্টনার," ইশ কথাটা সংশোধন ক'রে দিয়ে বলল। "একটা বোতল খুলব?"

"না, অপেক্ষা কর।"

দশ মিনিট পরে অমি এল। সে অজুহাত দেখালো মন্দির পরিষ্কার করার জন্য তার বাবা তাকে সময় মত আসতে দেয় নি। তারপর মদ পানের আগে আবারও ক্ষমা চাইল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চিয়ার্স!" একটা বড় চুমুক দিয়ে আমরা সবাই বলে উঠলাম। তেতো স্বাদ, তবে ফিনাইলের চেয়ে স্বাদটা একটু ভাল।

"কী এটা? আসল জিনিস তো?" ইশ জিজ্ঞেস করল। আমরা সবাইপান করা থামিয়ে দিলাম। ভেজাল মদ আহমেদাবাদে নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা।

"না, নকল বিয়ার কেউ তৈরি করে না। এটা শুধু একটু বেশি কড়া," আমি বললাম।

ভুজিয়া দিয়ে মুখ ভর্তি করলে বিয়ারের স্বাদে অর্ধেক কটুও হতো না। অর্ধেক বোতল খাওয়ার পরে স্বাদ অনেক ভাল লাগল আমাদের কাছে। সবার মেজাজও ভাল হয়ে গেল সেই সঙ্গে।

"আলী ছেলেটাকে আমি দেখতে চাই। তিনজন খদ্দের তার কথা বলেছে," ইশ বলল।

"মুসলমান ছেলেটা?" অমি বলল।

"তোর মামার মত ক'রে কথা বলবি না," ইশ ভর্ৎসনা করল, "এটা কি বলার মত কিছু হল? ওরা বলছে, তার টাইমিং নাকি চমৎকার।"

"সে খেলে কোথায়?" মুখ ভর্তি ভুজিয়া নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমাদের স্কুলে। বাচ্চারা বলে তার সবচেয়ে কমন শট হচ্ছে ছক্কা।"

"চল, তাকে দেখে আসি। মনে হচ্ছে স্কুল তোর একজন যোগ্য উত্তরসূরী পেয়ে গেছে," আমি বললে ইশ চুপ ক'রে গেল। স্পর্শকাতর কথা এটি। বিয়ার না খেলে হয়ত এরকম কথা বলতাম না।

"ইশের উত্তরসূরী হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার," অমি বলল, "মহিপ মিউনিসিপ্যাল স্কুলের বিরুদ্ধে ওর যে সেঞ্চুরিটা হয়েছিল সেটা মনে আছে? মাত্র তেষট্টি বলে। ঐ ইনিংসের কথা কেউ ভুলবে না।" অমি উঠে দাঁড়িয়ে আবার ইশের পিঠ চাপড়ে দিল। যেন দশ বছর আগের ম্যাচটা কয়েক মিনিট আগে শেষ হয়েছে।

"স্টেট সিলেকশন ট্রায়ালের শূন্য রানে দু'বার আউট হবার কথাও কেউ ভুলবে না," কথাটা বলেই ইশ আবার চুপ করে গেল।

"আরে রাখ। তুই তো তখন ফর্মে ছিলি না," অমি বলল।

"কিন্তু ঐ ম্যাচগুলো নিয়ে এখন কথা বলার কোন মানে হয় না। টপিকটা কি এবার পাল্টানো যায়?"

অমি চুপ মেরে গেলে আমি আনন্দের সাথেই কথা বলার বিষয়টা পাল্টে দিলাম। "আমার মনে হয় আজ রাতে আমাদের স্পন্সরকে, মানে টিম ইন্ডিয়া ক্রিকেট শপ'কে আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। সাত মাসেই আমাদের লাভ ৪২৬০০ রুপি। এর মধ্যে পার্টনারদের ১৮০০০ রুপি দেওয়া হয়েছে, আর ২২০০০ রুপি নবরংপুর দোকানের জন্য ডিপোজিট দেওয়া আছে, বাকি ২৬০০ রুপি আজ রাতের বিনোদনের জন্যে বরাদ্দ। কাজেই, প্রিয় শেয়ার হোল্ডার এবং পার্টনারগন, আপনাদের সবাইকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধন্যবাদ। চিয়ার্স বলে এবার দ্বিতীয় বোতলটা খোলা হোক।"

বরফের ঝুড়ি থেকে দ্বিতীয় বোতলটা বের করলাম আমি।

"সুবোধ ছেলে," ইশ দাঁড়িয়ে পড়ে বিড় বিড় ক'রে বলল। "এই ব্যবসা এবং এর লাভ সবকিছুর অবদান আমাদের সুবোধ ছেলে মিঃ গোবিন্দ প্যাটেলের। ধন্যবাদ, তোমাকে বন্ধু। তোমার জন্যেই এই ড্রপ-আউট মিলিটারি ক্যাডেটের একটা ভবিষ্যত সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে এই নির্বোধটারও ভবিষ্যৎ আছে। অন্যথায় ওকে মন্দিরের ঘণ্টা বাজাতে হতো। এসো জড়িয়ে ধরি, সুবোধ ছেলে।"

সে আমাকে জড়িয়ে ধরার জন্য এগিয়ে এল, মাতাল অবস্থার স্নেহ এটা, কিন্তু যথেষ্ট নিখাদ। "আমার জন্যে আরো একটা কাজ করে দেবে, বন্ধু?" ইশ বলল।

"কী?"

"একজনের গণিতের টিউশন দরকার," ইশ বলল।

"না, আমার সময় নেই, ইশ। সাত জন স্টুডেন্ট হয়ে গেছে..." আমি বললাম।

ইশ আমার কথায় বাধা দিল, "বিদ্যার জন্যে বলছিলাম।"

"তোর বোন?"

"বারো ক্লাশ শেষ করেছে। মেডিকেলে ভর্তির জন্য এখন একটা বছর ড্রপ দিচ্ছে।"

"ডাক্তার হওয়ার জন্যে তো গণিতের দরকার নেই।"

"না, কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় দরকার আছে। ওর খুব ভয় এটা নিয়ে। তুই-ই সেরা, তুই ছাড়া আর কার উপরে বিশ্বাস করতে পারি?"

"তোর বোন, মানে..." একটা নিঃশ্বাস নিলাম আমি। "ওয়াও, বিদ্যা মেডিকেল কলেজে যাবে! এত বড় হয়ে গেছে?"

"প্রায় আঠারো, বন্ধু।"

"অবশ্য আরো ছোট বাচ্চাদের পড়াই আমি। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী। ওর কোর্স তো আরো বেশি এ্যাডভান্স। এখন তো ঐ কোর্সের টাচে নেই আমি।"

"কিন্তু তুই তো শালা ঐ সাবজেক্টে একশতে একশ পেয়েছিলি। একটু চেষ্টা কর। তাহলে ওর সমস্যার সমাধান হবে।"

কিছুক্ষণ ধরে চুপ থাকলাম। মনে ক'রে দেখলাম বিদ্যার সম্পর্কে যা জানি তা খুবই কম।

"কী ভাবছিস? ওহ্ মিঃ অ্যাকাউন্টস, চিন্তার কিছু নেই। তোকে টাকা দেওয়া হবে," বলে ইশ একটা বড় চুমুক দিল।

"চুপ থাক। তোর বোনের জন্য তো? ঠিক আছে, আমি করব। কবে শুরু করতে হবে?"

"সোমবার থেকে...না, সোমবারে পারেখজির দাওয়াত। ধুর, আমরা ওখানে কোন্ বাল ফেলতে যাবো, অমি? তোর মামাকে খুশি করার জন্য?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবরংপুরে যাওয়ার জন্য আর তর সইছে না আমার।

"পারেখজিকে মহান মানুষ বলেই মনে হচ্ছে আমার," অমি বলল। "আমি তো সবসময় তোদের কথা শুনি, এবার আমার জন্য কিছু একটা কর।"

"যাই হোক, তাহলে মঙ্গলবার," আমি ইশকে বললাম।

"তাহলে বিদ্যা কি ব্যাংকে আসবে নাকি?"

"বাবা ওকে বাইরে একা ছাড়বে না। তুই বাড়িতেই আসবি।"

"কী?" এজন্যে হয়ত বাড়তি টাকা দাবি করা উচিত। "ঠিক আছে, আমি কয়েকটা ক্লাশের সময় বদলে নেব। ধর, তাহলে সন্ধ্যা সাতটা বাজে?"

"নিশ্চয়। এবার একটা সহজ অঙ্কের প্রশ্নের জবাব দাও, মিঃ একাউন্টস," ইশ বলল।

"কী?"

"তুই দশ বোতলের এক ক্রেটের অর্ডার দিয়েছিলি। আমরা প্রত্যেকে তিন বোতল ক'রে খেয়েছি, দশম বোতলটা কই?" ইশ টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

আমিও দাঁড়ালাম। "দশ নম্বর বোতলটা কোথায় সেটা কোন প্রশ্ন নয়, বরং ওটা কার কাছে আছে সেটাই হল কথা।" বরফের ঝুড়ির দিকে ঝুঁকলাম আমি, ইশও লাফিয়ে এগিয়ে এল সেদিকে। বোতল ধরে টানাটানি করতে করতে মেঝেতে ঠাণ্ডা পানি ছড়িয়ে পড়ল। দশ সেকেন্ড ধরে টানাটানির পরে বোতল ছেড়ে দিল সে। "এই নে, বন্ধু। তোরে বাদ দিয়ে আমি কি কিছু করতে পারব?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৪

সন্ধ্যা প্রায় আটটার দিকে পারেখজি'র বাড়িতে পৌঁছলাম আমরা। নাম জিজ্ঞেস ক'রে গেটের দুই সশস্ত্র প্রহরী আমাদের ভেতরে যেতে দিল। বাড়ির প্রবেশদ্বারে ব্যাপক রঙ্গোলি, ডজন ডজন বাতি আর তাজা ফুল।

"আরে কারা এসেছে দ্যাখো," বিট্টুর মামার সাথে দরজায় দেখা হল। "কথা শুরুর আগে রাতের খাবার খেয়ে নে।" একটা আরতির থালা থেকে বড় লাল টিক্কা নিয়ে আমাদের কপালে লাগিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, রাতের খাবার শেষে পারেখজি কথা বলবেন।

বিশাল ফুড কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। গুজরাটি ভোজ মানেই যত ধরনের সবজির নাম মানুষের জানা, সব তাতে থাকবে। কোন অ্যালকোহল নেই। তবে সম্ভবপর সব ধরণের ফলের রস আছে। এই ধরণের পার্টিতে গেলে আফসোস হয় আমাদের মাত্র একটা ক'রে উদর আছে ব'লে। একটা জিন পিজ্জা তুলে নিয়ে বিশাল আকারের কামরার চারদিকে তাকালাম। পঞ্চাশ জন অতিথি রয়েছে। হয়ত সাদা নয়ত গেরুয়া রঙের কাপড় পরে আছেন। পারেখজি গেরুয়া রঙের ধুতি আর সাদা জামা পরে আছেন, সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটেছে তার পোশাকে। ইশ পরে আছে কালো মেটালিকা টি শার্ট, মাথায় খুলি আর ক্রসবোন আঁকা তাতে। এই পোশাকে এরকম জায়গায় বেমানান দেখাচ্ছে তাকে। লোকগুলোর চুল হয়ত ধূসর নয়ত টাকমাথা। মনে হচ্ছে বিয়ের কোন অনুষ্ঠান এটা, শুধু পুরোহিতদেরই এখানে দাওয়াত করা হয়েছে। বেশির ভাগ লোকের কাছেই ত্রিশুল বা রুদ্রাক্ষ কিংবা কোন ধর্মীয় বই আছে।

ইশ আর আমি একে অন্যের দিকে তাকালাম, আমরা এখানে কী করছি, এরকম একটা ভাব।

দু'জন লোক এক সাথে বসে আছে। তারা সাদা আর গেরুয়া রঙের পোশাক পরে আছে। একজন ধূসর চুলের আর অন্যজন টাকমাথার। অমি তাদের সামনে গিয়ে তাদের চরণ স্পর্শ করলে লোক দু'জন আশীর্বাদ করল তাকে। এধরণের লোকজনের সাথে প্রায়ই অমির দেখা সাক্ষাত হয়। সে হিসেবে মাথা পিছু আশীর্বাদ স্বরুপ আয়ের দিক দিয়ে ইন্ডিয়ায় সে অন্যতম বড়লোক।

"খাবারটা দারুণ, তাই না?" অমি ফিরে এসে বলল। গুজরাটের খাবার সবসময়ই ভাল হয়। তারপরও লোকজন এরকম কথা বলে। ইশ তার জৈন-ডিমসামটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই লোকগুলো কারা?" আস্তে ক'রে জিজ্ঞেস করলাম।

"বোঝাই যাচ্ছে," অমি বলল। "গেরুয়া রঙের পোশাকের লোকগুলো পুরুত বা কোন ধর্মীয় লোক। শহর থেকে এসেছে তারা। সাদা পোশাক যারা পরে আছে ওরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকজন। কিরে, তুই ডিমসাম খাচ্ছিস না কেন?"

"চাইনিজ ভাল্লাগে না," ইশ বলল, "পারেখজি লোকটা কে?"

"ও, সে-ই তো পথপ্রদর্শক," অমি বলল, "বা তার নিজের ভাষায় এক নগন্য লোক। আসলে সে হচ্ছে মন্দিরের চেয়ারপার্সন, রাজনীতিবিদদের সাথে ভাল করেই চেনা জানা আছে তার।"

"তার মানে সে একজন দো-আঁশলা। রাজনৈতিক-পুরুত," আমি ফোঁড়ন কাটলাম।

"একটু শ্রদ্ধা-ভক্তি রেখে কথা বলতে পারিস না? আর এই টি-শার্টটা কি, ইশ?"

বৈঠকখানার মাঝখানে পারেখজি আসতেই সবাই চুপ মেরে গেল। সঙ্গে ক'রে লাল রঙের একটা গদি এনেছেন। বেশ আরামদায়ক মনে হচ্ছে সেটা। সবাইকে গালিচার উপরে বসে পড়ার ইঙ্গিত করলেন তিনি। মাছের ঝাঁকের মত গেরুয়া রঙের পোশাক পরা লোকগুলো সাদা পোশাকের লোকগুলো থেকে আলাদা হয়ে দুটো দলে ভাগ হয়ে বসে পড়ল।

"আমরা বসি কোন্ জায়গায়?" আমার দিকে তাকিয়ে ইশ বলল। একটা নীল রঙের টি-শার্ট আমার গায়ে। আমার রঙের সাথে মিলিয়ে কোন জায়গা পেলাম না। বিটু মামা অমির কনুই ধরে টেনে আমাদের গেরুয়া রঙের পোশাকের লোকদের সাথে বসার জন্য বললে আমরা বসে পড়লাম। নিজেদেরকে খুব বেমানান মনে হচ্ছে। তিনটা গেরুয়া রঙের চাদর নিয়ে এসে বিটু মামা সেগুলো আমাদের দিয়ে দিলেন।

"কী? আমি তো..." অমির কাছে আপত্তি জানিয়ে বললাম আমি।

"হিশ্‌শ্...পরে নে," অমি বলল।

চাদরটা গলায় চারপাশে কীভাবে জড়াতে হবে ও দেখিয়ে দিল।

পারেখজি তার চমৎকার জাদুর গদিতে বসে পড়লে পিন-পতন নীরবতা নেমে এল। ইশ একবার আঙুল মটকালে অমি বিরক্ত হয়ে তাকালো তার দিকে। সবাই চোখ বন্ধ করলেও শুধু আমি খোলা রাখলাম। সবাই যখন সংস্কৃত মন্ত্র জপ্ করছে তখন চারিদিকটা তাকিয়ে দেখে নিলাম। এক মিনিট পরে জপ শেষ হলে পারেখজি তার বক্তব্য শুরু করলেন।

"স্বাগতম ভক্তরা আমার। এই ক্ষুদ্র ঘরে আপনাদের স্বাগতম, বিশেষ ক'রে আমার ডান দিকে সিন্ধিপুর মন্দির থেকে যারা এসেছেন, তাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এক মাস ধরে অযোধ্যায় করসেবার পরে তারা ফিরে এসেছেন। আসুন আমরা তাদের প্রণতি জানাই, তাদের মঙ্গল কামনা করি।"

ত্রিশূলধারী গেরুয়া পোশাকের ছয় জনের দলটাকে সবাই প্রণতি জানাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেখজি বলে চললেন, "আজ কিছু তরুণও আমাদের মাঝে হাজির হয়েছে। তাদেরকে আমাদের বড় প্রয়োজন। এজন্যে বিট্টু মামাকে ধন্যবাদ। তিনিই তাদের নিয়ে এসেছেন। দলের জন্য বিট্টু কঠোর পরিশ্রম করছেন। পরের বছর নির্বাচনে তিনি আমাদের প্রার্থী হাসমুখজিকে সমর্থন দেবেন।"

প্রত্যেকে আমাদের দিকে তাকালে হেসে মাথা নেড়ে জবাব দিলাম আমরা।

"ভক্তরা, হিন্দু ধর্ম আমাদের বেশি ক'রে ধৈর্য ধারণের কথা বলে। আর আমরাও অনেক বেশি ধৈর্য ধরি। সুতরাং আজকের আলোচনা হচ্ছে, 'কতটুকু ধৈর্য ধারণ যথেষ্ট? কতক্ষণ ধরে একজন হিন্দুর ধৈর্য ধারণের কষ্ট পোহানো উচিৎ'।"

প্রত্যেকে মাথা নেড়ে সায় দিল। আড়াআড়ি পা ভাঁজ ক'রে বসে থাকার ফলে ব্যথায় হাঁটু নাড়াতে কষ্ট হচ্ছে। ভাবলাম এভাবে কষ্ট না ক'রে পা মেলে বসব কিনা।

"আমাদের ধর্মগ্রন্থ অন্যের ক্ষতি করতে নিষেধ করে," পারেখজি বললেন। "সব ধর্মকেই গ্রহণ করতে বলে, এমন কি যদি সেই ধর্মে আমাদের গ্রহণ নাও করা হয়। আমাদেরকে সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের জ্ঞানী ব্যক্তিরা এমন সব গুণ শিখিয়ে গিয়েছেন আজও যা প্রয়োজন আর আজকে আপনারা, মহান ব্যক্তিরা, সমাজে এই সব গুণের প্রচার করছেন।" পুরোহিতদের দিকে ইঙ্গিত ক'রে পারেখজি বললে পুরোহিতেরা মাথা নেড়ে সায় দিল।

"একই সাথে ধর্মগ্রন্থ আমাদের অবিচার করতেও নিষেধ করে। গীতায় অর্জুনকে ন্যায়যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। তার মানে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের যুদ্ধ করারও দরকার আছে। কখন? সে কথা ভাবতে হবে।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়ল উপস্থিত লোকজন। জাদুময় লাল গদির ব্যাপারে আমার একটু বিরাগ আছে। তারপরও পারেখজির কথায় ভুল নেই।

"আর এখন সেই অবিচারই আমি দেখছি। হিন্দুদের বলা হচ্ছে ছাড় দিতে, সবকিছু মেনে নিতে, ধৈর্য ধরতে। হিন্দুরা একটা মন্দির পুণর্নির্মাণ করতে বলেছিল। যে সে মন্দির সেটা নয়। সেই মন্দিরে আমাদের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ভগবান জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সেটা আমাদের কাছে দিতে চায় না। আমরা বলেছি, আমরা মসজিদটাকে সম্মানের সাথে এক কোণায় নিয়ে যাব। কিন্তু না, সেটাকে তারা অযৌক্তিক মনে করেছে। আমরা প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু সেটা আমলে নেওয়া হয় নি। এটা কি সুবিচার? আমরা কি এটা সহ্য ক'রে যাব? আমি বৃদ্ধ লোক, উত্তর আমার কাছে নেই।"

ইশ আমার কানে ফিসফিস ক'রে বলল, "রাজনীতি। একদম খাঁটি রাজনীতি।"

পারেখজি বলে চললেন : "এই দেশ কাদের, সে দিকেও আমি যেতে চাই না। হতভাগা হিন্দুরা অন্যের দ্বারা শাসিত হতে হতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ৭০০ বছর ধরে মুসলমানেরা আর ২৫০ বছর ধরে বৃটিশেরা শাসন করেছে তাদের। আমরা এখন স্বাধীন, কিন্তু হিন্দুরা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরছে না। তবে দুঃখের বিষয়, আমাদেরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমান বলেও গণ্য করা হচ্ছে না। নিজেদের তারা ধর্মনিরপেক্ষ বলে কিন্তু অগ্রাধিকার দেয় মুসলমানদের। আমরা সমান অধিকারের জন্য লড়াই করছি। আর বলা হচ্ছে আমরা নাকি সাম্প্রদায়িক? সবচেয়ে নিষ্ঠুর সন্ত্রাসী হচ্ছে মুসলমানরা। কিন্তু তারা আমাদের বলে কট্টরপন্থী। মুসলমানদের তুলনায় অনেক হিন্দু শিশু পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে যায়, কিন্তু তারা বলে মুসলমানেরা পদদলিত।"

পারেখজি এক গ্লাস পানি খাওয়ার জন্য থামলেন। "তারা আমাকে বলে, পারেখজি, এত রাজনীতিকদের সাথে আপনার পরিচয় কেন? আমি বলি, আমি ভগবানের দাস। রাজনীতিতে আমি জড়াতে চাই নি। কিন্তু হিন্দু হিসেবে আমি যদি সুবিচার চাই, তাহলে দেশ পরিচালনায় নিজেকে জড়ানো দরকার। রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া ছাড়া আর কী উপায় আছে, বলুন? সেজন্যেই আমি অর্ধেক সাদা আর অর্ধেক গেরুয়া রঙের পোশাক পরে আছি আপনাদের সেবা করার জন্য।"

শ্রোতারা আস্তে ক'রে হাত তালি দিলে অমিও দিল। ইশ আর আমি চরম বিরক্ত, কোন প্রতিক্রিয়া দেখালাম না আমরা।

"কিন্তু তারপরও আশা আছে। আপনারা জানেন সেই আশার উৎস কোথায়। গুজরাট। আমাদের রাজ্যটা ব্যবসায়ীদের রাজ্য। ব্যবসায়ীদের নিয়ে আপনি হাজারটা খারাপ কথা বলতে পারেন, কিন্তু একটা ব্যাপার অস্বীকার করতে পারবেন না, ব্যবসায়ীরা বাস্তবতা বোঝে। তারা জানে কিভাবে সব কিছু একসাথে জোড়া লাগাতে হয়, কিভাবে দুনিয়াটা চলে। ভণ্ডামি কিংবা অসদুপায় আমরা সমর্থন করি না। সেই কারণেই আমরা ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোকে নির্বাচিত করব না। আমরা সাম্প্রদায়িক নই, আমরা সৎ। আমরা যদি প্রতিক্রিয়া দেখাই তার কারণ দীর্ঘদিন ধরে আমরা কষ্ট সহ্য ক'রে আসছি।"

তুমুল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল শ্রোতারা। বিরতির সুযোগে পারেখজির বাড়ির সামনের বাগানে গিয়ে সেখানে সাংঘাতিক রকমের বাঁকা একটা দোলনায় বসলাম।

পারেখজি ভেতরে দশ মিনিট ধরে কথা বললেন। সেসব কথা আমার কান পর্যন্ত পৌঁছালো না। আকাশে তারার দিকে তাকিয়ে মখমলের গদিতে বসা লোকটার কথা ভাবতে লাগলাম আমি। অদ্ভুত ব্যাপার, তার প্রতি আকর্ষণও হচ্ছে, আবার বিরাগও হচ্ছে। তার মাঝে এক সাথে আধ্যাত্মিক শক্তি আর পাগলামো দুটোই আছে।

তার কথা বলা শেষে আরো কিছু সমাপনী মন্ত্র পাঠ করা হল। তারপরে ভুজ থেকে আসা দু'জন পুরোহিত ভজন শুরু করলে ইশ বাইরে বেরিয়ে এল। "তুই এখানে?"

"আমরা কি এখন বাড়ি যেতে পারি?" আমি বললাম।

মঙ্গলবার সন্ধ্যে সাতটার সময় ইশানের বাড়ি গেলাম। বিদ্যা পড়ার টেবিলে বসেছিল। তার ঘরটা মেয়েদের ঘর যে রকম হয় সে রকম করেই গুছিয়ে রাখা। বেশ পরিচ্ছন্ন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ সুন্দর আর অনেক বেশি গোলাপী। নানান রকম খেলনা আর পোস্টার দিয়ে দেয়াল সাজানো হয়েছে। পোস্টারগুলোতে 'আমিই বস্' ধরণের মুখরোচক কথা লেখা। চেয়ারে বসে পড়লাম। বাদামী দুই চোখে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আমার দিকে তাকাল সে। খেয়াল না ক'রে পারলাম না, তার শিশুসুলভ মুখখানা সুন্দরী নারীর মুখের মত হয়ে যাচ্ছে যেন।

"অঙ্কের কোন্ জিনিসগুলো ভাল পারো তুমি?"

"কোনটাই পারি না আসলে," সে বলল।

"বীজগণিত?"

"না।"

"ত্রিকোণমিতি?"

"যাই বলেন না কেন।"

"ক্যালকুলাস?"

সুন্দরী নারী তার ভ্রু উপরে তুলল। যেন কোন হরর মুভির কথা বলেছি আমি।

"সত্যি?" আমার প্রিয় সাবজেক্টে তার এরকম উদাসীনতা দেখে বিরক্ত হলাম।

"আসলে অংক বেশি পছন্দ হয় না আমার।"

"হুমমম," আমি বললাম, চিন্তামগ্ন অধ্যাপকের মত ভাব নেওয়ার চেষ্টা করলাম। "বেশি পছন্দ হয় না, নাকি কিছু জিনিস বোঝ না, তারপর থেকে আর ভাল্লাগে না? অঙ্ক মজার জিনিস, জানো তো?"

"মজার!" বিরক্ত হয়ে বলল সে।

"হ্যা।"

সোজা হয়ে বসে হাত নেড়ে অসম্মতি জানাল। "আমার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। অঙ্ক পছন্দ না করার যুক্তি আছে আমার। তেলাপোকা আর টিকটিকির সাথে থাকার মত মনে হয় অঙ্ক ব্যাপারটাকে। বিরক্তি চলে আসে। বমি বমি লাগে। হতাশ হয়ে পড়ি। ধরেন, একটা ইলেকট্রিক শক আর অঙ্ক এই দুটোর মধ্যে বেছে নিতে বললে আমি প্রথমটাই বেছে নেব। শুনেছি রাজস্থানে নাকি পানি আনার জন্য কিছু লোককে দু'মাইল পথ হাটতে হয়। অঙ্ক নিয়ে আমার ঝামেলাগুলো ফেরি করার জন্য প্রতিদিন অতদূর হাঁটতে হবে আমাকে। মানুষ যত জিনিস আবিষ্কার করেছে এর মধ্যে অঙ্ক হচ্ছে সবচাইতে জঘন্য। ওরা ভাবেটা কী? ভাষা খুব সোজা জিনিস, তারপর চলেন আমরা কিছু ভয়ঙ্কর চিহ্ন আবিষ্কার করি। তারপর প্রত্যেক জেনারশনের বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্য এগুলো প্রচার ক'রে বেড়াই। সাইন থেটা যদি কস থেটার চাইতে আলাদা হয় তাতে কার কী এসে যায়? ঘন'র যোগফলের বিস্তৃতি জানার ইচ্ছা হয় কার?"

"ওয়াও, দারুণ বলেছো তো," আমি বললাম। আমার মুখ হা হয়ে গেছে।

"আর মজা? অঙ্ক যদি মজার হয়, তাহলে দাঁত তুলে ফেলাও মজার। ভাইরাস সংক্রমণও বেশ মজার। জলাতঙ্কও মজার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার মনে হয় অঙ্কের ব্যাপারে তোমার ধারণা ভুল।"

"ওহ্ হো হো, ওই কথা বলবেন না, ভুল ধারণা–তা নয়। অঙ্ক নিয়ে আমি এক সাথে থাকছি, ছাড় দিয়েছি, যুদ্ধ করেছি এর সাথে। বছরের পর বছর এই ঝামেলার সম্পর্ক বজায় রাখছি। ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত এই সাবজেক্টটা লেগেই থাকে। ভূত-প্রেত নিয়ে মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে। আর সারপ্রাইজ ম্যাথ-টেস্ট নিয়ে আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। আপনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন জানি। অঙ্ক আপনার প্রিয় জিনিস। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, সারা দুনিয়ায় ছাত্র-ছাত্রিদের কাছে অঙ্ক একটা বিষয় মাত্র।"

নিঃশ্বাস ফেলার জন্য থামল সে। মনে হল উঠে গিয়ে দৌড়ে পালাই। বুনো জন্তুকে পোষ মানানোর উপায় কী আর?

"কী?"

"গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। দেখেন না," কামিজের আস্তিন গুটাতে গুটাতে ও বলল। ওর ত্বকে ছোট ছোট গোলাপী ফুটকি দাগ, মনে হল অঙ্কের ভয়ের চাইতে প্রচণ্ড আবেগর বহিঃপ্রকাশের ফলাফল এগুলো।

ওর কৃশকায় বাহুর দিকেও নজর গেল আমার। পাতলা ফর্সা যে ভেতরের তিনটা শিরা দেখা যাচ্ছে। হাতের রেখাগুলো গভীর। ব্যতিক্রমী রকম দীর্ঘ আয়ুরেখা। খুব সরু বলে হাতের আঙুলগুলো লম্বা দেখায়। নখের শুধু বাইরের প্রান্তে চকচকে রূপালি সাদা নেইল পালিশ লাগিয়েছে। মেয়েদের মাথায় এসব আইডিয়া আসে কীভাবে?

"কী?" অনেকক্ষণ ধরে ওর বাহুর দিকে চেয়ে আছি দেখে ও বলল।

তৎক্ষণাৎ একটা পাঠ্যবই খুললাম। "কিছু না। আমার কাজ হচ্ছে তোমাকে অঙ্ক শেখানো, ভাল লাগানো না। তুমি ডাক্তার হতে চাইছিলে শুনেছি।"

"মুম্বাইয়ের একটা কলেজে পড়ার ইচ্ছা আমার।"

"কী বললা?"

"আহমেদেবাদ থেকে চলে যেতে চাই। কিন্তু বাপ-মা যেতে দেবে না। অবশ্য ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং এ ধরণের কোর্স হলে ভিন্ন কথা। ইঞ্জিনিয়ারিং মানেই অঙ্ক। অঙ্ক মানে বমি, তাই ওটা বাদ। আরেকটা পছন্দ হচ্ছে ডাক্তারি, এটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুনো যায়। কিন্তু ওরা আবার ভর্তি পরীক্ষা নেয়..."

বুঝতে পারলাম কথা থামানোর কোন সুইচ বিদ্যার মধ্যে নেই। আমার হাতে এক ঘণ্টা সময়। আর খালি পায়ে এভারেস্টে ওঠার মতন কঠিন একটা টিউটোরিয়াল সামনে। কাজেই আসল কথায় আসতে চাইলাম।

"এখন কী নিয়ে কথা বলতে চাও তাহলে?"

"সমীকরণ বাদে যে কোন কিছু।"

"মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার কোর্স দেখেছি। কিছু পার্ট আছে, সহজে নম্বর তোলা যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেডিকেল ভর্তি গাইডটা খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

"এই দ্যাখ, সম্ভাব্যতা," আমি বললাম, "এটা আর বিন্যাস মিলে পঁচিশ পার্সেন্ট প্রশ্ন হবে। পরিসংখ্যান থেকে আরো দশ পার্সেন্ট। এখানে কোন সমীকরণ নেই, এটা দিয়ে শুরু করি?"

"অবশ্যই," সেও বলল। একেবারে নতুন একটা এক্সারসাইজ বই বের করে নোটবুকের পাশে দুটো কলম রেখে দিল। সম্ভাব্যতা চ্যাপ্টারের প্রথম পৃষ্ঠাটা এমনভাবে খুলল, দেখে মনে হল তাবৎ ইন্ডিয়ায় সে-ই সবচাইতে অধ্যাবসায়ী ছাত্রি। সম্ভবত সবচেয়ে নির্বোধও।

"সম্ভাব্যতা," আমি বললাম, "বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মজার একটা ব্যাপার। কথাটা বললাম, কারণ নিত্যদিনের সমস্যাগুলো সম্ভাব্যতার ধারণা কাজে লাগিয়ে সমাধান করতে পারা যায়।"

"কী রকম?"

"কি রকম?"

"কীভাবে নিত্য দিনের সমস্যা সমাধান করা যাবে?" এক গোছা চুল পাশে সরাতে সরাতে বলল ও।

"ঠিক আছে, তুমি দেখি আগে আগে চলতে চাইছো। দ্যাখো," সহজ সহজ উদহারণ খুঁজতে লাগলাম আর নিখুঁতভাবে সাজানো ওর ঘরটা খেয়াল করলাম। গোলাপী বেডশিট বিছানো। উল্টো দিকের দেয়ালে ওয়েস্ট লাইফ, ব্যাকস্ট্রিট বয়েজ, হৃত্বিক রোশানের পোস্টার রয়েছে। ওপরের দেয়াল শুভেচ্ছা কার্ডে ভরা। "ওই কার্ডগুলো দেখেছো?"

"ওগুলো জন্মদিনের কার্ড। আমার স্কুলের বন্ধুরা দিয়েছে। দু'মাস আগে আমার জন্মদিন ছিল।"

এত বেশি কথা আমল দিলাম না। "মনে হয় বিশটা কার্ড আছে। বেশির ভাগই সাদা। কয়েকটা আছে রঙিন। কতগুলো হল?"

"পাঁচটা আছে রঙিন," কার্ডগুলোতে চোখ বুলিয়ে ও বলল। তার চোখে জিজ্ঞাসা, "তো তাতে কি হয়েছে?"

"আচ্ছা, পাঁচটা আছে তাহলে। এখন ধরা যাক, সবগুলো কার্ড নিয়ে একটা থলের ভেতরে রাখলাম। তারপরে একটা কার্ড তুললাম। কার্ডটা রঙিন হওয়ার সম্ভাব্যতা কত?"

"থলের ভেতরে রাখবেন কেন?" জানতে চাইল ও।

"ধরে নাও আর কি। সম্ভাব্যতা কত হবে?"

"জানি না।"

"ঠিক আছে, সম্ভাব্যতার প্রাথমিক ধারণা বোঝার জন্য এই উদাহরণটা দিয়ে শুরু করি। সম্ভাব্যতার সংজ্ঞা হচ্ছে," বলে নিচের কথাগুলো লিখলাম :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভাব্যতা=কোন কিছু কতবার ঘটে তার সংখ্যা।

"কোন চিহ্ন নেই, ব্যাপার কি?" ও বলল।

"দ্যাখো, আমি বলেছি সম্ভাব্যতা মজার একটি জিনিস। হরের দিকে দ্যাখ। বিশটার ভেতর থেকে একটা কার্ড তুলে নিলে ভিন্ন ধরণের কয়টা কার্ড আসতে পারে?"

"হুম...বিশটা।"

"হ্যা। বেশ বলেছ। ভাল।"

"দুহ্," ও বলল।

বিরক্ত হলেও সেটা চেপে গেলাম, সমস্যাটা তার সামনে ধরিয়ে দিলাম আর সে কিনা দুহ্ ক'রে উড়িয়ে দিল।

"এইবার লব। একটা রঙিন কার্ড চাই। একটা তুললে ভিন্ন ভিন্ন রঙের কয়টা কার্ড আসতে পারে?"

"পাঁচটা?"

"হু। এবার কথায় সূত্রটা ব্যবহার করি," বলে লিখে ফেললাম।

সম্ভাব্যতা = কোন জিনিস কতবার ঘটবে তোমার সেই আকাঙ্খার সংখ্যা (৫)/ কোন ঘটনা কতবার ঘটতে পারে সেটার সংখ্যা (২০), সুতরাং সম্ভাব্যতা = ৫/২০ = ০.২৫

"এবার তাহলে পেলাম, সম্ভাব্যতা ০.২৫ বা পঁচিশ পার্সেন্ট," বলে কলমটা টেবিলে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণ ধরে যা লিখলাম সেটাই বার বার পড়েছে ও।

"এটা সোজা কিন্তু পরীক্ষায় যেগুলো আসে সেগুলো অনেক কঠিন," শেষমেষ বলল বিদ্যা।

"আমরা ওগুলোও করব। কিন্তু মূল ধারণাগুলো প্রথমে বোঝা দরকার। দেখলে তো, বমি হয় নি তোমার।"

তার সেলফোনে দুইবার বিপ্ হলে আমার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটল। ফোনটা নেওয়ার জন্য খাটের পাশের টেবিলটার দিকে ছুটে গেল ও। খাটে বসেই মেসেজটা পড়ল। "আমার স্কুল বন্ধ। মেয়েটা বোকা।" ফোনের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাসি দিল।

আমি চুপ ক'রে বসে থাকলাম ও কখন আসবে সেই প্রতীক্ষায়। "ঠিক আছে, এবার আরেকটা করি," আমি বললাম। "ধরা যাক, একটা বয়ামে চারটা লাল এবং ছয়টা নীল রঙের মার্বেল আছে।"

পরের আধা ঘণ্টায় আরো তিনটা অংশ শেষ ক'রে ফেললাম। "খেয়াল কর, মন দিয়ে করলে অত কঠিন লাগে না। ভালেই তো করলে," ও নিজে নিজে একটা সমস্যার সমাধান ক'রে ফেলল দেখে বাহ্বা দিয়ে বললাম।

"চা খাবেন?" আমার প্রশংসা আমলে না নিয়েই সে বলল।

"না, ধন্যবাদ। বেশি চা খেতে ভাল লাগে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমারও লাগে না। কফি ভাল লাগে? কফি পছন্দ করেন?"

"আমার সম্ভাব্যতা ভাল লাগে। তোমারও ভাল লাগা উচিত। এবার পরের অঙ্কটা ধরি?"

মুঠোফোনটা আবার বেজে উঠলে কলম রেখে ফোনের দিকে লাফিয়ে গেল ও।

"এসব বাদ দাও। আমার ক্লাসে কোন এসএমএস করা চলবে না," আমি বললাম।

"এই একটু..." মাঝপথে হাতটা থামিয়ে বলল সে।

"তুমি মন দিয়ে না করলে আমি চলে যাব। এজন্য অনেক ছাত্র-ছাত্রিকে আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি।"

আমার দৃঢ়তা দেখে হার মানল ও। কিন্তু আমি কোন মিঃ নাইস নই। যারা মনোযোগ দিয়ে কাজ করে না, তাদের আমার ভাল লাগে না। বিশেষ ক'রে যারা অঙ্ক পছন্দ করে না।

"দুঃখিত," ও বলল।

"মাত্র এক ঘণ্টা সময় আছে। মজা করতে চাইলে পরে করবে।"

"বললাম তো, দুঃখিত," কলমটা আবারও হাতে নিয়ে এর মুকুটটা খুলল বিদ্যা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৫

"আপনারা। এক্ষুণি। আসেন।" একেকটা শব্দ বলার পর বাচ্চাটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল। "আলি এখন..."

"থামো পরশ," হাঁপাতে থাকা ছেলেটাকে ইশ বলল। বেলরাম মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছে সে। আমরা যেন তার সাথে যাই সেজন্যে জোরাজুরি করছে।

"এখন? মাত্র চারটা বাজে। এখন ব্যবসা বন্ধ করি কী ক'রে?" আমি বললাম।

"ও এত ঘন ঘন ক্রিকেট খেলে না। সব সময় মার্বেল খেলে। আজকে আসেন, প্লিজ, ইশ ভাইয়া।"

"যাই চল। আজ বেশি বেচাকেনা হচ্ছে না," চপ্পল পায়ে দিতে দিতে ইশ বলল।

অমি আগেই বেরিয়ে গেছে। ক্যাশবাক্স বন্ধ ক'রে আমাদের দোকানটার পাশের ফুলের দোকানে বলে গেলাম এদিকে খেয়াল রাখতে। আমাদের স্কুলের পরিচিত খেলার মাঠটায় গিয়ে পৌছলাম। বিশটা ছেলে আলীকে ঘিরে আছে।

"আমার এখন খেলার ইচ্ছে করছে না," ভীড়ের মাঝখান থেকে কথাগুলো কেউ একজন বলল।

ভীড়ের মাঝখানে অপুষ্টিতে আক্রান্ত রোগাপটকা একটা ছেলে মাটিতে বসে আছে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে সে।

ভীড় ভেঙে গেলে কিছু ছেলে স্বেচ্ছায় ফিল্ডারের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে পড়লো মাঠে। অমি হল উইকেট কিপায়। বোলারের প্রান্তে আম্পায়ারের জায়গায় দাঁড়ালাম আমি। ক্রিজে দাঁড়িয়ে গেল আলী। বোলারের দিকে ভাল ক'রে তাকানোর চেষ্টা করছে সে। বল করার জন্য ইশ অল্প একটু দূরত্ব দৌড়ে যেতেই চারিদিকে হাততালি পড়ল। এই লাজুক, হরিণ চোখা ছেলেটার খেলা দেখার জন্য এত উত্তেজনা কেন বুঝলাম না। ব্যাটটা তার উচ্চতায় প্রায় দুই তৃতীয়াংশ হবে।

আমার কাছে এসে থেমে গেলে বুঝতে পারলাম বল করার আগে ইশ যে দৌড়টুকু দিয়েছে সেটা নিতান্তই লোক দেখান। বারো বছরের একটা ছেলের জন্য দৌড়ে বল করা কী দরকার! ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ইশ একটা ললিপপ মার্কা বোলিং করল।

পিচের মাঝখানে পড়ে বলটা ধীরগতিতে উইকেটের দিকে এগিয়ে যেতেই আস্তে ক'রে ব্যাটটা নাড়িয়ে বলে আঘাত করল আলী। সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠে গেল বলটা। ইশ আর আমি দেখলাম তিন সেকেন্ড ধরে বলটা শূন্যেই ভেসে থাকল–ছক্কা!

ইশ আলীর দিকে তাকিয়ে প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা দোলালে আলী আবার পজিশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে মুখে ভাঁজ ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্রিজে। কিছুটা রোদের কারণে আর কিছুটা ঠিকমত বল দেখার জন্যে চোখমুখ কুচকে রেখেছে সে।

পরের বলটা করার জন্য ইশ আট কদম দৌড়ে গেল। খেলতে জানে ছেলেটা...দেখে তো বোঝাই যায় না! মিডিয়াম পেস বলটা বাউন্স ক'রে লাফিয়ে উঠতেই সজোরে ব্যাট চালাল ছেলেটা। আবারও ছক্কা!

ইশ মুচকি হাসল। আলীর ব্যাট তার বলে আঘাত করে নি, আঘাত করেছে তার দর্পে। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল এক সঙ্গে।

পরের বলের জন্য এগার কদম দৌড়াল ইশ। বল ছুঁড়ে দেওয়ার সময়ে তার মুখ দিয়ে আওয়াজও হল। আলীর কাঁধ পর্যন্ত লাফিয়ে উঠল বলটা। এক পায়ের উপর ভর দিয়ে ঘুরে নেচে ওঠার মত ক'রে বলে আঘাত করল আলী– ছক্কা!

তিন বলে তিন ছক্কা–মনে হচ্ছে ইশ খুব বিব্রত। অমির মুখ হা হয়ে থাকলেও উইকেট কিপিংয়ের দিকে ঠিকই নজর রাখছে সে। আমার মনে হল ইশের কথা ভেবেই নিজের প্রতিক্রিয়া দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে সে।

"পাগলা আলী। পাগলা আলী," মিড-অনে ফিল্ডিংরত একটা বাচ্চা চিৎকার ক'রে আলীর মনোযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করল।

"ওসব নিয়ে ভেবো না। তোমার খেলা তুমি খেল," আলীকে বলে ফিল্ডারের দিকে শক্ত চাহনিতে তাকাল ইশ।

বলটা তিনবার প্যান্টে ঘষে নিয়ে এবার ইশ বলটার গৃপ অন্যভাবে ধরল। সবচেয়ে বেশি দূরত্ব আর সর্বশক্তি নিয়ে বলটা ছুঁড়ল সে। কিন্তু বলটা বাউন্সার হয়ে উপরে উঠে গেলে বোঝা গেল ইশ মরিয়া হয়ে উঠেছে। শাস্তি প্রাপ্য ওর। দু'পা এগিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে ব্যাট চালাল আলী। এবার বল চলে গেল মাঠের বাইরে। একটা ক্লাসরুমের জানালায় গিয়ে লাগে আর কী!

আমি হেসে ফেললাম। জানি উচিত হয় নি। কিন্তু তারপরও হাসি এসে গেল। আমাদের স্কুল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ছেলেটা সবার সামনে বারো বছরের একটা ছেলের কাছে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। মজার ব্যাপার না? অন্তত আমার কাছে তো মজারই মনে হচ্ছে। সত্যি বলতে কী, শুধু আমার কাছেই।

"কী?" তিক্তমুখে জানতে চাইল ইশ।

"কিছু না," আমি বললাম।

"আরে ধুর, বলটা গেল কই?"

"ওরা খুঁজছে। কোচ, আপনি আমার দোকান থেকে একটা বল কিনে আবেন কি? একটু ঠাট্টা ক'রে বললাম।

"চুপ কর," বলটা তার কাছে ফিরে আসতেই ফিসফিস ক'রে বলল ইশ।

আবার দৌড়ানো শুরু করবে ইশ এমন সময় আলী ক্রিজে বসে পড়ল।

"কী হয়েছে?" অমি সবার আগে তার কাছে গেল। "বলেছিলাম না, মাথা ব্যথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে। এইবার চলে যাই?" আলী কাঁদো কাঁদো গলায় শিশুসুলভ কণ্ঠে বলল।

ইশ এবং আমার দিকে তাকাল অমি। আমি কাঁধ ঝাকালাম।

"আমি বলি নি? পাগলা আলী!" পরশ আমাদের কাছে দৌড়ে এসে বললে আলী উঠে দাঁড়াল।

"আমি চলে যাব?"

আমরা মাথা নেড়ে সায় দিলে পকেট থেকে কিছু মার্বেল বের করল আলী। দেখতে ওগুলো ওর চোখের মতই। মার্বেলগুলো হাতে খেলতে খেলতে মাঠ ছেড়ে গেল সে।

"বিশ্বাস হচ্ছে না," সকাল বেলায় পঞ্চাশ বুক ডন শেষ ক'রে ইশ বলল। ব্যাংকের পিছন দিকের মেঝেতে আমার পাশে এসে বসল ও। অমি বুকডন দিয়েই চলছে। একশবার দেবে সে।

"চা," বলে ইশকে চায়ের কাপটা দিলাম। আমার সবচেয়ে প্রিয় এই বন্ধুটি গতকাল দারুণ মানসিক আঘাত পেয়েছে। ব্যাংকের রান্নাঘরে খুব ভাল এক কাপ আদা চা তৈরি ক'রে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না তার জন্য।

"শুধু ভাগ্যের জোরে এরকম হয় না, নাকি? হওয়ার কোন উপায়ই নেই," নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিল ইশ।

এক প্লেট বিস্কুটের দিকে ইঙ্গিত ক'রে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম। ইশ ওটা খেতে চাচ্ছে না। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম আলীকে নিয়ে যে কাণ্ডটা হয়েছে তাতে ক'রে খাবারের প্রতি ইশের স্থায়ী অরুচি হয়ে যায় কি না। ইশ বলে চলল আর আমি শুনে গেলাম। সোজা হয়ে বসল সে। ব্যায়ামের সাথে সাথে জোরে জোরে হনুমানজীর চল্লিশ শ্লোক আওড়াতে থাকল। সকাল বেলায় ছাত্রদের চলে যাওয়া আর দোকান খোলার মাঝের এই বিরতিটুকু খুব প্রিয় ছিল আমার। এই বিরতিটাতে কিছু চিন্তা করার সুযোগ পেতাম, আজকাল শুধু নতুন দোকানটার চিন্তাই মাথায় খেলা করে। "এর মধ্যেই পঁচিশ হাজার রুপি জমেছে, ডিসেম্বর নাগাদ আরো পনের হাজার জমবে," বিড়বিড় ক'রে বললাম আমি, "বিল্ডার যদি আমানত হিসেবে চল্লিশ নেয়, তাহলে বছর শেষে নবরংপুর ইজারাটা নিতে পারব।"

নিজের জন্য আরেক কাপ চা ঢাললাম। "মামা, এই নেন আপনার দোকানের চাবি। নবরংপুরে আমরা নতুন দোকান নিয়েছি। এয়ারকন্ডিশন মল। ওখানেই চলে যাচ্ছি।" এই স্বপ্নময় কথাগুলো শতবার মাথায় খেলা করে। আর তিন মাস, নিজেকে আশ্বস্ত করলাম আমি।

"সব বিস্কুট খেয়ে ফেলেছিস তোরা?" ব্যায়াম শেষ ক'রে অমি আমাদের কাছে এসে বলল।

"দুঃখিত, চা চলবে?" আমি বললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমি না-সূচক মাথা নেড়ে দুধের একটা পলিপ্যাক খুলে মুখে ঢেলে দিল। আমার মত সেও চা বেশি খায় না। অবশ্য ইশের বাড়ির লোকজনের শিরায় শিরায় ক্যাফেইন পাওয়া যাবে। মনে পড়ল বিদ্যা আমাকে চা দিতে চেয়েছিল, নির্বোধ মেয়েটা দুহ্ বলে উড়িয়ে দিয়েছিল আমাকে।

"এখনও আলীর কথা ভাবছিস?" মোচ থেকে দুধ মুছতে মুছতে অমি ইশকে বলল।

"আজব ছেলে। আমি খুব ভাল ক'রে বল করি নি। তাই বলে খুব খারাপও তো করি নি। কিন্তু সে একেবারে, একেবারে..." কথাটা আঁটকে গেল ইশের।

"চারটা ছয়। অবিশ্বাস্য!" অমি বলল, "সঙ্গত কারণেই তাকে পাগলা বলে ডাকে।"

"পাগলা কিনা জানি না, কিন্তু সে খুব ভাল," ইশ বলল।

"এই বাচ্চাগুলো মুসলমান। তুই জানিস না ওরা কী রকম..." বলে অমি বাকি দুধটুকু ঢকঢক ক'রে গিলে ফেলল।

"চুপ কর। ও বেশ ভাল। এরকম খেলা আর কাউকে খেলতে দেখি নি আমি। ছেলেটারে আমি খেলা শেখাব।"

"অবশ্যই, টাকা দিলে অবশ্যই শেখাবি। চার বলের বেশি খেলতে পারে না ছেলেটা, তুই ওকে সাহায্য করতে পারবি," ইশকে বললাম আমি।

"কী? ওই মোল্লার বাচ্চাটারে শেখাবি?" অমির মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা গেল।

"বেলরামপুরের সেরা খেলোয়াড়দেরকে শেখাব আমি, বাচ্চাটা অসম্ভব সম্ভাবনাময়। মানে–'টিম ইন্ডিয়া'তে ঢুকতে পারে সে," আমি বললাম।

"হ্যা, আমি ওকে শেখাতে চাই। এই স্কুলে থেকে বাস্তবে খেলাধূলা তো দূরের কথা, বইয়ের পড়াই ওরা ঠিকমত শেখাতে পারে না ওকে।"

"কোন মুসলমান ছেলেকে শেখাবো না আমরা," অমি ভেটো দিল। "বিট্টু মামা আমাকে মেরে ফেলবে।"

"বাড়াবাড়ি করিস না। সে জানতেও পারবে না। আমরা ছেলেটাকে ব্যাংকের ঐ জায়গাটাতে শেখাবো," ইশ বলল। তার কথা শেষ হতেই বাকি তর্কটা তারা কেবল মুখ চাওয়া চাওয়ি করেই শেষ করল। শেষ পর্যন্ত বরাবরের মতই ইশের কাছে হার মানল অমি।

"তোর ইচ্ছা। শুধু একটা ব্যাপারে খেয়াল রাখবি, সে যেন মন্দিরের ধারে কাছেও ঘেঁষতে না পারে। বিট্টু মামা দেখতে পেলে লাথি মেরে দোকান থেকে বের ক'রে দেবে আমাদের।"

"অমি ঠিক কথাই বলেছে। আরো কয়েক মাস দোকানটা আমাদের দরকার," আমি বললাম।

"আমাদের একটু ডাক্তারের কাছেও যেতে হবে," ইশ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ডাক্তার?" আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

"চারটা বলের পরেই তার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়। তাই প্র্যাকটিস শুরু করার আগে তাকে কোন ডাক্তার দেখাতে চাই আমি।"

"কিন্তু ওর কাছে থেকে টাকা নিতে চাইলে ওর বাবা মা'র সাথে তোর কথা বলতে হবে," আমি বললাম।

"ওকে আমি বিনে পয়সায় শেখাব," ইশ বলল।

"এখনও কিন্তু ইন্ডিয়ায় বাপ-মাদের কাছে ক্রিকেট মানে সময়ের অপচয়।"

"তাহলে আমরা ওর বাড়িতে যাব," ইশ বলল।

"কোন মুসলমানের বাড়িতে আমি যাব না," অমি প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, "আমি কোনভাবেই যাচ্ছি না ওখানে।"

"আগে গিয়ে দোকানটা খুলি। ব্যবসার সময় হয়ে গেছে," আমি বললাম।

*

"ক্রিকেট না, আমার মার্বেল খেলতে ভাল লাগে," এই নিয়ে পাঁচবার প্রতিবাদ ক'রে বলল আলী। ইশ ছেলেটার জন্য চারটা চকোলেট (দোকানের খরচ থেকে, গর্দভ একটা) নিয়ে গেছে, প্রতিটা চকোলেট এক একটা ছক্কার জন্য পুরস্কার হিসেবে। আলী চকোলেটগুলো নিল। কিন্তু ক্রিকেট শিখতে নারাজ সে। আর ডাক্তার না দেখানোর জন্য গোঁ ধরে বসে আছে।

"আমাদের দোকানে মার্বেল পাওয়া যায়," আমি লোভ দেখালাম। "জয়পুরের স্পেশাল নীল রঙের মার্বেল। ডাক্তারের কাছে এক ডজন মার্বেল পাবে। ওই তো, রাস্তায় ওপারেই ডাক্তার বসেন।"

আলী আমার দিকে তাকাল। তার কাছে দুটো সবুজ মার্বেল রয়েছে।

"সকাল বেলা একদিন শিখতে আসলে দু'ডজন মার্বেল পাবে," আমি বললাম।

"ঠিক আছে, ডাক্তারের কাছে যাব। কোচিং ক্লাসের জন্য আব্বাকে তাহরে রাজি করান।"

"তোমার আব্বার নাম-ঠিকানা দাও আমায়," আমি বললাম।

"নাসির আলম, সাত নম্বর পোল...তিন নম্বর বাড়ির নিচ তলা।"

"কী নাম বললে?" অমি জানতে চাইল।

"নাসির আলম", আলী আবার বলল নামটা।

"নামটা কোথায় যেন শুনেছি। মনে পড়ছে না..." অমি বিড়বিড় ক'রে বলল। কিন্তু ইশ এটাকে পাত্তাই দিল না।

"পরের পোলেই ডা: বর্মার ক্লিনিক আছে। চল, ওখানে যাই," ইশ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*

"স্বাগতম, যুবক বয়সী কাউকে ক্লিনিকে পেলে ভালই লাগে।" ডা: বর্মা তার চশমা খুলে পঞ্চাশ বছর বয়সী চোখ দুটো কচলালেন তিনি।

তিন বছর আগে তাকে শেষবারের মত দেখেছিলাম। তারপর মুখে আরো ভাঁজ পড়ে গেছে, এক সময়ের কালো চুল সাদা হয়ে গেছে তার। বয়স সব কিছুই গ্রাস করে।

"এই পিচ্চি বাঘটা কে? মুখটা হা করো তো, বাবা," বলে অভ্যাসমত টর্চটার সুইচ অন ক'রে জ্বালালেন। "কী হয়েছে?"

"কোন সমস্যা নেই। তবে আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে," ইশ বলল।

ডাক্তার টর্চটা নিচে রাখলেন, "প্রশ্ন?"

"এই ছেলেটা অসাধারণ ক্রিকেট খেলে। আমি জানতে চাচ্ছি কীভাবে সে এটা করতে পারে," ইশ বলল।

"কী? কীভাবে করে?" ডা: বর্মা বললেন। "কিছু লোক এমনিতেই প্রতিভাধর।"

"আমি চারটা বল করেছিলাম ওকে। চারটাতেই ছক্কা মেরেছে," ইশ বলল,

"কী?" ডা: বর্মা বললেন, তিনি জানতেন ইশ এলাকার অন্যতম সেরা খেলোয়াড়।

"অবিশ্বাস্য হলেও সত্য," আমি সায় দিয়ে বললাম। "চারটা বলের পরেই ও বসে পড়েছে। বলল মাথা ব্যাথা হয়।"

ডা: বর্মা আলীর দিকে ফিরলেন। "তুমি ক্রিকেট পছন্দ কর, বাবা?"

"না," আলী বলল।

"সাধারণ ভাইরাস জ্বরের চেয়ে এটা অনেক বেশি জটিল। চার বলের পরে কী হয়েছিল, বাবা?"

"মন দিয়ে খেলতে গেলেই মাথা ব্যথা শুরু হয়," আলী বলল। হাত দুটো পকেটে রাখলে মার্বেলের ঝনঝন শব্দ শুনতে পেলাম আমরা।

"দাঁড়াও, তোমার চোখটা একটু দেখি," বলে ডাক্তার বর্মা উঠে চোখ পরীক্ষা করার কামরার দিকে চলে গেলেন।

"চোখের দৃষ্টি অসাধারণ," ফিরে এসে ডা: বর্মা বললেন, "তোমাদের একজন ডাক্তারের সন্ধান দিই। ডা: মূলতানি। আমার বন্ধু। সিটি হাসপাতালে বসে। তার কাছে নিয়ে যাও। চক্ষু বিশেষজ্ঞ সে। আমেরিকার এক বেসবল টিমের ডাক্তার ছিল। আসলে তার সাথে আমার এক বছর ধরে দেখা সাক্ষাত হয় না। তোমরা চাইলে কাল তোমাদের নিয়ে যেতে পারি।"

আমরা মাথা নেড়ে সায় দিলাম। টাকার ব্যাগে হাত দিলে আমার দিকে ডা: বর্মা কড়া চোখে তাকিয়ে টাকা দিতে বারন করলেন।

"অসাধারণ," আলির এমআরআই স্ক্যান করার পরে ডা: মুলতানি একটা কথাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন। আলীর জন্য দুই ঘণ্টা ব্যয় করেছেন তিনি। সম্ভাব্য সব ধরনের পরীক্ষাই করেছেন–ফিটনেস, রক্ত পরীক্ষা, রেটিনা স্ক্যান, কম্পিউটারাইজড হ্যান্ড-আই বেসঅর্ডিনেশন পরীক্ষা সব। ম্যাট্রিক্স স্টাইল এমআরআই'টাতে আলীর শুয়ে পড়তে হয়েছিল। প্রথমে একটা প্রকোষ্ঠের ভেতরে মাথাটা ঢুকিয়ে দিতে হয়। দারুণ কাজ করল যন্ত্রটা।

"স্পোর্টস ডাক্তার যখন ছিলাম সেই দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে, বর্মা। আহমেদাবাদের টানে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছে," ডাক্তার মূলতানি আমাদের সবার জন্য চা আর খাকরা আনতে দেবার কথা বলে বললেন।

"শেষ?" হাই তুলতে তুলতে বলল আলী।

"প্রায় শেষ। ইচ্ছা করলে বাইরের বাগানে গিয়ে মার্বেল খেলতে পার," ডা: মুলতানি বললেন। আলী চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আর কিছু বললেন না তিনি।

"অল্প মাথা ব্যাথায় সমস্যা মুলতানি," ডা: বর্ম বললেন

"নিছক মাথা ব্যাথা নয়," বলে ডা: মুলতানি একটা খাকরায় কামড় দিলেন। "ইশ ঠিকই বলেছে। ছেলেটার মেধা অসাধারণ।"

"কিন্তু কীভাবে?" বোকার মত প্রশ্ন করলাম আমি। এই সব পরীক্ষায় কী এমন আছে যে এর থেকে বোঝা যাবে, আলী যে কোন বোলারকে কুপোকাত করতে পারে।

"ছেলেটার হাইপার রিফ্লেক্সের সমস্যা আছে। ডাক্তারি ভাষায় এটা এক ধরণের ত্রুটি। কিন্তু ক্রিকেটের ক্ষেত্রে সেটা বিরাট কাজে দিচ্ছে।"

"হাইপার কী?" অমি জিজ্ঞাসা করল।

"হাইপার রিফ্লেক্স," ডা: মুলতানি টেবিল থেকে একটা গোল পেপার ওয়েট তুলে অমির দিকে ছুড়ে মারার ভান করলে অমি মাথা নিচু ক'রে ফেলল। "আমি এটা ছুঁড়ে মারলে তুমি তখন কী করতে? একটা প্রতিক্রিয়া দেখাতে। আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করতে। ওটা যে তোমার দিকে ছুঁড়ে মারব তা তো আগে থেকে সতর্ক করি নি। ঘটনাটা নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল। তার মানে তুমি ভেবে চিন্তে মাথা নিচু কর নি। এটা আপনা আপনি হয়ে গেছে।"

ডা: মুলতানি থেমে এক ঢোক পানি খেলেন। তারপরে আবার বলতে শুরু করলেন। "খুব গরম কিংবা খুব ঠাণ্ডা জিনিস ধরলে এরকম ঘটনা ঘটে। প্রতিদিনকার জীবনে এর তেমন কোন প্রভাব নেই। কিন্তু খেলাধুলার ক্ষেত্রে এটার খুব দরকার।" ডা: মুলতানি একটু থেমে কিছু কাগজপত্র খুললেন। তারপর আরেকটা খাকরা তুলে নিলেন মুখে দেবার জন্যে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম আলীকে দেখার জন্য। গুলতি দিয়ে এক মার্বেল দিয়ে আরেক মার্বেলের গায়ে আঘাত করছে সে।

"মানে আলীর রিফ্লেক্স ক্ষমতা ভাল, তাই তো?" ইশ বলল।

"আমাদের চাইতে তার রিফ্লেক্স অন্তত দশগুণ ভাল কিন্তু আরো ব্যাপার আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিফ্লেক্স ছাড়াও মানুষের মস্তিষ্ক আরো দু'ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। একটা হল দীর্ঘ বিশ্লেষণী উপায়–এক্ষেত্রে কোন সমস্যা আসলে সেটা নিয়ে মস্তিষ্কে ব্যাপক বিশ্লেষণ চলে তারপর আমরা ঠিক ক'রে ফেলি কীভাবে কাজটা করতে হবে। আরো একটা উপায় আছে। এই দ্বিতীয় উপায়টা বেশি দ্রুত কিন্তু ততটা নির্ভুল নয়। সাধারণত দীর্ঘ উপায়টাই কাজ করে। আর এটা নিয়ে আমাদের জানাশোনা আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে খুব জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক সংক্ষিপ্ত উপায়টা নিয়ে কাজ করে। এর নাম দ্রুত চিন্তার পদ্ধতি।"

আমরা মাথা নেড়ে সায় দিলাম। ডাঃ মুলতানি বলে চললেন : "রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে, মস্তিষ্ক চিন্তার প্রক্রিয়াটাকে শর্ট-সার্কিট ক'রে ফেলে কাজ করে। তখন দেখা যাবে সে শুধু মাথাটা নিচু করতে পারছে। ক্যাচ ধরা তো দূরের কথা। অবশ্য সাড়া দেওয়ায় সময়টা অতিদ্রুত হয়। খেলাধুলার ক্ষেত্রে, যেকোন উপায়ে চিন্তা করার প্রয়োজন পড়তে পারে–দীর্ঘ বিশ্লেষণ, দ্রুত চিন্তা বা রিফ্লেক্স।"

"আর আলীর বেলায় কীরকম হয় ব্যাপারটা?" ইশ জানতে চাইল।

ডাঃ মুলতানি এমআরআই স্ক্যান রিপোর্টটা আবার হাতে তুলে নিলেন। "আলীর মস্তিষ্ক অসাধারণ। চিন্তা করার জন্য তার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রিফ্লেক্স পথ বিচ্ছিন্ন। সাড়া দিতে তার যে পরিমাণ সময় লাগে, রিফ্লেক্স অ্যাকশনের মতই দ্রুত সেটা। কিন্তু তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বিশ্লেষণী উপায়ের মত নির্ভুল। তুমি হয়ত ভাবছ, যে দ্রুত গতিতে তুমি বল করেছ, সৌভাগ্যক্রমে সে সেটা ঠেকাতে পেরেছে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক বলটা আসার পথ বহুক্ষণই দেখতে পেয়েছে। আস্তে ক'রে বল ছুঁড়ে দিলে যেরকম হতো, ঠিক সেরকম।"

"কিন্তু আমি তো দ্রুত বল করেছিলাম।"

"হ্যা, কিন্তু তার মস্তিষ্ক ওটা ভালভাবে বুঝতে পেরে সেই মতো কাজ করতে পারে। বুঝতে সমস্যা হলে আরো সহজ ক'রে বলছি, তুমি যত জোরেই বল কর না কেন, আলী দেখে বলটা ধীরগতিতে আসছে। স্বাভাবিক কোন খেলোয়াড় দ্রুতগতির বলে আঘাত করার জন্য চিন্তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা তৃতীয় উপায়টা ব্যবহার করবে। আলী করবে প্রথমটা। স্বাভাবিক কোন খেলোয়াড় ভাল খেলার জন্য দ্বিতীয় উপায়টা আয়ত্ত করার জন্য বছরের পর বছর প্র্যাকটিস করে। আলীর সেটা করার দরকার নেই, এটাই তার সহজাত গুণ।"

ডাঃ মুলতানির কথাগুলো বোঝার জন্য এক মিনিট সময় লাগল আমাদের। ব্যাপারটা বোঝার জন্য নিশ্চিতভাবে আমাদেরকে প্রথম উপায়টাই ব্যবহার করতে হল।

"ওর কাছে পেস বল মানে ধীরগতির?" ইশ আবার জিজ্ঞাসা করল।

"শুধু তার মস্তিষ্ক মনে করে ধীরগতির। কারণ তার মস্তিষ্ক দ্রুত কাজ করে। অবশ্য যদি তাকে দ্রুত বল ছুঁড়ে আঘাত কর তাহলে ঠিকই আঘাত পাবে সে।"

"কিন্তু সে এত দূরে বল পাঠাতে পারে কীভাবে?" ইশ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"খুব বেশি আঘাত সে করে না। দ্রুতগতির বল মারলে সে শুধু এটার দিকটা পাল্টে দেয়। বলের শক্তিটা বেশির ভাগ তোমারই দেওয়া।"

"এই রকম সহজাত গুণসম্পন্ন কোন খেলোয়াড় কি আপনি এর আগে দেখেছেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"এতটা দেখি নি। এই ছেলেটার মস্তিষ্ক ভিন্ন রকম...অনেকে হয়ত বলবে এটা এক ধরনের দোষ। এজন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে এটা নিয়ে বেশি হৈ চৈ করার দরকার নেই।"

"ছেলেটা ইন্ডিয়ান টিমের জন্য একটা সম্পদ হতে পারে," ইশ বলল, "ডা: মুলতানি, আপনিও সেটা জানেন।"

ডা: মুলতানি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "ঠিক আছে, সেটা এখনই নয়। যেমন ধর তার মাথা ব্যাথাটা একটা সমস্যা, তার মস্তিষ্ক দ্রুত বিশ্লেষণ করে, সেটা ঠিক, তবে তাড়াতাড়ি ক্লান্তও হয়ে যায় সে। খেলায় লেগে থাকা দরকার তার। এই গুণটা কাজে লাগানোর জন্য তার মস্তিষ্কটা উজ্জীবিত হওয়ার দরকার আছে। তার আগ পর্যন্ত তাকে টিকে থাকতে হবে।"

"সেটা কি সম্ভব?" ইশ বলল।

"হ্যা, ট্রেনিং দিতে হবে সেজন্য ক্রিকেটের অন্যান্য দিকগুলোও তাকে শিখতে হবে। মনে হয় না দুই উইকেটের মধ্যে সে কখনও দৌড়ায়। ছেলেটার পরিশ্রম সহ্য করার শক্তি নেই। দুর্বল, বলতে গেলে অপুষ্টির শিকার," ডাক্তার বললেন।

"আমি তাকে ক্রিকেট শেখাবো," ইশ কথা দিল। "আর অমি সাহায্য করবে। অমি তাকে খাইয়ে দাইয়ে ফিট বানিয়ে তুলবে।"

"না, আমি পারব না," অমি অস্বীকৃতি জানালে সবাই তাকালো তার দিকে। "ডা: বর্মা, ওদেরকে বলেন কেন আমি পারব না।"

"কারণ সে মুসলমান। মুলতানি, মুসলিম ইউনিভার্সিটির নাসিরের কথা তোমার মনে আছে? আলী কিন্তু তারই ছেলে।"

"ও, ওই নাসির? হ্যা, ইউনিভার্সিটির ইলেকশনে ক্যাম্পেন করত। এক সময় ঝামেলা তৈরিতে খুব নাম ছিল তার। কিন্তু শুনেছি ওসবে এখন আর তেমন জড়ায় না।"

"হ্যা, সে এখন পুরোদস্তুর রাজনীতিতে আছে। খাটি মুসলমান দল থেকে এখন ধর্মনিরপেক্ষ দলে চলে এসেছে," ডা: বর্মা বললেন।

ইশ অবাক হয়ে ডা: বর্মের দিকে তাকাল।

"তোমরা গতকাল চলে যাবার পরে এটা জেনেছি। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি কোন ক্লিনিক চালাই না, চালাই গল্পগুজব করার একটা জায়গা," ডা: বর্মা মুখ টিপে হাসলেন। "যাহোক, এখন ইসু হল পুরুতের ছেলে মুসলমানের ছেলেকে শেখাবে কিনা।"

"আমি ওকে শেখাতে চাই না," অমি সঙ্গে সঙ্গে বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চুপ কর, অমি। কী জিনিস পাইছি, দেখছিস না?" ইশ বলল।

উঠে দাঁড়াল অমি। তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে শেখানোর কোন ইচ্ছা তার নেই। কামরার বাইরে চলে গেল সে।

"স্টেট একাডেমিতে দিলে কেমন হয়?" ডাঃ বর্মা বললেন।

"ওরা ওকে নষ্ট ক'রে ফেলবে," ইশ বলল।

"আমিও মানি সেটা," ডাঃ মুলতানি একটু থামলেন। "তার বয়স খুব কম। তারপর আবার মুসলমান এবং গরীব, কোন ট্রেনিং তো পায় নি সে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, এই ছেলেটা মেধার কথা এখন গোপন রাখা হোক। সময় আসলে তখন দেখা যাবে।"

ক্লিনিক ছেড়ে চলে আসলাম আমরা। আমার পকেট থেকে চারটা মার্বেল বের ক'রে আলীকে ডাকলাম।

"আলী, এখন যাই গিয়ে। এই যে, ধর।"

মার্বেল চারটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম। ইচ্ছা করেই এটা করলাম আমি।

আলী খেলা ছেড়ে আমার দিকে তাকাল, দেখল মার্বেলগুলো তার দিকে ছুটে আসছে। শূন্যে থাকা মার্বেলগুলো বাম হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে এক, দুই, তিন, চার ক'রে সবগুলো মার্বেলই জাদুর মত ধরে ফেলল সে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৬

"রাজি হবে না, আমি বলে দেখেছি," আলী রেগেমেগে বলল। বেলরামপুরের শেষ মাথায় তার বাড়িতে গেছি আমরা। সে একটা নোংরা পোলে থাকে। আলী বেল চাপল। খেয়াল করলাম তার বাবার নামফলকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের প্রতীকটি আছে।

"আলী আবার দেরি ক'রে এসেছ," দরজার খুলে তার বাবা বললেন। একেবারে কালো একটা আচকান পরে আছেন তিনি। তার সাদা দাড়ি আটসাট ফিতের কাপড়ের টুপির সাথে কালো রঙটা একেবারে বেমানান। বয়স মনে হল ষাট হবে। তার মানে আলী অনেক পরে তার জীবনে এসেছে।

"আপনারা কারা, মশায়?" তিনি বললেন।

"আমি ইশান," ইশ বলল। "আর এ হচ্ছে গোবিন্দ এবং অমি। আমরা সবাই আলীর বন্ধু।"

"বন্ধু?" বয়সের ফারাকটা হাস্যকরভাবেই বোঝা যাচ্ছে। সেদিকটা খেয়াল ক'রে আলীর বাবা কথাটা বললেন।

"হ্যা, আব্বা। স্কুলে ক্রিকেট খেলতে এসেছিল ওরা। খেলার দোকান আছে ওদের। আমি আপনাকে বলেছিলাম, মনে আছে?"

"ভেতরে এস," আলীর বাবা বললেন।

শোয়ার ঘরে বসলাম আমরা। আলীর মা বাদামী রঙের সালোয়ার কামিজ পরে আছেন। আমাদের জন্য তিনি গ্লাসে ক'রে রুহ্আফজা নিয়ে এলেন। একটা দোপাট্টা দিয়ে তার মুখের অধিকাংশ অংশই ঢাকা। তারপরও বুঝতে পারলাম, স্বামীর চেয়ে অন্তত বিশ বছরের ছোট তিনি। পরের দিন পরীক্ষা, আলী পড়ছে না, সেজন্য তাকে একটু বকা দিলেন তিনি। আমার মনে হয় ইন্ডিয়ান মায়েদের প্রধানত দুটো কাজ–ছেলেমেয়েদের বেশি বেশি খেতে বলা আর বেশি ক'রে পড়তে বলা।

আলী তার মায়ের সাথে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ইশ বলল, "আমরা আলীকে শেখাতে চাই, সেজন্যে কথা বলতে এসেছি।"

"ক্রিকেট? না, ধন্যবাদ। আমাদের ইচ্ছা নেই," আলীর বাবা বললেন। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল তিনি আলোচনা করতে নারাজ। সাফ কথা জানিয়ে দিলেন আর কি।

"কিন্তু কাকা..." ইশ বাধা দিয়ে বলল।

"উপরের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ," ছাদের দিকে ইঙ্গিত ক'রে আলীর বাবা বললেন, "দ্যাখ, ছাদে ফাটল ধরেছে। এই কামরা আর একটা ছোট্ট কামরা আছে–এই দুটো ঘর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাড়া নিয়েছি। বাড়ি দেখে কী মনে হয় ক্রিকেট শেখানোর সামর্থ্য আমাদের আছে?"

"আলীর জন্যে আমরা কোন টাকা নেব না," ইশ বলল।

তীব্র দৃষ্টিতে তাকালাম আমি ইশের দিকে। ব্যবসায় যদি সে কোন ছাড় দেয় তাহলে সেটা আমার ভাল লাগে না। আর শতভাগ ছাড় দেওয়াটা তো পাগলামি।

"ক্রিকেট শিখে কী করবে ও? মাদ্রাসায় পড়ার পর আবার স্কুলে যাওয়াটাই তো ওর জন্যে কঠিন হয়ে যায়। এই প্রথম আলী অঙ্ক পড়ছে। অঙ্কের একটা মাস্টার রাখবো, সে সামর্থ্যও আমার নেই..."

"গোবিন্দ অঙ্ক পড়ায়," ইশ বলল।

"কী?" আলীর বাবা এবং আমি একসাথে বলে উঠলাম।

"হ্যা, বেলরামপুরে ও-ই সেরা। ক্লাস টুয়েলভের বোর্ড পরীক্ষায় ও একশতে একশ নম্বর পেয়েছিল।"

ইশের দিকে আবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালাম। অনেক টিউশনি আমার। হাতে আর কোন সময় নেই। তার বোকা বোনটাকে আমি এমনিতেই ফৃ পড়াই। "কিন্তু ইশ, আমি পারব না," বললাম আমি।

"আমরা একটা যৌথ চুক্তি করতে পারি। আপনি যদি ওকে আমাদের কাছে ক্রিকেট শিখতে দেন তাহলে আমরা ওকে ফৃ অঙ্ক পড়াব," আমার কথায় আমল না দিয়েই ইশ বলল।

"আমি ফৃ শেখাব কীভাবে? টাকা দিয়ে যারা পড়বে তাদেরই তো পড়াতে পারছি না," আমি বললাম।

ইশ ঘৃণ্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। যেন মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার অভিযান নষ্ট ক'রে দিয়েছি আমি।

"ফৃ'র কথা বলছিস?" শক্ত ক'রে কথাটা বললাম ওকে।

"যতটুকু পারি টাকা দেব," চাপা গলায় আলীর বাবা বললেন।

"আমি দুঃখিত। এ করেই আমি জীবিকা নির্বাহ করি। আমি পারব না..." আমি বললাম। মান সম্মান বাঁচাতে মরিয়া আমি।

"আমার বেতন থেকে টাকাটা নিস, ঠিক আছে? আমার একটু কথা বলতে দিবি?" খুব ভদ্রভাবে বলল ইশ।

ওখান থেকে উঠে চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার।

"রিটায়ারমেন্টের পর পেনশন থেকে অল্প কিছু পাই। তুমি কত টাকা ক'রে নাও?"

"চারশ..." আমি বলতে চাইলাম কিন্তু ইশ বাধা দিয়ে বলল, "আমরা শুরু করেই দেখি না কীরকম হয়?"

প্রত্যেকে মাথা নেড়ে সায় দিল। এমনকি অমিও। কারণ বাকিরা যা করে সেও তাই করে।

"ঠিক আছে, গোবিন্দ," সব শেষে আমাকে বলল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতটা সম্ভব মৃদু মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম, পাঁচ ডিগ্রি কোণে মাথা নাড়ালাম আমি।

"খাবার খেয়ে যাও, তোমরা," আমরা যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় আলীর বাবা অনুরোধ করলেন।

"না, না," অমি বলল। মুসলমান বাড়িতে খাওয়ার ভয়ে আৎকে উঠল সে।

"খেয়ে যাও, এটা আমার অনুরোধ, মেহমানদারী গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তোমরা আমাদের মেহমান।"

আমি রাজি হতাম না। কিন্তু অঙ্ক আর ক্রিকেট ফ্রি শেখানোর বদলে অন্তত কিছু পেতে চাচ্ছি আর কি।

আমরা শোয়ার ঘরের মেঝেতে বসলে আলীর মা আমাদের জন্য বড় দুটো থালা নিয়ে আসলেন। একটা আমাদের তিনজনের জন্য, আরেকটা আলীর বাবার জন্য। সাধারণ খাবার রাখা থালাগুলোতে–চাপাতি, ডাল আর আলু ফুলকপির তরকারি।

অমিও বসল। কিন্তু খাবারে হাত দিল না সে।

"দুঃখিত, তোমাদের মাংস দিতে পারছি না। আজ এছাড়া আর কিছু নেই।"

"আমি মাংস খাই না, আমি পুরোহিতের ছেলে," অমি বলল।

একটা বিশ্রী নীরবতা নেমে এল।

লাফিয়ে উঠল ইশ। "খাবারগুলো মনে হচ্ছে দারুণ। শুরু করে দে।"

একই থালা থেকে খাবার খাওয়াটা অন্তরঙ্গতার পরিচয়। কিন্তু আজকাল আর এসব হয় না। ইশ আর আমি একই চাপাতি খাওয়া শুরু করলাম। লম্বা আঙুল দেখে ওর বোনের কথা মনে পড়ে গেল। কাল পরের দিন ওর বোনকে আবার পড়াতে হবে।

"মাদ্রাসায় অঙ্ক পড়ায় না?" আলোচনা আর গণিতের স্বার্থে কথাটা জিজ্ঞেস করলাম।

"এই মাদ্রাসায় পড়ায় না," চামচ দিয়ে ডাল নিতে নিতে আলীর বাবা বললেন। "অঙ্ক আর বিজ্ঞান পড়ান ওখানে নিষিদ্ধ।"

"অদ্ভুত। যে দিনকাল পড়েছে," আমি বললাম, ব্যবসার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম আমি। প্রত্যেক মাদ্রাসার বাইরে টিউশনি করার বিশাল আয়োজন করতে চাচ্ছিলাম।

"তা ঠিক না, আলীর বাবা বললেন। মাদ্রাসাগুলোর এমনকি স্কুল বলাও ঠিক না। ইসলামী সংস্কৃতি শেখানোটাই শুধু ওদের কাজ। এখান থেকে আরো কিছু চাপাতি নাও।"

"এই জন্যই কি ওকে স্কুলে পাঠিয়েছেন?" ইশ বলল।

"হ্যা, আরো আগেই কাজটা করতাম। কিন্তু আমার বাবা জেদী লোক। আলী মাদ্রাসায় যাবে এটাই উনার ইচ্ছা। ছয় মাস আগে মারা গিয়েছেন উনি।"

"ওহ্, দুঃখিত," ইশ বলল।

"অনেক দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তার কথা মনে পড়লে খারাপ লাগে। কিন্তু বছরের পরে বছর চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ ক'রে আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়গুলোর কথা মনে করতে ভাল লাগে না," আলীর বাবা কথাটা বলে এক গ্লাস পানি খেলেন। "ইউনিভার্সিটি থেকে অবসর নেওয়ার পরে ক্যাম্পাসের কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হল। পার্টি চাইল আমি এখানে চলে আসি। বেলরামপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুল বন্ধ ছিল। এই জন্যে ওখানেই ভর্তি করালাম। ভাল হল কাজটা?"

"হ্যা, আমরা ওখানে বারো বছর পড়েছি," আমি বললাম।

"অমি, তুমি তো কিছুই খেলে না। কিছু অন্তত খাও," তাকে কিছু কলা দিয়ে অমির বাবা বললেন। অমি একটা কলা নিয়ে দেখে তারপর তিন কামড়ে খেয়ে ফেলল।

"আলীকে ক্রিকেট শেখানোর এত ইচ্ছা কেন তোমাদের?" আলীর বাবা জানতে চাইলেন।

ইশের মুখে হাসিটা ফোটানোর জন্য এই প্রশ্নটাই যথেষ্ট। গদগদ হয়ে বলল সে, "আলীর একটা সহজাত গুণ আছে, আমার ট্রেনিং পেলে দিন দিন ওর দক্ষতা বাড়বে।"

"তুমি ক্রিকেট খেল?" আলীর বাবা বললেন।

"স্কুলে খেলতাম, এখন আমার একটা খেলার দোকান আছে। জীবনে অনেক খেলোয়াড় দেখেছি, কিন্তু আলীর মত কাউকে দেখি নি," ইশ খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল।

"কিন্তু এটা তো নিছক খেলা একটা। একজন লাথি দিয়ে বলে ঘা দেয় আর বাকিরা সব দৌড়ে গিয়ে বলটা থামানোর চেষ্টা করে।"

"আরো অনেক কিছু আছে এতে," ইশ বলল, একটু অপমানিত বোধ করছে সে। "কখনও না খেললে সেটা বুঝবেন না।"

আলীর বাবা বললেন, "তুমি জান আমি ধর্ম নিরপেক্ষ দলের সদস্য?"

"চিহ্নটা দেখেছি," আমি বললাম।

"এক সময় এসে আমাদের অফিসটা দেখে যেয়ো?"

"আপনি," অমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "কার সাথে কথা বলছেন জানেন? আমি পণ্ডিত শাস্ত্রীর ছেলে। বেলরামপুরের স্বামী মন্দিরটা তো দেখেছেন, নাকি?"

ইশ অমিকে বসানোর জন্য কনুই ধরে টান দিল। "তাতে কী, বাবা?" আলীর বাবা বললেন।

"আপনাদের পার্টি দেখতে যাওয়ার কথা বলছেন? আমি হিন্দু!"

"আমাদের পার্টি তো তোমাদের বিরুদ্ধে নয়।" আলীর বাবা দাঁত বের ক'রে হাসলেন। "আমাদের পার্টিটা ধর্মনিরপেক্ষ।"

"এটা সেকুলোর না। সাক উলার। রাজনীতিকে খেয়ে ফেলতে, আপনার শুধু এটুকুই জানেন। আপনাদের মত মুসলমানরাই তো ওখানে ভীড় করবে। ইশ, আমরা কি এখন যাব, নাকি?"

"অমি, ঠিক মত আচরণ কর, আমরা আলীর জন্যে এসেছি।"

"সেটা আমার ব্যাপার না। ও মার্বেল খেলে অঙ্কে ফেল করুক। বিট্টু মামা যদি দেখে আমি এখানে..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বিট্টু তোমার মামা?" আলীর অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

"সে আপনাদের বিরোধী দলের। বেলরামপুরে কোন খাই-খাই পার্টি জিতবে না।"

"শান্ত হও বাবা, বস," আলীর বাবা বললেন।

অমি বসে পড়লে ইশ তার কাঁধে হাত বুলিয়ে দিল। অমি খুব কমই রাগে কিন্তু একবার রেগে গেলে স্বাভাবিক করার জন্য অনেক চেষ্টা করতে হয়।

"এই নে, একটা কলা খা। তোর ক্ষিধে লেগেছে, জানি," ইশ ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলো।

অমি প্রথমে নিতে না চাইলেও অবশেষে কলাটা হাতে নিল।

"আমিও সেকুলার পার্টিতে নতুন, বাবা। একটা কট্টরপন্থী দলে ছিলাম," আলীর বাবা বললেন। একটু থেমে কিছু ভাবলেন তিনি, "হ্যা, কিছু ভুল আমিও করেছি।"

"যাইহোক। আমাদের দলের লোকদের আপনার দলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন না," অমি তীব্রভাবে বলল।

"তা করব না। কিন্তু তোমরা আমাদের এতটা বিরোধী কেন? দলটা চল্লিশ বছর ধরে দেশ শাসন করেছে। আমরা নিশ্চয় ঠিক কাজই করছি।"

"গুজরাটে আপনারা আর শাসন করতে পারবেন না। কারণ আপনাদের ভণ্ডামি আমরা ধরে ফেলেছি," অমি বলল।

"অমি থাম," ইশ বলল।

"সমস্যা নেই, ইশ। অল্পবয়সী ছেলেদের সাথে কথা বলার সুযোগ আমার কমই হয়। তার মনের কথাগুলো সে বলুক," আলীর বাবা বললেন।

"আমার কিছু বলার নেই, চল যাই," অমি বলল।

"সাম্প্রদায়িক দলগুলোও যে দোষ থেকে মুক্ত তাও নয়," আলীর বাবা বললেন।

মনে হল আলীর বাবাও তর্ক ভালবাসেন।

"এই হল আসল কথা। এখানেই তো পক্ষপাতিত্ব, আপনারা আমাদেরকে বলেন সাম্প্রদায়িক। আপনাদের দল মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেয়। তারপরও সেটা সেকুলার। কেন?" অমি বলল।

"কী কী অগ্রাধিকার আমরা দিয়েছি?" আলীর বাবা জানতে চাইলেন।

"অযোধ্যায় আপনারা আমাদের কোন মন্দির তৈরি করতে দেবেন না কেন?" অমি বলল।

"কারণ ওখানে আগে থেকেই একটা মসজিদ রয়েছে।"

"তার তো কোন প্রমাণ নেই।"

"আছে, সরকার সেই রিপোর্টগুলো লুকিয়ে রেখেছে।"

"ভুল কথা।"

"যাই হোক। এটা কোন সাধারণ জায়গা নয়। আমাদের বিশ্বাস, এটা আমাদের ভগবানের জন্মস্থান। আমরা বললাম, 'জায়গাটা আমাদের কাছে দিয়ে দাও। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সসম্মানে মসজিদটা পাশে সরিয়ে নিয়ে যাব,' কিন্তু আপনারা সেটাও করতে দেবেন না। আমরা হচ্ছি সংখ্যাগুরু। কিন্তু আমাদের এই ছোট্ট একটা অনুরোধও রাখবেন না। পারেখজি ঠিকই বলেছেন, এই দেশে হিন্দুদের আশা ভরসা কী আছে আর?"

"ওহ্, আচ্ছা, তাহলে পারেখজি এই সব শিখিয়েছে?" আলীর বাবা প্রায় আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন যেন।

"তিনি শেখান নি, আমাদের কাজকর্মকে সাম্প্রদায়িক বলা হয়। এই নিয়ে কথা বলতে ভাল লাগে না। তাই বলে হিন্দুরা কিছু বলে না ব'লে আপনারা মনে করেন তারা কিছুই ধরতে পারে না? আপনাদের কী মনে হয়, লোকজন পারেখজির কথা কেন শোনে? কারণ গভীর কোন কথাই তিনি বলেন, একটা সর্বজনীন অসন্তোষ জেগে উঠছে। যদিও সেটা নিয়ে হয়ত কেউ কথা বলে না।"

"অনেক হিন্দু আমাদের ভোট দেয়, সেটাও তোমার জানা উচিত," আলীর বাবা বললেন।

"আস্তে আস্তে তারা আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।"

"দ্যাখ বাবা, ইন্ডিয়া স্বাধীন দেশ। নিজের মত প্রকাশের অধিকার সবারই আছে। আমার একটাই কথা–হিন্দু ধর্ম মহান ধর্ম। কিন্তু কোন বাড়াবাড়ি ঠিক না।"

"হাহ্, বাড়াবাড়ির কথা বলবেন না। কোন্ ধর্ম বাড়াবাড়ি করে সে কথা আমরা জানি।"

বুঝতে পারছিলাম না, অমি যা বলছে তাই কি ও বিশ্বাস করে নাকি পারেখজির বুলি আওড়ে যাচ্ছে। এসব নিয়ে ইশ আর আমার সাথে কখনও কথা হয় নি ওর। কিন্তু মনের গভীরে কোন জায়গায় সেও তবে বিট্টু মামার মতই একই জিনিস উপলব্ধি করে? ইশ ক্রিকেটের ভক্ত, আমি ব্যবসার–অমির কি তবে ধর্মের দিকে খুব টান? অথবা হতে পারে, অধিকাংশ লোকের মতই সেও বিভ্রান্ত। নিজের ভাল লাগার জিনিসটা খুঁজে পেতে চাচ্ছে হয়ত। আমরা কখনওই ওকে তেমন একটা গুরুত্ব দেই নি। কিন্তু পারেখজি হয়ত তাকে একটা পথ দেখিয়ে দিয়েছে, গুরুত্ব দিয়েছে তাকে।

"আচ্ছা, আমরা এক কাজ করতে পারি না? রাজনীতির আলোচনা বন্ধ থাক," যাওয়ার সময় হয়ে গেছে ইঙ্গিত ক'রে ইশ এই অনুরোধটা করল।

"তাহলে কি আপনার ছেলেকে আমাদের কাছে পাঠাচ্ছেন না?" আলীর বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম। ভাবলাম, অমির তর্জন-গর্জনের পরে তার মন পাল্টে গেল কিনা।

"কী যে বল না। আমাদের মধ্যে কিছু দ্বিমত আছে আর সেটা নিয়েই কথা হচ্ছে। এই দেশে এই জিনিসটার বড় অভাব। ঠিক আছে, তোমাদের হাতে আমার ছেলেকে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে গেলাম। ইশ প্র্যাকটিসের সময় ঠিক করল সকাল সাতটা।

"চল, তোমাদের মেইন রোড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। রাতে খাওয়ার পরে একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁটার দরকার হয় আমার," আলীর বাবা বললেন।

আলীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলাম আমরা। অমি মাথা নিচু ক'রে থাকল। উচ্চস্বরে তর্ক করার জন্য লজ্জা পেয়েছে বোধহয়। আলীর বাবা আবার কথা বললেন।

"আমার নিজের দলটাও আমার কাছে খুব একটা ভাল লাগে না।"

"তাই নাকি?" কেউ কিছু বলছে না দেখে আমিই বললাম।

"হ্যা, কারণ একটা সময় দেখা যায়, সব দলের মতই দেশের জন্য কাজ না করে তারা খামোখা রাজনীতি ক'রে সময় নষ্ট করে। পার্থক্য তৈরি করা, পক্ষপাত তৈরি করা, বিভাজন তৈরি করা এই সব তারা খুব ভাল জানে।"

আমরা সবাই মাথা নেড়ে শুভরাত্রি জানালাম তাকে, কিন্তু আলীর বাবার কথা তখনও শেষ হয় নি। "ব্যাপারটা হল, কোন রেস্টুরেন্ট দু'জন খদ্দের গেল, কিন্তু ম্যানেজার তাদের খাবার দিল মাত্র এক প্লেট। এখন যদি খাবারটা তুমি খেতে চাও, তাহলে অন্য খদ্দেরটাকে তাড়াতে হবে। দু'জনেই তখন ফ্যাসাদ বাধিয়ে দেয়। কিছু লোক এসে হয়ত বলল, আপনারা ভাগাভাগি ক'রে হাফপ্লেট ক'রে খান। কিন্তু এর ফলে আসল ইসুটা তারা ভুলে গেল–ম্যানেজার দুই প্লেট খাবার কেন দেয় নি?"

আলীর বাবার চোহারাটা খেয়াল করলাম, দাঁড়ি আর গোঁফের আড়ালে, একটা জ্ঞানী মানুষের চেহারা লুকিয়ে আছে যেন।

"ঠিক কথা, ফ্যাসাদটা বাধিয়ে দেওয়া উচিত। এই জন্যেই আমি ধর্ম বা রাজনীতি নিয়ে উচ্চবাচ্য করি না।"

"একবার ফ্যাসাদ বেধে গেলে, একের পরে একটা চলতেই থাকে। থামানোর কোন উপায় থাকে না," ইশ বলল।

"এক সময় কলেজে জুওলজি পড়াতাম," আলীর বাবা বললেন, "শিম্পাঞ্জিদের লড়াই নিয়ে একবার পড়েছিলাম, ব্যাপারটা এখানেও খাটে।"

"শিম্পাঞ্জিদের লড়াই?"

"একই দলের মধ্যে পুরুষ-শিম্পাঞ্জিগুলো খাবার আর স্ত্রী-শিম্পাঞ্জি নিয়ে একে অন্যের সাথে সাংঘাতিক লড়াই বাধায় কিন্তু লড়াই শেষে অদ্ভুত একটা রীতি পালন করে ওরা। একজন আরেকজনের ঠোঁটে চুমু খায়।"

কথাটা শুনে অমিও হেসে ফেলল।

"তাহলে কি হিন্দু আর মুসলমানদেরও চুমু খাওয়া উচিত?" আমি বললাম।

"না, ব্যাপারটা হচ্ছে এই রীতিটা প্রকৃতি সৃষ্টি ক'রে দিয়েছে। লড়াইটা যেন মিটমাট হয়ে গিয়ে পুরো দলটা একসাথেই থাকতে পারে সেজন্যেই এই ব্যবস্থা। আসলে অনেক দিন ধরে কোন সম্পর্ক ধরে রাখার জন্য এটার দরকার রয়েছে।"

"যে কোন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য?" ইশ বলল।

"হ্যা। স্বামী-স্ত্রীর কথাই চিন্তা কর, আবেগের বশে তারা ফ্যাসাদ বাঁধায়। একে অন্যকে আঘাত করে। কিন্তু পরে তারা সব মিটমাট ক'রে ফেলে। হয় আলিঙ্গন করে বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপহার দিয়ে সহানুভূতির কথা বলে। এভাবে মীমাংসা ক'রে ফেলাটা জরুরি। ইন্ডিয়ায় হিন্দু-মুসলিম বৈরিতায় কারণ এটা নয় যে, একজন ভুল, আরেকজন সঠিক। ব্যাপারটা হচ্ছে..."

"মীমাংসা করার কোন চেষ্টাই করা হয় না," ইশ বলল।

"হ্যা, মানে রাজনীতি যারা করে তারা একবার আগুন জ্বালিয়ে দিলে সেটার নেভানোর জন্যে কোন ফায়ার বৃগেড থাকে না। ব্যাপারটা কটু শোনালেও অমি ঠিকই বলেছে। লোকজন ভেতরে ভেতরে ঠিকই বোঝে। কিন্তু কিছু বলে না। এজন্যে এই ব্যবধানও ঘোঁচে না। অসন্তোষ শুধু বাড়তেই থাকে। শেষমেষ যখন সেই অসন্তোষ বাইরে বেরিয়ে পড়ে ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে যায়।"

মেইন রোডে উঠে এক পানের দোকানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আলীর বাবা কেন আমাদের সাথে এসেছেন, বুঝতে পারলাম। রাতের খাবারের পরে পান খাওয়ার অভ্যেস তার।

"আলীকে সময়মত আসতে বলবেন," বিদায় জানানোর সময় ইশ বলল।

সারাদিন মনের মধ্যে ঘুর ঘুর করল শিম্পাঞ্জীদের চুমু খাওয়ার ব্যাপারটা।

একটা সাদা কুর্তা-পায়জামা পরে আলী ঠিক সময়ে এসে হাজির হল। তার এক হাতে অঙ্কের বই, আরেক হাতে ক্রিকেট ব্যাট।

"ক্রিকেট আগে। বই পাশে রেখে দাও," ইশ বলল।

হঠাৎ এই এরকম আদেশ শুনে ছেলেটা চমকে গেল। সিঁড়ি দিয়ে তাকে উপরে নিয়ে গিয়ে ভল্ট খুললাম। একটা খালি লকারের ভেতরে আলী বইগুলো রেখে দিল। পরেশ আর নবীন নামে আরো দুটো বাচ্চা ছেলেও ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতে এসেছে। দু'জনেই আলীর বয়সী, কিন্তু দেখতে অনেক শক্তিশালী ব'লে মনে হয়।

"শোন তোমরা, এই উঠোনের চারপাশে বিশবার দৌড়াবে," ড্রিল সার্জেন্টের মত গলায় ইশা আদেশ করল। ছেলেগুলো কয়পাক দৌড়াবে সেটাও ঠিক করে দিল সে। আমার মনে হয়, প্রতিদিনই সে নিজের এই ক্ষমতাটুকু জাহির করে।

আলীর বইগুলো দেখার জন্য আমি উপরে গেলাম। নোটবুকগুলো খালি। অঙ্কের বইটা ক্লাস সেভেনের। কিন্তু মনে হল কোন দিন হাত দেওয়া হয় নি তাতে।

বাইরে দোতলার ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আমাদের ছাত্ররা তখন সকালের দৌড় দৌড়াচ্ছে।

আলী পাঁচ পাক দৌড়ে থেমে গেল।

"কী?" ইশ বলে উঠল।

"আমি...দৌড়াতে...পারছি না," আলী বলল।

মুখ টিপে হাসল অমি। "আরে বাবা, লোকজন এখানে একশ পাক দৌড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উইকেটের মধ্যে দৌড়াবে কীভাবে? ফিল্ডিং করবে কিভাবে?"

"এই জন্যেই...ক্রিকেট...ভাল লাগে না," আলী বলল, এখনও হাঁপাচ্ছে সে। "খেলা শুরু ক'রে দিলে হয় না?" আলী আগ্রহভরে জানতে চাইল।

"প্রথমে একটু গরম হয়ে নিতে হবে," বলল ইশ। কিন্তু অনেক বেশিই গরম হয়ে গেছে আলী। তার মুখটা লাল দেখাচ্ছে।

ব্যায়ামের পরে ইশ ক্যাচ আর ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করালো। ব্যাট নিয়ে ইশ মাঝখানে দাঁড়ালে সবাই একে একে বল করতে শুরু করল তাকে। সে হাত দিয়ে বলটা উঁচুতে ছুড়ে দিয়ে সবাইকে ক্যাচ ধরতে বলল। আলী তার জায়গা থেকে নড়ছে না। কেবল বল তার কাছে আসলে সে ধরছে।

"ঠিক আছে, এবার খেলা শুরু করি," ইশ হাত তালি দিয়ে বলল। "পরেশ, তুমি আমার সাথে। আমরা প্রথমে বল করব। নবীন, তুমি আলীর দলে। তুমিই প্রথমে ব্যাট করবে।"

নবীন ক্রিজে দাঁড়াল, আর আলী হল রানার। পরেশের চতুর্থ বলে নবীন হিট করলে বল ধরার জন্য দৌড়ে গেল ইশ। সহজেই দুই রান নেওয়া যেত কিন্তু আলীর অলসতার কারণে ওরা শুধু এক রান নিল। পরেশ তিন পা দৌড়ে বল করল এবার। দারুণ স্ট্রোক করল আলী। বলটা উঁচুতে উঠে দুই তালার দিকে ছুটলে দুই তালার ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা আমি মাথা নিচু করে ফেললাম। আমার মাথার উপর দিয়ে ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারের অফিসের জানালায় গিয়ে আঘাত করল বলটা।

প্রথম বলেই আলী ছক্কা মারলে ইশের মত পরেশও অবাক হয়ে গেল।

"আরে? তুমি কি হিরো, নাকি অন্য কিছু?" ইশ আলীর দিকে দৌড়ে গেল। কথাটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল আলী।

"এটা ক্রিকেট মাঠ না। একটা ব্যাঙ্কের কম্পাউন্ডে খেলছি আমরা। বল বাইরে গিয়ে পড়ে কারো গায়ে লাগলে কে দায়ি হবে? কিছু ভেঙে গেলে তখন? টাকা দেবে কে?" ইশ চেঁচিয়ে বলল।

আলীর বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি।

"দারুন শট ছিল ওটা," পরেশ নামের ছেলেটা বলল।

"চুপ কর। শোন আলী, তুমি যে এরকম শট মারতে পার সেটা আমি ভাল করেই জানি। খেলার অন্য দিকগুলো এবার শেখ।"

আলী আড়ষ্ট হয়ে গেল, কেঁদে ফেলে আর কী।

"আচ্ছা, শোন, আমি দুঃখিত। আমি বলতে চাইছিলাম..." ইশ বলল।

"আমি তো খালি ষট মারতেই পারি। এ ছাড়া আর কিছুই জানি না," আলী কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

"আমরা তোমাকে শেখাব। তুমি বল করছ না কেন?"

আলী এদিন আর ব্যাট করল না। পরের আধঘন্টার জন্য ইশ সহজ ক'রে প্র্যাকটিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করালো। কোন চিৎকার না দেওয়ারও চেষ্টা করল সে। যদিও এটা তার জন্য কঠিন কাজ। কারণ ক্রিকেট খেলার সময় জন্তুর মতো মনে হয় তাকে।

আলী ঘেমে গেছে। "যাও, উপর থেকে বই নিয়ে আস। এই উঠোনেই পড়ব আমরা," আমি বললাম।

বই এনে অঙ্কের বইয়ের প্রথম অধ্যায়টা খুলল সে–ভগ্নাংশ আর দশমিকের অধ্যায়।

দুধের দুটো পলিপ্যাক নিয়ে আসল অমি। "এই যে নে," ইশকে একটা দিল।

"ধন্যবাদ," ইশ বলল, মুখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল পলিপ্যাকটা।

"আর এই যে আরেকটা," অমি বলল।

"কার জন্যে?" বড় একটু চুমুক দিয়ে বলল ইশ।

"তোমার ওই কাঠির মতন সরু পোকাটারে এটা দাও," অমি বলল। "ওর হাতগুলো দেখেছিস? উইকেটের চাইতেও পাতলা। ওরে তো খেলোয়াড় বানাতে চাস, নাকি?"

"তুই নিজে ওরে দে," ইশ হেসে ফেলল।

দুধের প্যাকেটটা আলীর দিকে ঠেলে দিয়ে চলে গেল অমি।

"ভগ্নাংশের অঙ্ক আগে কখনও করেছ?" আমি জানতে চাইলাম আলীর কাছে।

সে মাথা নেড়ে সায় দিল।

আমি ২৪/৬৪ কে সাধারণ করতে বললাম। লব আর হরকে দুই দিয়ে বার বার ভাগ করতে শুরু করল সে। ক্রিকেটে ছয় মারার যে সহজাত প্রবণতা তার আছে, অঙ্কে সেটা নেই। অবশ্য ওর বাবা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

"দোকানে গিয়ে দেখা হবে তোর সাথে," ইশ আমাকে বলল। তারপর আলীর দিকে ফিরে বলল, "চ্যাম্পিয়ন, ক্রিকেট নিয়ে আর কোন প্রশ্ন আছে?"

"রান নেওয়ার জন্য লোকজন দুই উইকেটের মাঝে দৌড়ায় কেন?" কলমের মাথা কামড়াতে কামড়াতে আলী জানতে চাইল।

"এভাবেই রান নিতে হয়। এটাই নিয়ম," বলল ইশ।

"না, ওটার কথা বলছি না। আমি বলছি দৌড়ে দুই একটা ক'রে রান নেয় কেন? একবারে মেরেই তো ছয় রান নেওয়া যায়?"

ইশ মাথা চুলকাল। "অঙ্ক নিয়েই প্রশ্ন কর তুমি।" বলেই চলে গেল সে।

"একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি, ইন্ডিয়ায় সবচাইতে বাজে প্রজন্ম হল ষাট থেকে আশির দশকের তরুণ প্রজন্ম। এই তিরিশটি বছর ইন্ডিয়ার জন্য অস্বস্তিকর," দোকানে আমরা শুয়ে আছি, সেই সময় ইশ বলল কথাটা।

দোকানের মেঝেতে একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়েছি। বিকেলের ক্লান্ত সময়টাতে ঘুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে সময়টা পার ক'রে দেওয়া যায়। এখন পরীক্ষার সময়। ব্যবসা চলছে মোটামুটি। ইশ আর আমি আমাদের দার্শনিক আলোচনা চালাচ্ছি, অমি ঝিমুচ্ছে।

"যতটা বলছিস ততটা খারাপ না," আমি বললাম। "১৯৮৩-তে আমরা বিশ্বকাপ জিতেছি।"

"হ্যা, আমরা ভাল ক্রিকেট খেলেছি, কেবল সেটাই। আমরা তখনও গরীব ছিলাম, যুদ্ধ চালিয়ে গেছি, সেই একই ধরণের দলকে ভোটে জিতেয়েছি। দেশের জন্য যারা কিছুই করে নি। সরকারী একটা চাকরি পাওয়াই ছিল মানুষের স্বপ্ন। কেউ ঝুঁকি নেয় নি বা কোন উচ্চবাচ্য করে নি। নেতারা একটা ব্যানানা রিপাবলিকের বুলি বাজারে ছেড়েছে যে, এটা একটা সমাজতান্ত্রিক, ইনটেলেকচুয়াল জাতি। ট্যাংক আর থিংক ট্যাংক। আর কিছুই না," ইশ বলল।

"আর এদের মধ্যে সবার উপরে ছিল কে? কোন্ দল? ওই সেকুলার অপদার্থরাই ছিল," এক চোখ খুলে অমি বলল।

"তো, তোমার ঐ ডানপন্থীরাও কিন্তু ঠিকমত কাজ করে নি," ইশ বলল।

"আমরা করব। তৈরি হয়ে আছি আমরা। অপেক্ষা কর। দেখতে পাবি। পরের বছরের ইলেকশন আসলেই দেখতে পাবি। গুজরাট আমাদের হবে," অমি বলল।

"যাই হোক, রাজনীতি বাদ। আমার কথা হচ্ছে, ষাট থেকে আশির দশকের প্রজন্মটা এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছে। এই বোকারামগুলোই এখন দেশ চালাচ্ছে। কিন্তু নব্বই আর ওই যে কী যেন বলে..."

"বর্তমান প্রজন্ম।"

"হ্যা। বর্তমান প্রজন্ম। ওরা কিন্তু অন্যরকম ভাবে। ওই মান্ধাতা আমলের লোকগুলোই আমাদের চালাচ্ছে। নিজেদের সুবর্ণ সময়ে তারা তেমন কিছুই করে নি। দূরদর্শনের প্রজন্ম এখন স্টারটিভির প্রজন্মকে চালাচ্ছে," ইশ বলল।

আমি হাত তালি দিলাম। "ওয়াও, *টিম ইন্ডিয়া ক্রিকেট শপ*-এ ফাও ফাও জ্ঞান বিলানো হচ্ছে।"

"ধ্যাত্। এখানে এরকম কোন আলোচনা করা ঠিক না। কেবল নিজেকেই ইনটেলেকচুয়াল ভাবো। আমি শুধুই ক্রিকেট কোচ," ইশ গর্জাতে লাগল।

"না, তুমিই ইনটেলেকচুয়াল, দাদা। আমি খালি ঘুমাই। এখন একটু থামি সবাই? দেখি পরে কোন্ পিচ্চি আসে দোকানে," চোখ বুজতে বুজতে বললাম আমি, শীঘ্রই আমাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটল।

"শুয়ে আছে, সাবাস। ভাড়া কম হলে তো দোকানদাররা ঘুমাবেই," বিট্টু মামার গলা শুনে আমরা সবাই উঠে বসলাম। এখানে আবার কী করতে এসেছে সে?

"এই সময়টাতে বেচাকেনা তেমন হয় না, মামা," একটা টুল টানতে টানতে অমি বলল। চা আনার জন্য আমাকে ইশারা করলে ক্যাশ বাক্স খুলে কিছু কয়েন নিলাম আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"খাওয়ার জন্যও কিছু নিয়ে আসো," মামা বললেন। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তো মামার নাস্তার জন্য এখন টাকাটা দেবে কে? মুখে একটা মেকি হাসি ফুটিয়ে দোকান থেকে বের হওয়ার সময় ভাবলাম। ভাড়াটা আসলে তেমন সস্তা নয়। সবার জন্য চা নিয়ে ফিরে এলাম।

মামা দেখি অমিকে বলছে, "বিকেলে বেশি বেচাকেনা না হলে আমার সাথে চলে আয়। তোর বন্ধুদেরও নিয়ে আয়। একটা নির্বাচনী আসনে জেতা এত সোজা না। এই সেকুলার লোকগুলো বেশ ভাল।"

"আমাকে কী করতে হবে, মামা?" অমি বলল। ঝাঁপি থেকে চা'র গ্লাসগুলো নিয়ে সবার কাছে দিল সে।

"তরুণদের জাগাতে হবে। আমাদের দর্শন ওদের কাছে বলবি। ভণ্ডদের নিয়ে সতর্ক ক'রে দিবি। ক্যাম্পেনের সময়, প্রচারের জন্য র‍্যালি আয়োজনের জন্য লোকজনের দরকার। কাজ আছে।"

"পরের বার আমি আসব, মামা," অমি বলল।

"অন্যদেরও বল। যুবক ছেলেপেলের মন্দিরে দেখলে আমাদের পার্টির কথা তাদের বলবি। আমার কথা বলবি।"

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। মন্দিরে যারা আসবে তাদের টার্গেট করা হবে। পার্টির দর্শন বোঝানো হবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু কেউ যখন প্রার্থনা করতে আসে তখন রাজনীতি করার কথা কি তাদের বলা উচিৎ? নিজেকে এসব থেকে দূরে রাখার জন্য অ্যাকাউন্টস রেজিস্টারটা খুললাম।

"তুমি আসবে?" ইশের দিকে ফিরে বললেন মামা।

"দোকানে তো কাউকে থাকতে হবে। বেচাকেনা কম হলেও একজনকে অন্তত থাকতেই হয়," ইশ বলল।

"গোবিন্দ, তুমি?" মামা বললেন।

"এই ধরণের কাজে আমি নেই। আমি অজ্ঞেয়বাদী, মনে পড়েছে আপনার?" রেজিস্টার পড়তে পড়তেই বললাম কথাটা।

"এটা তো ধর্মের ব্যাপার নয়। ন্যায় বিচারের প্রসঙ্গ।। কম দামে দোকানটা তোমাদের ভাড়া দিয়েছি, আমাদের কাছে কিছু ঋণ তো তোমাদের আছে।"

"এটা আপনার দোকান না। অমির মা আমাদের এটা দিয়েছেন। আর জায়গার কথা বললে, যে ভাড়া আমরা দিচ্ছি, সেটা যথেষ্টই," আমি বললাম।

"আমি একাই পারব মামা। ধীরাজও সাথে থাকবে। ঠিক আছে?" মামা আর আমার মাঝে টান টান অবস্থা কাটানোর জন্য অমি কথাটা বলল। ধীরাজ মামার চৌদ্দ বছর বয়সী ছেলে এবং অমির কাকাতো ভাই।

"কী বড়াই, দ্যাখ। এই সামান্য একটা দোকান দিয়েই কী বড়াই," মামা বললেন। "অমি না থাকলে, তোমাকে লাথি দিয়ে বের ক'রে দিতাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তার আর দরকার হবে না। খুব তাড়াতাড়ি আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি," কিছু না ভেবেই বলে দিলাম। কথাটা না বলে আর পারলাম না। ভেবেছিলাম, নবরংপুর মলে চলে যাবার সময় একেবারে শেষ মুহূর্তে কথাটা বলব। কিন্তু তার পিঠ চাপড়ানো মার্কা কথা শুনে বিরক্ত হয়ে গেছি।

"ওহ্, তাই নাকি? কোথায়, এই ব্যাট আর বল দিয়ে ঠেলাগাড়ি বানাবা নাকি?" মামা বললেন।

"আমরা নবরংপুর মলে যাচ্ছি। তখন আপনার দোকান আপনি ফিরে পাবেন।"

"কী?" মামা অবাক হয়ে গেলেন।

"পরের মাসে আমরা জামানত রাখব, তিন মাসের মধ্যে মল চালু হয়ে পজিশন পেয়ে যাব। এই সামান্য দোকানটা একটা ভাল জায়গায় খেলার দোকানে সরিয়ে নেব," আমি বললাম।

মামার মুখ হা হয়ে গেল। মাসের পর মাস ধরে মামার এই চেহারাটাই কল্পনা করছিলাম আমি।

"সত্যি?" মামা অমির দিকে ফিরলে অমি মাথা নেড়ে সায় দিল।

"জামানত কত টাকার?" মামা বললেন।

"চল্লিশ হাজার। আমরাই এটা জমিয়েছি," আমি বললাম।

"এই দোকানের জন্য তোরা মাসে এক হাজার টাকা ভাড়া দিস। দুই হাজার ভাড়া দিলে এত জমাতে পারতি না," মামা বললেন।

আমি কিছু বললাম না।

"কী? এখন চুপ আছ কেন? আহ্," মামা উঠে দাঁড়ালেন।

কী করব আমি? লাফ দিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরব? তার ভাগ্নেটাকেও তো আমি কাজ দিয়েছি। আমার ব্যবসাতে সেও সমান অংশীদার। অমি আমার বন্ধু, তা ঠিক। কিন্তু তার যা যোগ্যতা, কেউ তাকে এই কাজে নেবে না। সস্তায় ভাড়া ঠিক ক'রে দেওয়া–এই একটা কাজই সে করতে পেরেছে।

"দরকার পড়লে আমাকে জানাবেন, মামা," অমি বলল।

"ঠিক আছে, দেখা করব তোর সাথে," তিনি বললেন, "বিশ্রাম নে, যা।"

মামা চলে যাওয়ার পরে ইশ তার মধ্যমা আঙুল উঁচিয়ে দেখাল। তারপর আবার শুয়ে পড়লাম আমরা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৭

"যে অঙ্কগুলো দিয়েছিলাম, করা হয়েছে?"

বিদ্যা মাথা নেড়ে সায় দিল। পাশাপাশি বসে আছি বলে তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। একটা হাত তুলে চোখ মুছল সে, বুঝলাম এইমাত্র কান্নাকাটি করেছে।

তার টিউশন নোটবুকটা খুললাম। আমি টিউটর, তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কাজ আমার না। "সবগুলো করা হয়েছে?" না-সূচক মাথা নাড়ল সে। "কতগুলো করা হয়েছে?"

সাতটা আঙুল দেখাল আমাকে। দশটার ভেতরে সাতটা করা হয়েছে, খারাপ না। কিন্তু সে কোন কথা বলছে না কেন?

"কী হল?" আমি বললাম, সেটা তার ভেজা চোখের জন্যে নয়। কিছু একটা কথা বলতে হবে তাই বললাম আর কি।

"কিছু না," ভাঙা ভাঙা গলায় বলল সে। কোন মেয়ের 'কিছু না' বলতে অনেক কিছু বোঝায়। আসলেই 'অনেক কিছু' বোঝাচ্ছে। এজন্য কিছু শুরু করতে পারছিলাম না, একটা 'কিছু না'র জবাবে উপযুক্ত কোন উত্তর খুঁজে ফিরছি আমি।

"মুখ ধুয়ে আসবে?" আমি বললাম।

"না, ঠিক আছে, শুরু করি।"

তার চোখের দিকে তাকালাম, মেয়েদের পাঁপড়িগুলো ভেজা। তার চোখগুলো তার ভাইয়ের মতই, ফর্সা মুখে বাদামী রঙটা আরো বেশি চোখে পড়ে।

"দ্বিতীয় অঙ্কটাও ঠিক করেছ," বলে তার নোটবুকে টিক চিহ্ন দিয়ে অভ্যাসবশত 'গুড' লিখে দিলাম। সাধারণত ছোট ছেলেমেয়েদের 'গুড' বা 'সাবাস' এ জাতীয় কিছু লিখে দিলে বা 'তারকা' চিহ্ন এঁকে দিলে সেটা খুব ভালবাসে তারা। কিন্তু বিদ্যা তো আর বাচ্চা মেয়ে নয়।

"ভালই করেছো দেখি," তার খাতা দেখে বললাম।

"একটু দাঁড়ান," বলে বাথরুমে দৌড়ে চলে গেল সে। সম্ভবত কান্নায় ফেটে পড়ছে। ফিরে এলে দেখলাম চোখের কাজল মুছে গিয়েছে আর পুরো মুখটা ভেজা।

"আচ্ছা শোন, তুমি মন দিতে না পারলে পড়িয়ে তো লাভ হবে না। আজ অনেক জটিল অঙ্ক করতে হবে আর..."

"না, আমার কোন সমস্যা না। গরিমা আর ওর, থাক। বাদ দেন।"

"গরিমা?"

"হ্যা, আমার কাকাতো বোন, আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু। বোম্বে থাকে। ঐদিন আপনাকে বলেছিলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মনে নেই," বললাম আমি।

"গতকাল রাতে ও আমাকে বলল, সকাল বেলা মোবাইলে এসএমএস করবে। বিকেল হয়ে গেছে, এখনও পাঠায় নি। ও সব সময় এরকম করে।"

"তা তুমি পাঠিয়ে দাও না?"

"আমি পাঠাব না। ও বলেছে ও পাঠাবে। কাজেই ওরই পাঠানো উচিত, ঠিক না?"

শূন্য দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে, কোন জবাব দিতে পারলাম না।

"পাবলিক রিলেশন্সের বেশ ভাল চাকরি করে ও। তাই বলে একটা লাইন টাইপ করার সময়ও পাবে না?"

মনে মনে কামনা করলাম, সেই মেয়েটা তাকে যেন এসএমএস পাঠায় যাতে করে আমরা ক্লাস শুরু করতে পারি।

"এরপরে ওকে বলব, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে। বলে দু'দিন কোন কল করব না," সে বলল।

কিছু, আবারও বলছি, কিছু মেয়ে আছে যারা বন্ধুত্ব পরীক্ষা করার জন্যে একে অন্যের সাথে আবেগ নিয়ে খেলা খেলে থাকে।

"আমরা কি শুরু করব?"

"হ্যাঁ, এখন একটু ভাল লাগছে। কথাগুলো বললেন বলে ধন্যবাদ।"

"ঠিক আছে। আট নম্বর অঙ্কটাতে কী হল?" আমি বললাম।

পরের আধা ঘণ্টা ধরে সম্ভাব্যতার অঙ্ক নিয়ে ডুবে থাকলাম আমরা। সে মনোযোগ দেওয়ার পরে বুঝতে পারলাম অঙ্কে সে কাঁচা না। কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি তার মনোযোগ থাকে না। একবার কলম পাল্টায় তো আরেকবার চুলের ক্লিপ খুলে আবার লাগায়। পনের মিনিট পর পর পিঠে একটা বালিশ দেওয়ার দরকার হয় তার। তার মা চা-বিস্কুট পাঠালে প্রতি তিরিশ সেকেন্ড পরপর একবার চুমুক দেয় চায়ে। তারপরও আমরা চালিয়ে গেলাম। চল্লিশ মিনিট ক্লাস করার পর চেয়ার পেছনে টেনে সরিয়ে রাখল আমি।

"আমার মাথা ঘুরছে। জীবনে এত অঙ্ক কখনও এক সাথে করি নি। একটু বিরতি নিই?"

"বিদ্যা, আর বিশ মিনিট সময় আছে আমাদের হাতে," বললাম।

সোজা উঠে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করল সে। "ক্লাসের মাঝে একটা পাঁচ মিনিটের বিরতি হলে কেমন হয়? এত সময় ধরে অঙ্ক করা উচিত না। এটা ভাল না।"

কলমটা পাশে রেখে চুল খুলে ফেলল ও। এক গোছা চুল এসে পড়ল আমার বাহুর উপর। হাত সরিয়ে নিলাম।

"অন্য সাবজেক্টগুলোর প্রস্তুতি কী রকম? বিজ্ঞান তো তোমার খারাপ লাগে না। নাকি?" আমি বললাম। বিরতির সময়টা কাজে লাগাতে চাচ্ছি আর কি।

"বিজ্ঞান আমার পছন্দ। কিন্তু ওরা যেভাবে শেখায়..." বিদ্যা বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী রকম?"

"মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার গাইডের মত। হাজার হাজার মালটিপল চয়েস কোশ্চেন থাকে। এগুলো পারলেই ডাক্তারিতে চান্স পাওয়া যায়। বিজ্ঞান নিয়ে আমি এভাবে ভাবি না।"

"তো, এখানে কিন্তু আমাদের কোন চয়েস নেই। ভাল কলেজ খুব কমই আছে। খুব কঠিন প্রতিযোগিতা।"

"আমি জানি। কিন্তু যে লোকগুলো এসব প্রশ্নপত্র তৈরি করে, কেমিস্ট্রি নিয়ে তাদের মাঝে আদৌ কোন কৌতুহল আছে কিনা সে কথাই ভাবি। বেছে বেছে শুধু রিঅ্যাকশনেই চোখ পড়ে কেন? বা ওরা কি কখনও এর দিকে আকৃষ্ট হয়? মার্বেল পাথরের মূর্তি দেখে কীভাবে ওরা, স্থির মনে হলেও ভাবে, মূর্তিটার মধ্যে আসলে প্রোটনগুলো কিলবিল করছে আর ইলেকট্রনগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে পাগলের মতো।"

তার জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর দিকে তাকালাম। ভাবলাম সম্ভাব্যতা শেখানোর সময় যদি তার চোখে এই ঔজ্জ্বল্য থাকতো।

"ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য, তাই না?" আমি বললাম।

"অথবা বায়োলজির কথাই ধরেন। এটার কথা ভাবেন," বলে আমার ত্বক স্পর্শ করল ও। "এটা কি?"

"কী?" বললাম আমি, সে আমার গায়ে হাত দেওয়ায় অবাক হয়ে গেলাম।

"এটা আপনার ত্বক। এখানে অনেক ব্যাকটেরিয়া দল বেঁধে থাকে, তা জানেন? মিলিয়ন মিলিয়ন অণুজীব আছে আমাদের গায়ের উপরেই। তারা খায়, বংশবিস্তার করে আবার মারাও যায়। তারপরও আমরা এসব নিয়ে ভাবি না। কেন? এপিডার্মাল লেয়ার ডায়াগ্রামটা মুখস্থ করাই আমাদের লক্ষ্য থাকে। কারণ প্রতি বছরই এটা পরীক্ষায় আসে।"

এই মেয়েটাকে কি বলা যায় সেটা আমার জানা নেই। সম্ভবত সাত বছর বয়সীদের পড়ানোই আমার উচিত ছিল।

"পাঠ্য বইয়ের বাইরেও কিছু ভাল রেফারেন্স বই আছে," তাকে বললাম।

"আছে নাকি?"

"হ্যা আছে। ল'গার্ডেন বুক মার্কেটে পাওয়া যায়। কনসেপ্টগুলোর ভাল আলোচনা আছে। তুমি চাইলে নিয়ে আসতে পারি। তোমার বাবা-মাকে বলে দ্যাখা, তারা কিনে দেয় কি না।"

"অবশ্যই দেবে। পড়াশুনার জন্য হলে তারা কিনে দিতে এক পায়ে খাঁড়া। কিন্তু আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি?"

"না, তার দরকার নেই। বিল আমি দিয়ে দেব।"

"কী?"

"মানে, তোমাকে কষ্ট ক'রে যেতে হবে না। আমি নিজেই বিলটা দিয়ে দেব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি বোকা নাকি অন্য কিছু? সময়টা ভালই কাটবে আমাদের। আমরা এক সাথেই যাব।"

"আচ্ছা, বাকি অঙ্কগুলো করি এখন। পনের মিনিট বিরতি নেওয়া হয়ে গেছে।"

কিছু অঙ্ক করিয়ে হোমওয়ার্ক হিসেবে দশটা প্রবলেম সমাধান করতে দিলাম তাকে। চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় তার সেলফোনটা বিপ্ বিপ্ শব্দে বেজে উঠলে দৌড়ে ফোন ধরতে চলে গেল সে। "গরিমা," ও বলল। আমি বাইরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে চলে গেলাম।

বাড়ির বাইরে পা বাড়াতেই ইশের সাথে দেখা হল আমার।

"কীরে, ভাল পড়ছে ও? ওতো মাথামোটা, ওকে শেখানো সহজ না হওয়ারই কথা," বলল ইশ। প্র্যাকটিসের পরে ঘামে শরীর ভিজে আছে তার।

"খারাপ না, দ্রুত শিখতে পারে," আমি বললাম। কেন জানি না ইশের দিকে তাকিয়ে আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। ভাবলাম, বই কিনতে বিদ্যার সাথে ল গার্ডেনে যাব, সে কথা ওকে বলা উচিত হবে কিনা। বলাটা বোধহয় বোকামি হবে। ভাবলাম, সব কিছুই তো আর ওর কাছে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই।

"আলীকে আটকানোর একটা উপায় পেয়ে গেছি," ইশ বলল।

"কীভাবে?"

"প্রথমে ওর চার-ছয়টা ওকে মারতে দিলাম। তারপর ওর খেলা আমাদের মতই হয়ে যাবে।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"অন্য ছেলেগুলো অবশ্য ফাউল আছে। ওরা ভাবে এই ছাত্রকে আমি একটু বিশেষ চোখে দেখি," ইশ বলল।

"ওরা তো বাচ্চাছেলে, ওদের নিয়ে চিন্তার কিছু নেই," আমি বললাম। ভাবছিলাম, কতক্ষণ যে থাকতে হবে ওর সাথে কে জানে। আর আমিই বা কেন এরকম অপরাধী বোধ করছি?

"হ্যা, কিছু ছাত্র থাকে যারা স্পেশাল, ঠিক কিনা?" ইশ মুখ টিপে হেসে বলল। এক ন্যানো সেকেন্ডের জন্য মনে হল, ইশ আমাকে খোঁচা দিচ্ছে। না, ও আসলে আলীর সম্পর্কে বলছে। আমার কোন বিশেষ ছাত্র-ছাত্রি নেই।

"শোন। এখন যেতে হবে। বড় একটা বিয়ের অনুষ্ঠানের অর্ডার আছে। মাকে সাহায্য করা দরকার।"

এই বলে দ্রুত পা ফেলে ওর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলাম আমি। অমির মন্দিরের মার্বেল পাথরের ভেতরের ইলেকট্রনগুলোর মত আমার মাথা তখন ভো ভো ক'রে ঘুরছে।

*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ল গার্ডেনে বেড়াতে যাওয়ার দিন একটা সাদা চিকন সালোয়ার কামিজ পরেছে ও। বন্ধিনীটা কমলা রঙের। লাল দোপাট্টার কিণারে ছোট ছোট পিতলের বল। হাত ঘুরালেই ওগুলো বেজে উঠছে। অতিরিক্ত কিছু প্রসাধনীও মেখেছে। চকচক করছে ঠোঁট দুটো। আমি সেদিকে না তাকিয়ে পারলাম না।

"লিপস্টিক খুব বেশি হয়ে গেছে নাকি?" আঙুল দিয়ে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে ইচ্ছে করেই বলল কথাটা। উপরের ঠোঁটের ডানদিকে একটা তিল আছে। সহসা দেখা যায় না। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রাস্তায় স্কুটারের খোঁজ করতে লাগলাম। আর কখনও ওর মুখের দিকে তাকাবে না, নিজেকে তিরস্কার করে বললাম।

দোকানে পৌঁছে বললাম, "ওই যে বইয়ের দোকানটা।"

নবরংপুরের ইউনিভার্সিটি বুক-স্টোর হচ্ছে শহরের সব তস্করদের আস্তানা। বেশির ভাগ খদ্দেরদের চেহারায় নিদ্রাহীনতার ছাপ। অত্যুৎসাহী ছাত্র-ছাত্রি। কোয়ান্টাম ফিজিক্স বা মেকানিক্স নিয়ে ওদের শেখার শেষ নেই। কোন পরিসংখ্যান নেই, তারপরও বলতে পারি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার দিয়েছে শহরের এমন যে কেউ এই বইয়ের দোকানে এসেছে।

মাঝ বয়সী দোকানদার চশমার ভেতর দিয়ে বিদ্যার দিকে তাকাল। এ মাসের সব কাস্টমারের মধ্যে বোধহয় তার চেহারাটাই সবচেয়ে বেশি সুন্দর। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা যারা দেয় তারা ঠিক রঙিন লিপস্টিক ব্যবহার করে না।

"এই যে, এদিকে একটু ভাই," আমি বললাম। দোকানীটা এতক্ষণে বিদ্যার আপদমস্তক দেখে নিয়েছে।

"গোবিন্দ বেটা, তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে," সে বলল। বয়স্ক লোকগুলোর নিজেদের কাম প্রবণতা ঢাকার জন্য একটা ভাল উপায় আছে। আপনাকে হয়ত তার নিজের ছেলে বা মেয়ে বলে ডাকবে। বোর্ড পরীক্ষায় একশ পাওয়ার পর থেকে আমার নামটা তার জানা। খবরের কাগজের সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় তার দোকানের নামটা উল্লেখ করেছিলাম। তারপর থেকে দু'বছর ধরে কাগজের কাটিংটা লোককে দেখাচ্ছে সে। এখন পর্যন্ত প্রতিবার বই কেনার সময় পঁচিশ শতাংশ ছাড় পাই আমি।

"এল.জি. ওয়েড-এর অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি বইটা আছে?" আমি বললাম। টুকটাক আরো কথা বলতাম। কিন্তু বিদ্যাকে নিয়ে কোন কথা বলতে চাচ্ছিলাম না। এমন কি সে বিদ্যার দিকে তাকাক সেটাও চাচ্ছিলাম না।

"আচ্ছা। হ্যা, আছে তো," দোকানী বলল। আমার তাড়াহুড়ার ভাব দেখে অবাক হয়ে গেছে সে।

"কেমিস্ট্রি বই, প্রচ্ছদে লাল আর সাদা বল আছে," চেঁচিয়ে বলল সে, তার কাজ-কর্মে সাহায্য করার জন্য আরো পাঁচজন লোক আছে। তাদেরই একজনের উদ্দেশ্যে কথাটা বলা।

"এটা একটা ভাল বই," প্রচ্ছদে টোকা মেরে বইটা বিদ্যাকে দিয়ে বললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেমিস্ট্রির অন্য বইগুলোতে অনেক কিছু মুখস্থ করার জিনিস আছে। এই বইটাতে কেবল মূলনীতিগুলো আলোচনা করা হয়েছে।"

বিদ্যা বইটা হাতে নিল। বইয়ের প্রচ্ছদের পরমাণুর ছবির মতো তার নখপালিশের রঙও লাল টকটকে।

"উল্টেপাল্টে দ্যাখ ভাল লাগে কিনা," আমি বললাম।

কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টালো সে। দোকানী একটা ভ্রু তুলল। মানে, মেয়েটার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছে সে। এই দেখেন না, এই কারণেই আহমেদাবাদকে লোকজন ছোট শহর বলে। যদিও এখানে অনেক মাল্টিপ্লেক্স আছে। লোকজনের মানসিকতাটাই এই রকম।

"ছাত্রি, আমি ওকে পড়াই," তার কৌতুহল মেটানোর জন্য আস্তে ক'রে বললাম। পাছে তার বাকি জীবনের ঘুমটাই মাটি হয়ে যায়। সম্মতি জানানোর মত ক'রে মাথা নাড়ল সে। এই বুড়ো লোকগুলো আমাদের ব্যাপারে এত নাক গলায় কেন? সে যদি তিনজন দাদীমার সাথে ঘুরতে বেরোয়, আমরা কি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবো?

"আপনি যখন ভাল বলেছেন তখন ঠিকই আছে," বই দেখা শেষ বিদ্যা বলল।

"আচ্ছা, ফিজিক্সের রেসনিক অ্যান্ড হ্যালিডে পড়েছ?"

"ও, ওই বইটা একবার আমার এক বন্ধুর কাছে দেখেছিলাম। সূচীপত্র দেখেই আর ভাল লাগে নি। এত উঁচু মানের বই আমার জন্য নয়।"

"উঁচু মানের আবার কী? তোমার কোর্সেই ওগুলো আছে। ওগুলো তো পড়তে হবে," কঠিন গলায় বললাম।

"কোন গাইড বা এ ধরণের কিছু নেই?" ও বলল। আমার মন্তব্যকে কোন আমলেই নিলো না।

"গাইড হচ্ছে শর্টকাট পদ্ধতি। নির্দিষ্ট কিছু প্রবলেম সমাধান ক'রে দেওয়া থাকে। মূল বিষয়টা তোমার বোঝা দরকার।"

দোকানী রেসনিক অ্যান্ড হ্যালিডের কমলা আর কালো প্রচ্ছদের বইটা বের করল। হ্যা, প্রচ্ছদটা ভয় পাওয়ার মতই। দেখতে একদম নীরস। ফিজিক্স বইয়ের বেলায়ই শুধু এরকম হয়।

"এই বই আমি বুঝতে পারব না। কিন্তু আপনি চাইলে বইটা আমি কিনবো," বিদ্যা রাজি হল।

"অবশ্যই বুঝবে। আর কাকা, অঙ্কের জন্যে এম.এল খান্নার বইটা কি আছে?" তাকে কাকা বলায় মনোক্ষুন্ন হয়েছে বুঝতে পারলাম। কিন্তু কেউ একজন তাকে ডেকে মনে সেটা করিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল।

"অঙ্ক খান্না," দোকানী চিৎকার দিয়ে উঠলে তার সহকারীরা হলুদ কালো বড় বইটা বের ক'রে দিল। রেসনিক অ্যান্ড হ্যালিডে যদি ভয়ঙ্কর হয় তাহলে এম.এল খান্না হচ্ছে ভুতের রাজা। এর চেয়ে মোটা বই আর দেখি নি। প্রতিটি পৃষ্ঠা দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্কে ভরা। মজার ব্যাপার, এম.এল খান্নার মতো বন্ধুসুলভ নাম নিয়ে লোকটা আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রিদের সঙ্গে এরকম একটা কাজ কিভাবে করতে পারল!

"কী এটা?" বলল বিদ্যা। বাম হাতে বইটা তুলে ধরার চেষ্টা করল সে, পারল না। দু'হাত দিয়ে শেষ পর্যন্ত ছয় ইঞ্চি উঁচুতে তুলতে পারল। "না, সিরিয়াসলি, কী এটা? মারণাস্ত্র নাকি?"

"এতে সব টপিকই আছে," বললাম আমি। ডান হাতের আঙুল দিয়ে কতটা মোটা মাপার চেষ্টা করলাম। চার আঙুল দিয়ে মাপা গেল না।

সে-ই আমার পাশে হাত দিয়ে বইটা মাপতে সাহায্য করল।

"ছয়, ছয় আঙুল মোটা," মৃদু ক'রে বলল সে।

আমি হাত সরিয়ে নিলাম, পাছে কাকা আবার ভ্রু তুলে দেখে। কিংবা পুরুত্ব মাপার জন্য সেও যদি আমাদের হাতের পাশে নিজের হাত রাখে তাহলে সবচেয়ে বেশি খারাপ হবে।

"চিন্তার কিছু নেই। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য মাত্র কিছু টপিক পড়তে হয়," ওকে আশ্বস্ত করে বললাম।

বইটার দাম দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম দু'জনে।

নবরংপুর মেইন রোড ধরে হাঁটছি আমরা। নতুন যে দোকানটায় যাচ্ছি সেটা দুশ' মিটার দূরে। ওটা দেখার তাড়া আছে আমার।

"এখন কী?" সে বলল।

"কিছু না, বাড়ি ফিরব," বললাম আমি। একটা স্কুটার খুঁজতে লাগলাম। "আপনি খুবই বিরক্তিকর, বুঝলেন?" সে বলল।

"কী বললে?" আমি বললাম।

"ওই তো, সামনেই ডেইরি ডেন আছে। ক্ষিদে পেয়েছে আমার," বলল সে। "উপোস আছি আমি। সিরিয়াসলি, ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছি।" পেটের উপরে একটা হাত রাখল সে। তিনটা আংটি পরে আছে। প্রতিটির ডিজাইন আলাদা। ছোট নানা রঙের পাথর বসানো আছে সবগুলোতে।

ডেইরি ডেনে যে আসনটাতে বসলাম সেখানে বসলে লোকজন দেখে ফেলার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। নিশ্চিত, আমাদের গুজবপ্রেমী মহল্লার কোন লোক এই হাল আমলের উঠতি বয়সীদের আড্ডাখানায় আসে না। তবে এত সতর্ক থাকার দরকারও নেই। কোন সাপ্লায়ার যদি আমাকে এই ডেইরি ডেনে দেখে তো আহমেদাবাদের যেকোন কেতাদুরস্ত ছেলের মতই লাগবে আমাকে। ক্রিকেট বল বেচে ভাল দাম কখনই পাবো না। আমারও ক্ষিদে লেগেছে। কিন্তু নাটকের রাণীর সাথে অভিনয়ে তাল মেলাতে পারছি না। ডেনের স্পেশাল পিজ্জার অর্ডার দিল সে।

সবই নিরামিষ খাবার। আহমেদাবাদীরা এটাই পছন্দ করে।

"এই বইগুলোকে সত্যি অনেক অনেক উঁচু মানের মনে হয়," প্লাস্টিক ব্যাগটা দেখিয়ে বলল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওগুলো এম.এস.সি'র বই," আমি বললাম।

ভ্রু কপালে তুলল ও। "একটা ব্যাপার কেউ কি বলতে পারে? সতের বছরের ছাত্রকে আমাদের দেশে এম.এস.সি'র বই পড়তে হবে কেন?"

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। অলস ছাত্র-ছাত্রিদের এসব প্রশ্নের কোন জবাব আমার কাছে নেই।

পিজ্জা এলে চুপচাপ খাওয়া শুরু করলাম আমার। ওর দিকে তাকালাম। চুল বেঁধে নিল ও, যেন পিজ্জার উপরে না পড়ে আর পনিরের গায়ে না লাগে। দোপাট্টাটা টেবিল থেকে দূরে চেয়ারে রেখে দিল। মেয়েদের ব্যাপারে একটা ভাল দিক হচ্ছে, আলাপচারিতায় বিরিতির মাঝেও আপনি তাদের দিকে তাকাতে পারেন এবং এজন্যে কোন একঘেয়েমি আসবে না।

দূরে এক টেবিল থেকে দুটো ছেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আড় চোখে তাকাল ও। আশ্চর্য কিছু না। ডেইরি ডেনে সে-ই সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। সুন্দরী মেয়ে এত কম কেন? ছেলেরা সুন্দরী মেয়েদের পছন্দ করে। বিবর্তনে কেন যে এই ব্যাপারটার মীমাংস হল না। সব মেয়েই সুন্দরী হল না কেন?

নতুন কোন এসএমএস আছে কিনা দেখার জন্য ওর ফোনটা চেক ক'রে জামার অস্তিন গুটিয়ে এক ফালি পিজ্জা তুলে নিল। আঙুল দিয়ে যেটুকু পানির বাইরে পড়ে গিয়েছিল সেটা তুলে আবার পিজ্জার উপরে রাখল সে। শেষে একটা কামড় দিল।

"তারপর," নীরবতা ভাঙল ও, "বিজ্ঞানের বিষয় বাদে অন্য যেকোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি আমরা, বুঝলেন?"

"অবশ্যই," আমি বললাম। অন্য টেবিলে বসে থাকা ছেলেগুলোর দিকে তাকালাম, ওরা আমাকে খেয়ালই করছে না।

"আমাদের বয়সের ব্যবধান খুব বেশি না। আমরা বন্ধু হতে পারি," ও বলল।

"আচ্ছা," আমি বললাম, "কঠিন ব্যাপার। তাই না?"

"কঠিন? একটা কারণ আমাকে বলেন তো, কেন?"

"চারটা কারণ দেখাচ্ছি–এক, আমি তোমার শিক্ষক। দুই, তুমি আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুর বোন, তিন, আমার চেয়ে ছোট আর চার, তুমি একটা মেয়ে।"

বুলেটের মত ক'রে কারণগুলো বলে গেলাম। নিজেকে বোকা বোকা লাগছে। মেয়েদের মন না পাওয়ার একটা কারণ আছে। কিভাবে কথা বলতে হয় ভাল ছাত্ররা তা জানে না।

আমার কথা শুনে হাসল সে, বরং বলা চলে আমার সাথে সাথেই হেসে ফেলল।

"তালিকাটার জন্য দুঃখিত। মাথা থেকে সংখ্যা আর অঙ্ক কোনভাবেই বাদ দিতে পারি না," আমি বললাম।

সে আবারও হাসল। "একটা জিনিস বুঝলাম। আপনি সেটা ভেবে রেখেছেন। মানে, আপনি আমাদের বন্ধুত্বের কথা ভেবেছেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুপ থাকলাম আমি।

"আমি মজা ক'রে বলেছি," সে বলল, বলে আমার হাতে টোকা দিল। লোকজনকে শান্ত করার জন্য গা স্পর্শ করার এই স্বভাবটা তার আছে। স্বাভাবিক লোকজনের জন্য এটা ঠিক আছে। কিন্তু আমার মত অসুস্থ মানুষের বেলায় নারী স্পর্শ শান্ত করার চেয়ে উত্তেজনা তৈরি করে বেশি। তার মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল আবার। তার বদলে পিজ্জার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম।

"কিন্তু সিরিয়াসলি, আপনাকে ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য একটা বন্ধু থাকা দরকার," সে বলল।

"কিসের ব্যাকআপ?"

"আপনি, ইশ আর অমি আসলেই খুব ঘনিষ্ঠ। যেন ভ্রূণ অবস্থা থেকেই আপনারা একে অন্যকে চেনেন, এরকমই ব্যাপারটা।"

তার শেষ কথায় আমার মুখ হা হয়ে গেল। বিদ্যা ইশের ছোট বোন, বলা হয়, যেকিনা পুতুল খেলে। এরকম কথা সে শিখল কিভাবে?

"দুঃখিত, বলতে চাচ্ছিলাম, ইশ আর অমি আপনার সেরা বন্ধু। কিন্তু আপনার যদি তাদের সাথে নটখট...উপস্, মানে তাদের ব্যাপারে আপনার যদি কোন ক্ষোভ থাকে তখন কার কাছে সেটা বলবেন?"

"আমার বন্ধুদের নিয়ে আমার কোন ক্ষোভ থাকার দরকার নেই," আমি বললাম।

"কী বলতে চান, তারা একেবারে পারফেক্ট?"

"কেউই পারফেক্ট না।"

"যেমন গরিমা আর আমি সত্যি ঘনিষ্ঠ। আমরা দিনে দু'বার ক'রে কথা বলি। কিন্তু মাঝে মাঝে সে আমাকে পাত্তা দেয় না, কিংবা এমনভাবে কথা বলে যে, আমি ছোট শহরের একটা বোকা মেয়ে। আমার এটা ভাল লাগে না, কিন্তু তারপরেও সে-ই আমার সেরা বন্ধু।"

"আর?" আমি বললাম। মেয়েরা পেঁচিয়ে কথা বলে। বীজগণিতের সমস্যার মতো, কয়েক ধারা পেরিয়ে তারপরে আসল কথাটা বলে তারা।

"আর আপনার সাথে এভাবে কথা বলে, মানে মন খুলে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। তখন ওকে মাফ ক'রে দিতে পারি। সেজন্যে সে আমার অনেক কাছের বন্ধু হলেও আপনি আমার ব্যাকআপ বন্ধু।"

এতটা বুদ্ধি যদি সে অঙ্কে লাগাত, তাহলে তার সার্জন হওয়াটা কেউ আঁটকে রাখতে পারত না। বিদ্যা এই সব সম্পর্ক নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু নিজের ক্যারিয়ার বাঁচানোর জন্য এম.এল খান্না খুলে দেখবে না।

"তাহলে, আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধুদের নিয়ে কোন্ অভিযোগটা আপনার আছে?"

"আমার বন্ধুরা আমার ব্যবসায়েরও শরীক। এ কারণেই ব্যাপারটা জটিল," আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থামলাম। "মাঝে মাঝে মনে হয়, ওরা ব্যবসা বোঝে না, আর নয়তো বোঝে কিন্তু যে আকাঙ্খা নিয়ে আমি ব্যবসা করি সেটা ওরা বোঝে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিল সে। এই মাথা নাড়াটা আমার ভাল লাগে। একবার কেউ মাথা নেড়ে কোন কিছুতে সম্মতি জানালে সেটা খুব গভীরভাবে ছুঁয়ে যায় আমাকে।

"কীভাবে?" আমাকে উস্কে দিল সে।

পিজ্জাটা শেষ করতে করতে তাকে সবকিছু খুলে বললাম। আমাদের দোকানের কথা, কীভাবে আমি সবকিছু ম্যানেজ করছি ইত্যাদি। টিউশন আর কোচিংয়ের ব্যবস্থা ক'রে কীভাবে ব্যবসাটা বাড়িয়েছিলাম সেকথাও বললাম। ইশ বাচ্চাদের কাছে কম দামে জিনিস দিয়ে দেয়াটায় আমি যে মহা বিরক্ত এবং সংখ্যার সাথে দূরতমভাবেও সংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপারে অমির নীরব থাকাটা আমার যে অসহ্য লাগে এসব কিছুই বাদ গেল না। আর শেষটায় বললাম আমার স্বপ্নের কথা–পুরনো শহর ছেড়ে এয়ারকন্ডিশন্ড মলে নতুন দোকান দেওয়া।

"নবরংপুর?" সে বলল, "এখান থেকে খুব কাছে?"

"হ্যা," আমি বললাম। আমার বুকের ছাতি চার ইঞ্চি বেড়ে গেল।

আমার চোখের ঔজ্জ্বল্য সে দেখতে পেল আর আমিও তার চোখে এর প্রতিফলন দেখতে পেলাম।

"ভাল, আপনি কখনও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন নি। কিন্তু আমি নিশ্চিত, আপনি ইচ্ছে করলে চান্স পেতেন," সে বলল।

"নিজেকে কোন অফিসে কল্পনা করতে পারি না আমি। মা আর তার ব্যবসা ফেলে তাকে একা রেখে চলে যাওয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

জীবনে আর কারো সাথে এত কথা বলি নি। এটা ঠিক না। নিজেকে ভর্ৎসনা করলাম। আগের চারটা কারণ মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে বইয়ের স্তূপে ডুবে থাকার চেষ্টা করলাম।

"আমার চাইতে এগুলোর সাথে তোমার বন্ধুত্ব দরকার অনেক বেশি," কথাটা বলেই বিল কত হয়েছে জানতে চাইলাম।

ইশ আমাদের সাপ্লায়ারের বাড়ির বেল বাজাতেই একটা মেয়ের কণ্ঠ ভেসে এল, "আসছি।" নতুন বল কেনা আর পুরনো ব্যাট মেরামতের জন্য এসেছি আমরা।

সাপ্লায়ার পণ্ডিতজির অষ্টাদশী মেয়ে সায়রা দরজা খুলে দিল।

"বাবা জামা কাপড় পরছে, আপনারা গ্যারেজে অপেক্ষা করতে পারেন," পণ্ডিতজির গুদাম ঘরের দোকানের চাবিটা আমাদের হাতে দিতে দিতে বলল সে। গ্যারেজে গিয়ে কাঠের টুলে বসলাম আমরা। মেরামত করার ব্যাটগুলো মেঝেতে ফেলে রাখল ইশান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*পণ্ডিত স্পোর্টস গুডস সাপ্লায়ার্স*টা এলিস ব্রিজে অবস্থিত। মালিক গিরিরাজ পণ্ডিতের এক কামরার বাড়িটা এর ঠিক পাশেই। পাঁচ বছর আগেও কাশ্মিরে তার একটা বড় ব্যাট ফ্যাক্টরি ছিল। এক সময় জঙ্গীরা এসে তাকে তার নিজ শহর থেকে বের ক'রে দেয়। দুটো চয়েস দেওয়া হয় তাকে হয়–গর্দান নয় তো ফ্যাক্টরি বাঁচাও। আজ আহমেদাবাদে একটি ছোট সাপ্লয়ার সে। পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে আছেন, এটাই তার ভাগ্য।

"কাশ্মিরীরা খুব ফর্সা হয়," নির্দোষ আলোচনা শুরু করার জন্য বললাম।

"তুই ওকে পছন্দ করিস," ইশ দাঁত বের ক'রে হেসে বলল।

"তুই কি পাগল?"

"ফর্সা রঙ, অ্যাহ্?" ইশ হাসতে লাগল এবার।

"আমার সেরা খদ্দের গোবিন্দ ভাই দেখি," গোসল সেরে গুদাম ঘরে ঢুকতে ঢুকতে পণ্ডিতজি বললেন। সবুজ কাঠবাদাম দিলেন তিনি আমাদের। ব্যবসায় ক্রেতা হওয়াটা দারুণ ব্যাপার। সবাই হাসিমুখে স্বাগত জানায়।

"আমাদের ছয়টা ব্যাট লাগবে। আর এগুলো মেরামতও করা দরকার," আমি বললাম।

"এক ডজন নাও, গোবিন্দ ভাই," তিনি বললেন। একটা কাঠের বাক্স খুললেন। "ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ সামনে। ভাল চাহিদা তৈরি হবে।"

"পুরনো শহরে হবে না," আমি বললাম।

কাঠের বাক্স খুলে প্লাস্টিকে মোড়ানো একটা ব্যাট বের করলেন তিনি। নতুন উইলো কাঠের গন্ধ লেগে আছে তাতে। যারা তৈরি করে তারা মাঝে মাঝে কৃত্রিম গন্ধ ব্যবহার করে যাতে নতুন ব্যাটের গন্ধ ভাল হয়। কিন্তু পণ্ডিতজি খাঁটি জিনিসের ব্যবসা করেন।

ইশ ব্যাটটা পরীক্ষা ক'রে দেখে বাক্সের কাছে গিয়ে অন্য ব্যাটগুলোও পরীক্ষা ক'রে দেখলো কোন ফাটল কিংবা ত্রুটি আছে কিনা।

"গোবিন্দ ভাই, আপনার ভাগ্য খুব ভাল," পণ্ডিতজি মন খুলে হাসলেন।

"দাম কত?" আমি বললাম।

"তিন শ।"

"ঠাট্টা করছেন?"

"কখনও না," দৃঢ়ভাবে বললেন তিনি।

"আড়াইশ," আমি বললাম, "এটাই শেষ এবং চূড়ান্ত।"

"গোবিন্দ ভাই, এখন এই দামে দেওয়া একটু কঠিন। কাশ্মির থেকে আমার কাজিনের পরিবার চলে এসেছে। সবকিছু হারিয়েছে ওরা। কোন কাজ পাওয়ার আগে পাঁচ মাস আমাকে ওদের খাওয়ার যোগান দিতে হবে।"

"ওরা সবাই ওই ঘরেই থাকছে?" ইশের কৌতুহল জাগল।

"কী আর করা। শ্রীনগরে ওর বাংলো ছিল। পনের বছরের কাঠ বাদামের ব্যবসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। এখন কী সময় এসে হাজির হল। আমাদের নিজেদের বাড়ি থেকেই বের ক'রে দিয়েছে," পণ্ডিতজি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চটের ব্যাগ থেকে মেরামতের জন্য রাখা ব্যাটগুলো বের করলেন।

ব্যবসার কাজে সহানুভূতি দেখানো আমার ভাল লাগে না। আর কিছু দর কষাকষির পরে দুশ' সত্তরে দাম ঠিক হল। "ঠিক আছে," বলে টাকা বের করলাম আমি। হাজারে লেনদেন করি এখন। মনে হল, লাখ বা কোটিতে লেনদেন করা তেমন কোন ব্যাপার না।

পণ্ডিতজি টাকাটা নিয়ে গুদামঘরের ছোট মন্দিরটায় ছুঁইয়ে পকেটে টাকা রেখে দিলেন। তার ভগবান জীবনে তাকে বিশাল একটা অঙ্কের টাকা শোধ করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু এখন সে তার প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশ্বাসীরা যে এরকম পরম বিশ্বাস ধারণ করে সেটা কখনও আমার বোধগম্য হয় না। জানি, অজ্ঞেয়বাদী হওয়ার কারণে কিছু ব্যাপার হয়ত আমার মাঝে নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৮

প্র্যাকটিসে বিশ মিনিট পরে এসেছে আলী। প্রতিটি দেরি হওয়া মিনিটে উত্তেজিত হয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছে ইশ।

"কুর্তা পাজামা পরে এসেছ, তোমার ব্যাগ কোথায়?" আলী সকাল ৭টা ২০মিনিটে এসেছে দেখে ইশ চিৎকার ক'রে বলল।

"দুঃখিত, ঘুম থেকে দেরিতে উঠেছি। সময় পাই নি, আর..."

"দৌড় শেষ কর," ইশ বলল। ব্যাংকের পাঁচিল ঘেরা উঠোনের মাঝে দাঁড়াল সে।

আলী দৌড় শেষ করার পরে ইশ নতুন একটা ব্যাট মোড়ক থেকে খুলে তাকে দিল।

"তোমার জন্য, একেবারে নতুন। কাশ্মীরের। পছন্দ হয়?"

আলী নির্লিপ্তভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল। "আজ তাড়াতাড়ি যেতে পারব তো?"

"কেন?" ইশ সজোরে বলল।

"আমার মহল্লায় মার্বেল প্রতিযোগিতা হবে।"

"তাহলে ক্রিকেটের কী হবে?"

আলী কাঁধ ঝাঁকালো।

"এসেছ দেরিতে, আবার তাড়াতাড়ি যেতে চাচ্ছ। মার্বেল খেলে কী হবে?" ক্রিজের দিকে ইঙ্গিত করতে করতে ইশ বলল। বাকি তিন ছেলের ভেতর থেকে বোলার হল একজন।

"আমরা ক্যাচ প্র্যাকটিস করব। আলী, কোন শট মারবে না। ওদের ক্যাচ দেবে।"

কয়েক মাস প্রশিক্ষণের পরে আলীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণটা আগের চেয়ে ভাল হয়েছে। ইশ তাকে রক্ষণাত্মক খেলা শিখিয়েছে যেন আউট না হয়। ভাল খাবার খেয়ে আর ব্যায়াম করে আলীর পরিশ্রমের ক্ষমতা বেড়ে গেছে। বলের গতিবেগের উপর নির্ভর না ক'রে বলে আঘাত করার শক্তি অর্জন করেছে সে। পাঁচটা বল একবার রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে পারলে সে তার সহজাত গুণটা আরো শানিয়ে নিতে পারত। কৌশলটা হচ্ছে, তার সামর্থ্যটা এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যে, ফোকাসটা বাড়াতে পারবে সে। আবার ক্রিজেও টিকে থাকতে পারবে। এক ওভারে একটা বল ভাল খেলে সে। ইশ চায়, এবার সে এক ওভারে দুটো বল ভাল খেলুক।

"এবার চেঞ্জ হবে। পরশ ব্যাট করবে এখন। আর আলী ফিল্ডে," তিন ওভার শেষে ইশ চেঁচিয়ে বলল। আলী কোন বড় শট মারলো না। হতাশ হয়ে ব্যাটটা ক্রিজে ফেলে দিল সে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই যে, এটা দ্যাখ। নতুন বল," ইশ বলল।

আলী পাজামার ফিতা এঁটে নিচ্ছে। এমন সময় পরশ আলীর দিকে একটা ক্যাচ দিলে ধপ্ ক'রে শব্দ হয়ে বলটা মাটিতে পড়ে গেল।

"তুমি কি ঘুমাচ্ছ নাকি?" ইশ বলল। কিন্তু আলী ভ্রূক্ষেপ করল না। তিন বল পরে পরশ আলীকে আবার একটা ক্যাচ দিল।

"আলী, ক্যাচটা ধরো," আম্পায়ারের জায়গা থেকে ইশ চেঁচিয়ে বলল।

আলী এক হাত পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে। যখন দেখল ইশ তার দিকে তাকিয়ে আছে সাথে সাথে হাত বের ক'রে ফেলল সে। দু'পা এগুলেই সে বলটা ধরতে পারত। কিন্তু সে তা করল না। বলটা মাটিতে পড়ে গেল।

"অ্যাই!" ইশ জোরে আলীর কাঁধ ধরে নাড়া দিল। "স্বপ্ন দেখছো নাকি?"

"আমি তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাই।"

কাঁধে হাত বুলাতে বুলাতে ইশ বলল, "আগে প্র্যাকটিস শেষ করো।"

"এই যে, আলী, ব্যাট," আলীর কাছে এসে বলল পরশ।

"না, ও ফিল্ডিং করবে," ইশ বলল।

"ঠিক আছে, ইশ ভাইয়া। কিন্তু আমি জানি ও ব্যাট করতে চায়," বলে পরশ ব্যাটটা আলীকে দিয়ে দিল। "আর আমি আরো ক্যাচ প্র্যাকটিস করতে চাই। স্কুল ম্যাচের আগে ভাল ক'রে শিখতে হবে।"

আলী ব্যাটটা নিয়ে চোখ উপরে না তুলেই ক্রিজে চলে গেলে এই অবজ্ঞা দেখে ইশ মনে মনে অনুতাপ করতে লাগল। ছেলেটাকে কখনও পোশাক, কখনও ব্যাট উপহার দিয়ে হয়ত তাকে নষ্টই ক'রে ফেলেছে সে।

পরশের জোরাজুরিতে ইশ আবার আলীকে ব্যাট করতে দিল। "পরশ বল করবে, ব্যাট কর। বাম দিকে আস্তে ক'রে।"

বল এলে আলী জোরে আঘাত করলে বলটা তার তেজস্বিতার মতই ব্যাংকের বাইরে চলে গেলো।

"আমি যাব," আলী গর্বের সাথে তাকাল ইশের দিকে।

"তোমার ঐ বোকার মার্বেল টুর্নামেন্ট আমি পরোয়া করি না। মার্বেল খেলে কেউ কখনও বড় হয় নি," ইশ চেঁচিয়ে বলল কথাটা।

"তো ক্রিকেট খেলে আপনিও তো খুব একটা বড় হন নি," আলী বলল। উফ! বাচ্চাদের মুখে তিক্ত সত্য কথা।

ইশ জমে গেল। তার হাতে কাঁপছে। আলীর ব্যাটে যেমন ঠিকমত টাইমিং হয় সেভাবে ইশের ডান হাত আলীর গালে সজোরে চড় বসিয়ে দিলে আলী মাটিতে পড়ে গেলো।

চড়ের শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। মাটিতে বসে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো আলী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যা! তোর বালের মার্বেল খেল গিয়ে," বলে ইশ আরো একটা চড় মারতে গেলে আমি ইশের কনুই ধরার জন্য দৌড়ে চলে এলাম। আলী কান্নায় ফেটে পড়ছে। নিচু হয়ে আলীকে টেনে তুলে ওকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলাম। তার গণিতের টিউটর হিসেবে আমি অবশ্য এতটা কড়া নই। আমাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল সে।

"চলে যান," পা দিয়ে আমাকে লাথি মেরে কাঁদতে কাঁদতে বলল আলী। "আমি আপনাকে চাই না।"

"আলী, চুপ করো ভাই। এসো, আমরা উপরে যাই। আমরা মজার কিছু অঙ্ক করব," আমি বললাম। ওহ্, এইমাত্র যে বাচ্চাটাকে চড় মারা হয়েছে তাকে একথা বলা ঠিক হয় নি।

"আমি অঙ্ক করতে চাই না," আলী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

"হ্যা, ফিল্ডিং করতে চাইবে না, অঙ্ক করতে চাইবে না। অলস কোথাকার! সারাদিন শুধু মার্বেল খেলবে," ইশ থু থু ফেলে বলল।

মনে হল বার বছরের একটা ছেলের সাথে ইশের তর্ক করাটা বোকামি।

"সবাই বাড়ি চলে যাও। কালকে প্র্যাকটিস করব আমরা," বললাম আমি।

"এখন আমাদের..." ইশ বলল।

"ইশ, ব্যাঙ্কের ভেতরে যা," আমি বললাম।

"ওকে আমার ভাল লাগে না," বলল আলী। এখনও কাঁদছে সে।

"আলী, মুখ সামলে কথা বল। কোচের সাথে এভাবে কথা বলতে হয় না। এখন বাড়ি যাও," আমি বললাম।

সবাই চলে গেলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। হয়ত সবার বাবা হওয়ার জন্যেই ভগবান আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

AMARBOI.COM

*

"শালা, তোর সমস্যাটা কী? একটা বাচ্চা ছেলে," সবাই চলে যাওয়ার পরে ইশকে বললাম। ওকে শান্ত করার জন্য রান্না ঘরে গিয়ে লেমোনেড তৈরি করলাম আমি। ইশ আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

"ছোকড়া ভাবে তার জন্মগত একটা গুণ আছে," বলল ইশ।

"তা ভাবে," আমি বললাম, তারপর তার দিকে পানীয়টা এগিয়ে দিলাম। "আরেকটা এলপিজি সিলিন্ডারের অর্ডার দিতে পারিস। এটা তো প্রায় শেষ," বললাম তাকে। একটা কেরোসিন স্টোভও আমাদের আছে। কিন্তু ওটাতে রান্না করা খুব ঝামেলার ব্যাপার।

ক্যাশিয়ারের ওয়েটিং এরিয়ায় এসে সোফায় বসলাম আমরা।

ইশ চুপ থাকল। সে কিছু একটা চেপে রাখছে। বুঝলাম না কান্না চেপে রেখেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনা। কারণ ইশকে কখনও কাঁদতে দেখি নি আমি।

অর্ধেক গ্লাস খেয়ে সে বলল, "ওকে আমার মারা ঠিক হয় নি।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"কিন্তু কী বলল দেখেছিস?"

" 'আপনিও তো কখনও বড় কিছু হন নি,' আমি যদি কোচকে এ কথা বলতাম? চিন্তা ক'রে দেখেছিস?"

"বারো বছর বয়স মাত্র। অত সিরিয়াসলি নিস না।"

"সে পরোয়াই করে না। জাতীয় দলে খেলার সামর্থ আছে তার। কিন্তু সে শুধু ওই বালের মার্বেলই খেলতে চায়।"

"মার্বেলই ওর ভাল লাগে। ক্রিকেট এখন ভাল লাগে না।"

ইশ পানীয় শেষ ক'রে কিচেন সিংকে প্লাস্টিক গ্লাসটা ছুঁড়ে মারল। ব্যাংকের প্রধান দরজা আর গেট তালা মেরে হেঁটে দোকানে গেলাম আমরা।

"খুব বাজে," ইশ বলল। "বছরের পরে বছর খাটছি আমি। এই খেলার জন্য ভবিষ্যতের চিন্তাও বাদ দিয়েছি। কিছুই হল না। আর এই পিচ্চিটা এই মেধা নিয়েই জন্মেছে। তারপরেও পরোয়া করছে না।"

"কিছুই হল না মানে কী বলছিস? বছরের পরে বছর স্কুলে তো তুইই সেরা খেলোয়াড় ছিলি।"

"হ্যা, বেলরামপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলে। বিদ্যাকে আমাদের মহল্লার প্রীতি জিনতা বললে যে রকম হবে ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম। কার কী এসে যায়?"

"কী?" আমি বললাম, হাসি থামিয়ে রাখতে পারলাম না কোভাবেই।

"কিছু না, কাকা একবার ওকে তাই বলেছিল। আমি এটা বলে ওকে খেপাই," ইশ বলল, তার মেজাজ কিছুটা হালকা হয়ে এসেছে। দোকানের কাছাকাছি চলে আসলাম আমরা। মন্দিরের গম্বুজটা দেখা যাচ্ছে।

"ভগবান এরকম করে কেন, গোবিন্দ?" ইশ বলল।

"কী করে?"

"কিছু লোকরে এত মেধা দেয়। আর আমার মত লোকদের কিছুই নেই।"

"তুইও তো মেধাবী।"

"যথেষ্ট নয়, বিশষে করে আলীর মত না। আমি এই খেলাটা ভালবাসি। কিন্তু জন্মগত কোন গুণ আমার নেই। অনেক চেষ্টা করেছি–প্রতিদিন ভোর ৪টায় উঠতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেনিং, প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস। পড়াশুনা বাদ দিলাম। এখন সেই কথাই ভাবি। এমন কি ভবিষ্যতের কথাও ভাবি আর তারপর এই মাবেল খেলোয়ার এল, এই অস্বাভাবিক গুণটা ওর জন্মগতভাবেই আছে। আলীর মতন কখনও বল দেখে শট মারতে পারি নি। কেন গোবিন্দ?"

আমাদের বন্ধুদের বাবার ভূমিকা পালন ক'রে ওর প্রতিটি তুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ার চেষ্টা করতে হয় আমাকে। "জানি না, ভগবান মেধা দেয় যেন সাধারণ লোকেরা অসাধারণ হতে পারে। শুধু মেধার জোরেই গরীবেরা বড়লোক হতে পারে। নইলে দুনিয়ায় ধনীরা ধনীই থেকে যেত। আর গরীবেরা গরীব। এই অন্যায্য মেধার কারণেই একটা ভারসাম্য তৈরি হয়। দুনিয়াটা ঠিক থাকে," আমি বললাম। নিজে যা বললাম সেটা নিয়ে নিজেই একটু ভাবনায় পড়ে গেলাম।

"তা ওর কেয়ার না করার কী কারণ? মার্বেল? বিশ্বাস করতে পারিস, মার্বেলে ছেলেটার আগ্রহ বেশি!"

"ক্রিকেট থেকে ও কী পাবে তাতো জানে না। এখনই সে মহল্লার মার্বেল চ্যাম্পিয়ন। এই পরিশ্রমটাই ভাল লাগে তার। ক্রিকেটে একবার এরকম সাফল্য পেলে নিজের গুণটা নিজেই বুঝতে পারবে। এখন পর্যন্ত শুধু চারটা বল মেরে কেরামতি দেখানোতেই সে সন্তুষ্ট। তুই ওকে খেলোয়াড় বানিয়ে ছাড়বি, ইশ," আমি বললাম।

দোকানে পৌঁছলাম আমরা। অমি আমাদের আগেই পৌঁছে মেঝে ঝাড়ু দিয়ে রেখেছে। কোচিং এ আসে নি সে। কিন্তু সে তার মামাকে কথা দিয়ে রেখেছে সপ্তায় অন্তত দু'বার সকালের র‍্যালিতে যোগ দেবে। আজকে ওই দু'দিনের একদিন।

"প্র্যাকটিস ভাল হল?" চায়ের অর্ডার দিয়ে অমি আলস্যভরে জিজ্ঞেস করল।

ইশ ভেতরে গেলে আমি মুখে আঙুল দিয়ে অমিকে চুপ থাকতে বললাম।

দশ বছর বয়সী একটা ছেলে এল একুশটা কয়েন নিয়ে ক্রিকেট বল কিনবে বলে।

"চামড়ার বল পঁচিশ রুপি করে। তোমার কাছে তো মাত্র একুশ রুপি আছে," কয়েন গোনার কষ্টকর কাজটা শেষ ক'রে আমি বললাম।

"ব্যাংক ভাঙছি। আর নেই," ছেলেটা খুব সিরিয়াসলি কথাটা বলল।

"তাহলে পরে আসো," আমি বললে আমাকে বাধা দিল ইশ।

"এই নাও," বলে ইশ ছেলেটাকে বলটা দিয়ে দিলে বল হাতে নিয়েই দৌড় দিল ছেলেটা।

"শালার ইশ," আমি বললাম।

"শালার ব্যবসায়ী," ইশ পাল্টা বলল। তারপরে কোণায় বসে আলীর জন্য মুখ গোমড়া ক'রে বসে থাকল সে।

*

আলীর মন যোগানোর জন্য ইশকে এক বাক্স চকলেট, দু'ডজন মার্বেল আর একটা নতুন স্পোর্টস ক্যাপ উপঢৌকন দিতে হল। আলীও আমাদের মিস্ করছিল। ওর মা আমাদের বলেছে, সেদিন ও দু'ঘণ্টা ধরে কেঁদেছে। মার্বেল টুর্নামেন্টেও আর যায় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের দু'দিনেরও প্র্যাকটিসে আসে নি সে। ইশ তার অপরাধ বোধ মাত্রাতিরিক্তভাবেই প্রকাশ করল। আলীও ক্ষমা চাওয়ার একটা আপ্তবাক্য আগে থেকেই তৈরি ক'রে রেখেছিল–সম্ভবত তার মা তাকে শিখিয়ে দিয়েছে–ইশের পা ছুঁয়ে গুরুকে অপমান করার জন্য দুঃখিত বললে তাকে জড়িয়ে ধরে উপহারগুলো দিয়ে দিল ইশ। ওকে আবার মারার চাইতে নিজের হাত কেটে ফেলবে, এরকম কথা বলল ইশ। পুরোটাই একেবারে অতিনাটকীয় বলতে পারেন।

তবে আসল কথা হল আলী ফিরে এল। এবার সে আরো সিরিয়াস। আর ইশও তার সাথে কিছুটা নরম ব্যবহার করল। ক্রিকেট খেলায় আলীর উন্নতি দেখে অন্যসব ছাত্রেরা পরামর্শ দিল, তাকে যেন জেলা পর্যায়ে খেলানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

ইশ সেটা নাকচ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে। "না না। সিলেকশনে যারা থাকে ওরা ওকে নষ্ট ক'রে দেবে। যদি বাদ দিয়ে দেয় তাহলে ও সারা জীবনের জন্য হতাশ হয়ে যাবে। আর যদি নিয়ে নেয় তাহলে কয়েকটা বছর অকাজের ম্যাচ খেলাবে ওকে দিয়ে। সিলেকশনের জন্য ও যাবে, তবে শুধু বড় সিলেকশনের জন্য। মানে জাতীয় দলের।"

"সত্যি? তুই নিশ্চিত, ও জাতীয় দলে ঢুকতে পারবে?" প্র্যাকটিসের পরে স্টিলের গ্লাসে আমাদের লাচ্ছি দিতে দিতে অমি বলল।

"সে যে রকম খেলোয়াড় হবে, সে রকম খেলোয়াড় এখনও ইন্ডিয়া পায় নি," ইশ তার রায় জানিয়ে দিল। কথাটা কিছুটা পাগলাটে শোনাচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখেছি, আলী সেরা সেরা বোলারদেরও কুপোকাত ক'রে দেয় মাত্র কয়েক বলেই। আর মাত্র দু'বছর। তারপরই ইশের কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হবে।

"আলীর এই জন্মাগত গুণটা নিয়ে কথা বলিস না। কারো উপরে আমার বিশ্বাস নেই," মোচ থেকে লাচ্ছি মুছতে মুছতে বলল ইশ।

AMARBOI.COM

*

"অজুহাত দেখিয়ে তো আর পরীক্ষায় পাস করা যাবে না, বিদ্যা। এটা পড়লে কাজ দেবে। আর কিছুতে কাজ হবে না।" কেমিস্ট্রি বইটা খুললাম আবারও।

"চেষ্টা করেছি," সে বলল তার খোলা চুল পিছে ঠেল দিয়ে। স্নান করে নি সে। একটা ট্র্যাক প্যান্ট পরনে তার। মনে হয়, তের বছর বয়স থেকেই এটা পরে আসছে সে। আর একটা গোলাপী রঙের টি-শার্ট পরেছে। 'ফেয়ারি কুইন' বা এ ধরনের কিছু একটা লেখা আছে তাতে। একটা পূর্ণ বয়স্ক মহিলা 'ফেয়ারি কুইন' লেখা কোন কিছু পরে কিভাবে? আরে, কোন মানুষই বা 'ফেয়ারি কুইন' লেখা কোন কিছু পরে কিভাবে?

"আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করি। এতে কাজ দেবে," সে বলল। তার কুছ পরোয়া নেহি ভাব দেখে হাসব না রাগ করব জানি না। এইসব জামা কাপড়ে সুন্দর একটা কাপড়ের পুতুলের মত দেখাচ্ছে তাকে। না হলে বোধহয় আবার আমার মেজাজ চড়ে যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঈশ্বরের উপরে ছেড়ে দিও না, অর্গানিক কেমিস্ট্রিটা তোমাকেই পড়তে হবে। প্রার্থনায় কাজ হবে না," আমি বললাম।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চেয়ারটা সরিয়ে রাখল সে। একটা বোতল মেঝের উপরে পড়ে গেলে, "উহ্" বলে নিচু হল সে।

"কী?" সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। নারকেল তেলের একটা বোতল। ভাগ্য ভাল যে বোতলটার মুখ বন্ধ।

"কিছু না, ভেবেছিলাম চুলে তেল দেব," বলে নীল বোতলটা নীচ থেকে তুলে নিল।

তার মুখের দিকে তাকালাম, দরকারের চেয়েও সিকি সেকেন্ড বেশি তাকিয়ে থাকলাম। কোন নারীর দিকে তাকিয়ে থাকার এটাই সর্বোচ্চ সময়। এর বেশি তাকালে সেটা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা হবে। ওই সীমাটা অতিক্রম ক'রে ফেলেছি আমি। ইচ্ছে ক'রে টি-শার্টের গলার কাছটা একটু টেনে দিয়ে পেছনে হেলান দিয়ে বসে পড়ল সে। শুধু আমার জন্যই এভাবে টেনে দিল সে। কিন্তু আমি আদৌ ওখানে তাকাই নি। সে হয়তো ভেবেছে আমি তাকিয়েছি। খারাপ লাগছে আমার।

"নারকেল তেল," আমি বললাম, সম্ভবত এর চেয়ে সাধারণ তুচ্ছ আর কিছু বলার মত কোন কিছু নেই এখন। কিন্তু এতেই কথা বলার বিষয়টা পাল্টে গেল।

"হ্যা, আমার মাথার জন্য কিছুটা অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির দরকার আছে। হয়ত এতে কাজ দেবে।"

বেনজিন কিভাবে অক্সিডাইজড হয় তা দেখার জন্য বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলাম।

"আপনার জন্মদিন কবে?" সে জানতে চাইল।

"১৪ই মার্চ," জবাব দিলাম আমি। "পাই দিবসে।"

"কী দিবস?"

"পাই দিবস। জান তো, পাই-এর আসন্ন মান হচ্ছে ৩.১৪। ১৪ই মার্চ ও হচ্ছে একই তারিখ। আইনস্টাইনের জন্মদিনও এদিনে। দারুণ, তাই না?"

"পাই-এর জন্য দিবস? এরকম ভয়াবহ একটা জিনিস নিয়ে দিবস হল?"

"কী বললে? অঙ্ক প্রেমিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিন এটা। যদিও আমরা এটা প্রকাশ্যে পালন করি না। তুমি বলতে পার সাহিত্য ভালবাস, গান ভালবাস, কিন্তু অঙ্ক নিয়ে এরকম কথা বলতে পার না।"

"কেন নয়?"

"লোকজন তোমাকে গর্দভ বলবে।"

"সেটা তো আপনি নিজে," কথাটা বলেই ফিক ক'রে হেসে ফেলল সে।

নারকেল তেলের বোতলের মুকুটটা কাছে টেনে আনলো এবার।

"আমার চুলে তেল মাখাতে সহায্য করতে পারেন? আমি পেছন দিকে নাগাল পাই না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে গিয়ে আমার জিহ্বা পিছলে গেল। যেন ওই তেলে ভেজানো আমার জিহ্বা। "বিদ্যা, আমাদের এখন পড়াশোনা করা দরকার।"

"হ্যা হ্যা। প্রায় শেষ তো। আমার ঘাড়ের পিছন দিকে একটু বাকি আছে, প্লিজ।"

সে চেয়ারে ঘুরে বসল যাতে পিঠটা আমার দিকে থাকে।

এসব কী হচ্ছে, ভাবলাম আমি। তর্জনীটা তেলে ডুবিয়ে তার ঘাড়ের কাছে নিয়ে এলাম।

"না এখানে না," সে আবারও ফিক ক'রে হেসে ফেলল। "সুড়সুড়ি লাগছে তো। আরো উপরে। হ্যা, একদম গোড়ায়।"

একটা না, তিনটা আঙুল ডুবিয়ে আরো জোরে চাপতে বলল সে। আমাকে যা করতে বলল বিমূঢ় অবস্থায় আমি তাই করলাম–যে কিনা শহরের সেরা গণিত টিউটর।

"নতুন দোকানটার খবর কি?" সে জানতে চাইল।

"ভাল। জামানত আর তিন মাসের অগ্রিম ভাড়া আমি দিয়ে দিয়েছি," বললাম তাকে। "নগদ পঞ্চাশ হাজার রুপি। মলের সবচেয়ে ভাল জায়গাটা আমাদের।"

"এত অপেক্ষা করতে পারব না," সে বলল।

"আর দুটো মাস," বললাম আমি। "আচ্ছা, যথেষ্ট হয়েছে। এবার নিজে কর। আমি মুকুটটা ধরে রাখছি।"

সে ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে তেলে আঙুল ডুবিয়ে মাথায় মাখাল।

"হায়, আমি যদি ছেলে হতাম," জোরে জোরে তেল মাখাতে মাখাতে বলল সে।

"কেন, তাহলে কি চুলে তেল মাখা সহজ হত?" আমি বললাম, মুকুটটা হাতেই ধরে রেখেছি। যদিও আমার কব্জি ব্যথা করছে।

"নিজেদের সাধ-আহ্লাদ মেটানো আপনাদের জন্য খুব সহজ কাজ। আমাকে তো এরকম একটা দোকান খুলতে দেবে না," সে বলল।

কিছু বললাম না আমি।

"এবার বোধহয় আমার ব্রেন কাজ করবে," পেছনে চুল বাঁধতে বাঁধতে সে বলে টেবিলের মাঝখানে কেমিস্ট্রি বইটা রেখে দিল সে। "এটা পড়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই।"

"বিদ্যা, তোমার শিক্ষক হিসেবে আমার কাজ হচ্ছে..."

"হ্যা, আমার শিক্ষক হিসেবে আপনার কাজটা কি? আমার স্বপ্নগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করব সেটা শেখানো নাকি কিভাবে একটা নিষ্কর্মা লোক হবো সেটা শেখানো?"

আমি কিছু বললাম না। বাম পাটা কোলের উপরে তুলল সে। খেয়াল করলাম তার পায়জামা জুড়ে ছোট ছোট খেলনা ভালুকের ছবি।

"অবশ্য আমি তোমার শিক্ষক নই। আমি তোমার টিউটর। তোমার গণিতের টিউটর। যত দূর জানি, স্বপ্নের জন্য কোন টিউটর নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি কি আমার বন্ধু নন?"

"তা এক ধরনের বন্ধু তো বটেই।"

"ঠিক আছে, এক-ধরনের-বন্ধু, আমার কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? আমার সাধগুলো বাদ দিয়ে, হাইড্রোকার্বন মোলেকুল দিয়ে চারপাশ ভরিয়ে রাখা, সারাজীবনের জন্য?"

কিছু বললাম না আমি।

"কিছু বলেন। এই জিনিসগুলো যদি আমার ভাল নাও লাগে তারপরও ইন্ডিয়ার সব ভাল ছাত্র-ছাত্রিরা এগুলো করছে বলে আমাকেও নাক-মুখ গুঁজে করতে হবে?"

কিছুই বললাম না

"কী?" খোঁচা দিল সে আবার।

"সমস্যাটা হচ্ছে, তুমি ভাবছ আমি হচ্ছি একটা ক্ষ্যাপা যে সম্ভাব্যতার অঙ্ক করে আনন্দ পায়। তা হয়ত পাই, কিন্তু এটা তো আমার সব না, আমি টিউটর। এটাই আমার চাকরি। কিন্তু তোমার সাধ আহ্লাদ ভেঙে দিচ্ছি, এই বালের অভিযোগ করবে না।" একটু পর বুঝলাম *বাল* শব্দটা ব্যবহার করে ফেলেছি। "কথাটা বলার জন্য দুঃখিত।"

"গালাগালি করা, এটাও তো একটা সাধ-আহ্লাদ।"

হেসে তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

"তাহলে এটাই ব্যাপার," সে বলল। "আমার টিউটর বন্ধু, আমি আপনার কাছে ভর্তি হতে চাই। মুম্বাই যেতে চাই, তবে জাঁশ কাটার জন্য না। আমি পাবলিক রিলেসন্স পড়তে চাই।"

টেবিলে ঘুষি মারলাম আমি। "তাহলে তাই কারো। ছেলে হতে ইচ্ছা করে, খাঁচায় বন্দী হয়ে আছি–এই সব ফালতু কথা আমাকে শোনাবে না। ঠিক আছে, তুমি খাঁচায় ভেতরেই আছো। তোমার একটা সুন্দর বড় তেল মাখা ব্রেন আছে। পাখির ব্রেনের মত মটরশুঁটির সাইজের নয় সেটা। এটাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তির পথ দ্যাখ।"

"মেডিকেল কলেজও একটা পথ। কিন্তু আমার জন্য নয়," সে বলল।

"তাহলে খাঁচাটা ভেঙে ফেল," আমি বললাম।

"কিভাবে?"

"এই খাঁচাটা তৈরি হল কিভাবে? তোমার বাবা-মা করেছে, ঠিক? সব সময় কি তাদের কথাই শুনতে হবে?"

"অবশ্যই না। পাঁচ বছর বয়স থেকেই তাদের সাথে মিথ্যা বলি আমি।"

"সত্যি? ওয়াও," বলে আবার নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। "একদিকে সাধ-আহ্লাদ আরেক দিকে বাবা–মা। কঠিন ব্যাপার! কিন্তু কোন একটা বেছে নিতে হলে সাধ আহ্লাদকে বেছে নেওয়াই উচিত। সারাক্ষণ বাবা-মা'র কথা শুনলে মানুষ এগোতে পারত না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক বলেছেন। আমাদের বাবা-মা তারাও তো নিষ্পাপ নয়। কোন পরম আবেগের সময়েই তো আমাদের গর্ভে ধারণ করা হয়েছে, নাকি?"

তার নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকালাম। আৎকে উঠলাম তার কথাটা শুনে। এই মেয়েটা নিজেকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। হয়ত খাঁচা ভেঙে বের হওয়ার আইডিয়া তার জন্যে মঙ্গলজনক হবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ৯

২৬শে জানুয়ারি সব ইন্ডিয়ানের জন্য খুশির দিন। আপনার মাঝে দেশপ্রেম থাকুক আর নাই থাকুক, বছরের প্রথম মাসে এটা একটা নিশ্চিত ছুটির দিন। ভ্যালেন্টাইন দিবসে নতুন মলে যাব আমরা, মনে পড়ল। আমাদের মন্দিরের দোকানে এটাই হয়তো শেষ ছুটির দিন। জামানত ছাড়াও দোকানের ভেতরে সাজানোর জন্য আরো ষাট হাজার খরচ করেছি। মায়ের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নিয়েছি দশ হাজার। ইশের বাবা টাকা দিতে রাজি হন নি। আমি না করলেও অমি বাকি টাকাটা বিট্টু মামার কাছ থেকে ধার নিয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি। একশ দশ হাজার রুপি বিনিয়োগ করেছিলাম। আমার ব্যবসা এর মধ্যেই লাখে পৌঁছে গেছে। টার্ফ কার্পেট দেবো নাকি? খেলার দোকানের জন্য দারুণ হবে সেটা। সারা রাত ধরে স্বপ্ন দেখলাম অনেকগুলো দোকানের মালিক হবো আমি।

"নাড়া দেবে না মা, আমি ঘুমাচ্ছি এখন," চেঁচিয়ে বললাম। দুনিয়ায় লোকজন ব্যবসায়ীদের দুলর্ভ ছুটির দিনে একটু ঘুমাতে দিতে পারে না কেন?

মা আমাকে নাড়া দেন নি। আমি নিজে নিজেই নড়েছি। চোখ খুলে দেখি খাটটা সামনে পেছনে নড়ছে। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালাম। মেঝেতে পড়ে রয়েছে সেটা। কামরায় আসবাবপত্র, ফ্যান, জানালা সব সাংঘাতিক রকম কাঁপাকাঁপি করছে।

চোখ রগড়ালাম। কী এটা? দুঃস্বপ্ন দেখছি নাকি?

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেলাম। রাস্তায় লোকজন এদিক সেদিক ছুটোছুটি শুরু ক'রে দিয়েছে।

"গোবিন্দ!" অন্য কামরা থেকে মা চিৎকার ক'রে বললেন, "টেবিলের নিচে লুকিয়ে থাক। ভূমিকম্প হচ্ছে!"

"কী?" বলে তৎক্ষণাৎ জানালার পাশের টেবিলের তলায় মাথা নিচু ক'রে ঢুকে পড়লাম। বাইরের ধ্বংসলীলা দেখতে পাচ্ছি। উল্টো দিকের বিল্ডিংয়ের তিনটা টিভি অ্যান্টেনা নিচে পড়ে গেল। টেলিফোনের একটা খুঁটি ভেঙে মাটিতে পড়ে আছে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে চলল কম্পন। আমার জীবনের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক এবং দীর্ঘতম পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড। ভূমিকম্পের পর আশ্চর্যজনকভাবেই নীরব হয়ে গেল চারদিক।

"মা," আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

"গোবিন্দ, নড়িস না," চিৎকার ক'রে জবাব দিলেন তিনি।

"শেষ হয়ে গেছে," আরো দশ মিনিট যাওয়ার পরে বললাম। "তুমি ঠিক আছ তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরিয়ে শোবার ঘরে আসলাম। দেয়ালে যা কিছু ছিল–ক্যালেন্ডার ছবি, ল্যাম্প শেইড–সব মেঝেতে পড়ে আছে।

"গোবিন্দ," মা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। হ্যা, আমার কিছু হয় নি। আমার মায়েরও কিছু হয় নি।

"চল, বাইরে যাই," তিনি বললেন।

"কেন?"

"বিল্ডিংটা ধসে পড়তে পারে।"

"মনে হয় না," আমার মা পায়জামা ধরে বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় বললাম। রাস্তায় লোকজন ভয়ে এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছে।

"বোমা নাকি?" একটা লোক ফিস্‌ফিস্ ক'রে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল।

"ভূমিকম্প। টিভিতে বলেছে। ভুজ থেকে শুরু হয়েছে ওটা," রাস্তার এক লোক বলল।

"খুব তীব্র নাকি?" জানতে চাইল অন্য লোকটা।

"শত শত মাইল দূর থেকে আমরা কম্পন বুঝতে পারছি। তাহলে ভুজে কী হয়েছে চিন্তা করে দেখ," আরেকটা বুড়ো লোক বলল।

বাইরে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা। না, আমাদের বা আমাদের মহল্লার আর কোন বাড়ির ভিত নড়ে যায় নি। এর মধ্যে গুজব আর গপ্পো দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ বলল, আরো ভূমিকম্প হবে। কেউ বলল ইন্ডিয়া পরমাণুর বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে। আহমেদাবাদের কিছু এলাকায় সহায় সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় এটা-সেটা নানা গল্প ঘুরতে লাগল।

দু'ঘণ্টা পরে বাড়িতে ঢুকে টিভিটা ছাড়লাম। সব কয়টা চ্যানেলে ভূমিকম্পের খবর প্রচার করছে। কম্পনের উপকেন্দ্র ভুজে অবস্থিত। যদিও এর জন্য গুজরাটের অনেক এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

"রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে, আহমেদাবাদের বেশির ভাগ এলাকা নিরাপদ থাকলেও অনেক নতুন এবং নির্মীয়মান ভবন সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে..." রিপোর্টার বললেন। শিরদাড়া শিরশির ক'রে উঠল আমার।

"না, না, না..." অস্ফুটস্বরে স্বগতোক্তি করলাম আমি।

"কী?" আমার মা বললেন। আমার জন্য চা আর টোস্ট নিয়ে এসেছেন।

"বাইরে যাব।"

"কোথায়?"

"নবরংপুরে...এক্ষুণি," বলেই চপ্পল পায়ে দিলাম।

"তুই কি পাগল হয়েছিস?" তিনি বললেন।

"আমার দোকান, মা! আমার দোকান," বলতে বলতে ছুটে বাড়ির বাইরে চলে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরো শহরে কিছু চলছে না। কোন অটো বা বাস নেই। সাত কিলোমিটার পথটুকু দৌড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। নতুন দোকানটার কিছু হল কিনা দেখতে হবে। হ্যা, ওটা ঠিক থাকলেই আমার আর কিছু লাগবে না।

ওখানে পৌছাতে এক ঘন্টা লেগে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে ধ্বংসলীলা দেখলাম। স্যাটেলাইটের মত নতুন শহর এলাকায় অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। প্রায় সব বিল্ডিংয়ের জানালা ভেঙে গেছে। যে সব বিল্ডিং তৈরি হচ্ছিল, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সেসব। নবরংপুরে ঢুকতেই দেখলাম জাঁকজমকপূর্ণ দোকানগুলোর সাইনবোর্ড রাস্তায় পড়ে আছে। ভাবলাম আমার দোকানের নতুন আর অত্যাধুনিক বিল্ডিংয়ে ভূমিকম্পনিরোধী ব্যবস্থা আছে। শেষ একশ মিটার দৌড়াতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলাম আমি। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল।

বিল্ডিংটা কি ফেলে এসেছি নাকি? আমার লেনে ঢুকে মনে মনে বললাম। রাস্তায় হাঙ্গামা আর ভাঙা জিনিসপত্র দেখে ঠিকানা খুঁজে বের করা কঠিন।

নিঃশ্বাস নিতে নিতে আবার পেছনের দিকে চলে এলাম।

"বিল্ডিংটা কোথায়?" আমার লেনে ঘুর ঘুর করতে করতে মনে মনে বললাম।

শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম। ছয় তলা যে বিল্ডিংটা একদিন আগেও অক্ষত ছিল এখন সেটা কংক্রিটের স্তূপে পরিণত হয়েছে। মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। খুব তেষ্টা পেল আমার। পানি খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু শুধু খোয়া খোয়া আর খোয়া। ইট পাথরের খোয়া। পেট কঁকিয়ে উঠল। বাম হাতে পেট চেপে ধরে একটা ভাঙা বেঞ্চের উপরে বসে পড়লাম যেন জ্ঞান না হারাই।

একটা শ্রমিককে পুলিশ টেনে বের করছে। সারা শরীর থেঁতলে গেছে। সিমেন্টের দলা পড়ে ভেঙে গেছে তার দু'পা। রক্ত দেখে বমি এসে গেল আমার। ভিড়ের মধ্যে কেউ আমাকে খেয়াল করছে না। এক লাখ দশ হাজার–এই অঙ্কটাই কেবল মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল।

বাবা যেদিন আমাদের ত্যাগ ক'রে চলে যান সেই সব অসংলগ্ন ঘটনাগুলো মাথার ভেতরে জেগে উঠতে লাগল। বহু বছর ধরে এই ছবিগুলো মাথায় আসে নি। বাইরে চলে যাওয়ার মুহূর্তে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার সময় তার চেহারাটা। পরের কয়েক ঘন্টা ধরে আমার মায়ের নীরব কান্না। সেই কান্না পরের কয়েক বছরেও থামে নি। অতীতের ওই স্মৃতিটা আবার ফিরে এল কেন জানি না। মনে হয় ব্রেনে একটা আলাদা বাক্স আছে। বাজে স্মৃতিগুলো তার ভেতরেই রেখে দেওয়া হয়। বন্ধই থাকে বাক্সটা। কিন্তু যতবার নতুন কিছু ঢোকানোর দরকার হয়, বাক্সটা খুলে যায়। ভেতরে কী আছে তখন দেখা যায়। যত রাগ পড়ল গিয়ে আমার বাবার উপরে। একদম ভুল ব্যাপারটা। আসলে তো ভূমিকম্পের জন্য রাগ হওয়ার কথা কিংবা নিজের উপরেই রাগ হওয়ার কথা–এতগুলো টাকা হারালাম ব'লে। জীবনের প্রথম বড় ভুলটা করার দরুণ রাগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংঘাতিকভাবে সারা শরীর কাঁপছে।

"চিন্তা করবে না। ভগবান আমাদের রক্ষা করবে না," কেউ একজন আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল।

"ও তাই, এই ভূমিকম্পটা তাহলে পাঠিয়েছে কে?" বলে অচেনা লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। সহানুভূতির দরকার নেই। আমার দরকার দোকান।

দু'বছর ধরে খরচ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে জমানো টাকা। বিশ বছরের স্বপ্ন বিশ সেকেন্ডে শেষ হয়ে গেল! 'নবরংপুর মল'-এর নিয়ন বিজ্ঞাপনটা এক সময় ছয়তলা বিল্ডিংয়ের মাথায় লাগানো ছিল। এখন সেটা মাটিতে পড়ে আছে। কী জানি, ভগবান হয়ত কিছু বলতে হলে এভাবেই বলে যে, আমাদের এই রকম মলের দরকার নেই। ছোট শহর হয়ে থাকাটাই আমাদের নিয়তি। বড় শহরের মত হওয়ার চেষ্টা করাটাও আমাদের জন্য অনুচিত। ভগবানের কথা কেন ভেবেছিলাম জানি না। আমি তো অজ্ঞেয়বাদী। কিন্তু ভূমিকম্পের জন্য আর কাকেই বা দোষ দেয়া যায়?

অবশ্য নবরংপুর মলের নির্মাতাকেও দোষ দিতে পারতাম। কারণ পুরনো শহরের মহল্লাগুলোতে শত বছরের পুরনো বিল্ডিংগুলো ঠিকই খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। অমির দুশ' বছরের মন্দিরটারও কিছুই হয় নি। তাহলে এই বালের শপিংমলটা কেন ধসে পড়ল? কী দিয়ে বানিয়েছে এটা? বালি?

কোন একজনকে দোষারোপ করার দরকার ছিল আমার। কাউকে, কোন কিছুকে আঘাত করারও দরকার ছিল। একটা ইট তুলে ভাঙা একটা জানালার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। বাকি কাঁচটুকুও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

"আরে করছোটা কি? এত ধ্বংস দেখে সাধ মেটে নি?" আমার পাশ থেকে কেউ একজন বলল।

তার বা কারোর মুখই আমি চিনি না। স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ হারের হৃদস্পন্দন হচ্ছে আমার। মন বলছে, যে ব্যাটা তৈরি করেছে তার নামে মামলা ক'রে দিতে পারি। কিন্তু মস্তিষ্ক বলছে, ঐ ব্যাটা পালিয়েছে। কেউ কোন টাকা ফেরত পাবে না।

"গোবিন্দ, গোবিন্দ," ইশ বলল। আমার কানের কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠল সে। অবশেষে ওকে খেয়াল করলাম।

"এখানে কী করছিস? বাইরে থাকা বিপজ্জনক। বাড়ি চল," বলল ইশ।

এই চারঘণ্টা ধরে ইট খোয়ার দিকে যেভাবে তাকিয়ে ছিলাম সেভাবেই তাকিয়ে আছি।

"গোবিন্দ!" ইশ বলল, "আমাদের কিছু করার নেই। চল যাই।"

"আমরা শেষ হয়ে গেছি, ইশ," আমি বললাম। দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম চোখটা ভিজে এসেছে মনে হল।

"ঠিক আছে। এখন যেতে হবে," ইশ বলল।

"আমাদের সবকিছু শেষ। নতুন দোকান খোলার আগেই আমাদের ব্যবসা শেষ হয়ে গেছে..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি। বাবা আমাদের ছেড়ে যাওয়ার দিন একবারও কাঁদি নি। দিওয়ালিতে একবার আমার হাত পুড়ে যায়। ঘুম পাড়ানোর জন্য ডাঃ বর্মা আমাকে ইনজেকশন দিয়েছিলেন। তখনও আমি কাঁদি নি। ইন্ডিয়া ম্যাচে হারলেও কোন দিন কাঁদি নি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকতে পারি নি। তখনও কাঁদি নি। ব্যবসার প্রথম তিন মাসে টাকা তেমন হয় নি। সে সময়েও আমি কাঁদি নি। কিন্তু ওইদিন যখন ভগবান অকারণে আমার শহরটাকে থাপ্পড় মেরে দিলো, আমি কাঁদলাম আর কাঁদলাম। ইশ আমাকে জড়িয়ে ধরে ওর শার্ট দিয়ে চোখ মুছাল।

"গোবি, চল বাড়ি যাই," ইশ বলল। আগে কখনও আমার নাম ছোট ক'রে ডাকে নি সে। আমাকে এই অবস্থায়ও আগে কখনও দেখে নি। তাদের সিইও এবং অভিভাবক ভেঙে পড়েছে এখন।

"আমরা আসলে অভিশপ্ত। জমার পরে জমা, আবার সেই জমানো। ঋণও নিয়েছি আমরা। তারপর এই হাল হল? ইশ, বিট্টু মামার ঐ আত্মতৃপ্ত চেহারা দেখা আমার পক্ষে আর সম্ভব না। আমি রাস্তার পাশে কাজ করব," বললাম আমি। ইশ আমাকে টানতে টানতে একটা অটোর কাছে নিয়ে গেল।

লোকে নিশ্চয় ভেবেছ আমার কোন সন্তান মারা গেছে। কোন ব্যবসী ব্যবসা হারালে সেটা তো সন্তান হারানোর মতই ব্যাপার। ব্যবসায় ঝুঁকি নিয়ে লোকসান হলে সেটা একরকম হয়। কিন্তু যেটা হয়েছে সেটা একেবারে অনুচিত। কাউকে বোঝা দরকার, এটা একদম অনুচিত একটা কাজ হয়েছে।

AMARBOI.COM

আমাকে শান্ত করার জন্য ইশ একটা ফ্রুটি কিনল। বিশেষ কারণটা হচ্ছে, দু'দিন যাবত আমি আর কিছু খাই নি। আমার মনে হয় বাকি আহমেদাবাদীরাও খায় নি।

পরে জানতে পারলাম ত্রিশ হাজারের বেশি লোক মারা গেছে। মানে একটা স্টেডিয়াম ভর্তি সব মানুষ মারা গেছে। ভুজে শতকরা নব্বই ভাগ বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়েছে। স্কুল, হাসপাতাল সব মিশে গিয়েছে মাটির সাথে। গুজরাটে মোটের উপরে এক মিলিয়ন দালানকোঠার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই মিলিয়নের মধ্যে আমার হবু দোকানটাও আছে। যত বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, আমরা দোকানটা সেই তুলনায় তুচ্ছ। কিন্তু সংকীর্ণ স্বার্থপর দৃষ্টিতে দেখলে আমার ভোগান্তি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। নতুন শহরের চাইতে পুরাতন শহর অনেক ভাল। যাহোক নতুন মল মালিকদের চাইতে আমাদের পূর্বপুরুষদের সিমেন্টের ওপর আস্থা বেশি ছিল।

টিভি চ্যানেলে বলল, গুজরাটের তুলনায় আহমেদাবাদের ভাগ্য নাকি ভাল। নতুন শহরের মাত্র পঞ্চাশটা বহুতল ভবন ধ্বংস হয়েছে। আরো বলল, অন্য জায়গায় যেখানে দশ হাজার মত লোক মারা গেছে, আহমেদাবাদে সেখানে মরেছে মাত্র কয়েক শ'। শত শত লোক মারা গেলে সেটাকে 'মাত্র' বললে মজার শোনায় ব্যাপারটা। এই লোকগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেকেরই নিজেদের পরিবার-পরিজন, আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল। পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডে সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তিরিশ হাজারের সাথে তুলনায় অঙ্কের হিসেবটা এরকমই। কয়েক শ' তো একটা সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

*

এক সপ্তাহ ধরে বাড়ি ছেড়ে বের হলাম না। প্রথম তিনদিন ধরে প্রচণ্ড জ্বর। পরের চারদিন শরীর পাথরের মত ঠাণ্ডা।

"জ্বর চলে গেছে," ডাঃ বর্মা আমার নাড়ি দেখে বললেন।

ছাদের দিকে তাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আছি আমি।

"দোকানে যাও নি?"

বিছানায় শুয়েই নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়লাম।

"তোমার কাছ থেকে এটা আশা করি নি। নবল ধাড়িদের কথা তো শুনেছ তুমি," ডাঃ বর্মা বললেন।

চুপ থাকলাম আমি।

"কথা বলতে পার। আমি তোমার মুখে থার্মোমিটার দেই নি।"

"না, শুনি নি। কারা তারা?"

"নবলধাড়িরা গুজরাটের বনেদি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। ওদের প্রত্যেকেই ব্যবসা করে। ওদের কথা হল সত্যিকার নবলধাড়ি ব্যবসায়ী সে, নয়বার মাটিতে মিশে যাওয়ার পরেও যে আবার উঠে দাঁড়াতে পারে।

"আমি ঋণের মধ্যে আছি, ডাক্তার। এ পর্যন্ত ব্যবসায় যা আয় করেছি একধাক্কায় তারচেয়েও বেশি টাকার ক্ষতি হয়েছে।"

"এই পৃথিবীতে এমন কোন ব্যবসায়ী নেই যে, কখনও লোকসানের মুখোমুখি হয় নি। সাইকেল চালানো শিখতে গিয়ে পড়ে যায় নি এমন কেউ নেই। আঘাতবিহীন প্রেম কারো হয় না। এগুলো খেলারই অংশ," ডাঃ বর্মা কাঁধ ঝাঁকালেন।

"ভয় পেয়ে গেছি আমি," দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে বললাম।

"মধ্যবিত্তের বাবা-মা'র মত কথা বলবে না। টাকা হারানোর খুব ভয় ওদের। ওরা চায় তাদের সন্তানরা ভাল বেতনের জন্য সারা জীবনে অন্যের কাজ ক'রে যাক।"

"আমি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি।"

"কিন্তু বয়স তো তোমার পক্ষে। যুবক মানুষ। এসব কিছু আবার আয় করতে পারবে। কোন বাচ্চা-কাচ্চা নেই যে খাওয়াতে হবে, কোন সংসারও চালাতে হয় না। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, কম টাকাই দেখেছ তুমি, এটা ছাড়াও তুমি বেঁচে থাকতে পারবে।"

"কোন কিছু করার ইচ্ছে আর খুঁজে পাচ্ছি না। এই ভূমিকম্পটা–এটা কেন হল? জানেন, আমাদের স্কুলটা এখন একটা উদ্বাস্তু শিবির?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জানি, কিন্তু ঐ উদ্বাস্তুরা এখন কী করছে? বিছানায় শুয়ে আছে, নাকি ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে?"

কথাটা আমলে নিলাম না। চারদিকে সবাই শুধু আমাকে উপদেশ দিচ্ছে, আসলে সুদপদেশই দিচ্ছে। কিন্তু সেসব মন দিয়ে শোনার মত মেজাজ আমার নেই। কোন কিছু করার মত মেজাজ নেই আমার। দোকানটা? আরো এক সপ্তাহ বন্ধ থাকবে ওটা। ভূমিকম্পের পরে খেলার জিনিস কিনবে কে?

"আশা করি কালকে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে," ডা: বর্মা বললেন। তারপর চলে গেলেন। ঘড়িতে দেখলাম বিকেল তিনটা। বিকেল চারটা পর্যন্ত ঘড়িটার দিকেই তাকিয়ে থাকলাম এক দৃষ্টে।

"ভেতরে আসব, গোবিন্দ স্যার?" আমার বাড়িতে বিদ্যার ধৃষ্ট কণ্ঠ এত অদ্ভুত শোনাল যে, বিছানার উপরে লাফিয়ে উঠলাম। আর স্যার বলারই বা কী আছে?

তার হাতে এম.এল খান্নার মোটা বই আর একটা নোট বুক।

"এখানে কী করতে এসেছ তুমি?" আমার পায়জামা আর শার্টের নিচের অর্ন্তবাস ঢাকার জন্য কাঁথা টেনে দিতে দিতে বললাম।

মেরুন আর কমলা রঙের সালোয়ার কামিজ পরেছে সে। দারুণ দেখাচ্ছে তাকে। সাথে কাঁচ বসানো দোপাট্টা।

"কিছু অঙ্ক নিয়ে ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম। আপনি ভাল নেই। তাই ভাবলাম এখানে এসেই আপনাকে জিজ্ঞেস করি," আমার খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল সে।

মা ঘরে দুই কাপ চা দিয়ে যাবার সময় একটা শার্ট দেওয়ার জন্য ইশারা করলাম তাকে।

"শার্ট চাচ্ছেন?" আমার ইশারা করাটাকে ভণ্ডুল ক'রে দিয়ে সে বলল।

"কোন অঙ্ক?" মা চলে যাওয়ার পরে কাঠখোট্টাভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

"মার কাছে অঙ্কের কথা বলেছি। আসলে আমি আপনাকে এটা দিতে চাচ্ছিলাম," এম.এল খান্নার বিশালায়তনের বইটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

এটা কী জন্যে? শুয়ে শুয়ে অঙ্ক ক'রে দেওয়ার জন্য?

মা একটা শার্ট দিয়ে চলে গেলে আমি এক হাতে শার্ট আর এক হাতে এম.এল খান্নার বইটা নিলাম। বিনয় বনাম কৌতুহল। শার্টটা পাশে সরিয়ে রেখে বইটা-ই খুললাম আমি। হাতে তৈরি গোলাপী একটা শুভেচ্ছা কার্ড নিচে চোখে পড়ল।

কার্ডে একটা হাতে আঁকা কার্টুন আছে : একটা ছেলে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। তার পাশেই সে গোবিন্দ নামটা লিখে রেখেছে, পাছে আমি বুঝতে না পারি সেজন্যে। তার ভেতরে লেখা : "শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠুন।" সম্ভবপর সবচেয়ে শিশুসুলভ মজার হরফে কথাটা লেখা হয়েছে। তার নিচে একটা বাণী :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার অঙ্কের টিউটর/পথপ্রদর্শক/এক-ধরনের-বন্ধুকে বলছি, আপনার ক্ষতিটা পুরোপুরি বুঝতে পারছি না, তবে চেষ্টা করছি। কখনও কখনও জীবনে কঠিন মুহূর্ত আসে আর আপনি প্রশ্ন করেন, কেন। কোন জবাব হয়ত নেই, কিন্তু জানবেন, এই ব্যাথা একদিন প্রশমিত হবেই।
মনেপ্রাণে চাই আপনি ভাল হয়ে উঠুন।

আপনার সবচেয়ে খারাপ ছাত্রি, বিদ্যা।

"খুব একটা ভাল হয় নি," আস্তে ক'রে বলল সে।

"ভাল লেগেছে। 'এক-ধরণের-বন্ধু' কথাটা বলার জন্যে দুঃখিত। আমি শুধু..." আমি বললাম।

"ঠিক আছে। এই নামে ডাকাটা আমার ভাল লাগে। এতে ক'রে বোঝা যায়, পড়াশোনা দ্রুত চলছে। ঠিক আছে?"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

"কেমন আছেন আপনি?"

দেওয়ালের দিকে পাশ ফেরার ইচ্ছে হল, কিন্তু সেটা চেপে রাখলাম। "জীবন চলে যায়। যেতে হয়। হয়ত এয়ারকন্ডিশন মল আমার জন্য নয়।"

"অবশ্যই আপনার জন্য। দোষ তো আপনার না। নিশ্চিত একদিন আপনি ওখানে যাবেন। ভেবে দ্যাখেন। ওই সময়ে যে ওখানে ছিলেন না, সেটা কি আপনার সৌভাগ্য না? মল ওই সময়ে খোলা থাকলে কী পরিমাণ প্রাণহানি হতো কল্পনা করতে পারেন?"

সে একটা যুক্তি দেখিয়েছে। আমাকে এই ব্যাপারটা কাটিয়ে উঠতে হবে। বিট্টু মামার সেই আত্মতৃপ্ত মুখের চোহারাটা আবার দেখতে হবে আমাকে।

এম.এস খান্নার বইটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বালিশের নিচে কার্ডটা রেখে দিলাম।

"ইশ বলল আপনি দোকানে যান নি।"

"দোকান খোলা?" আমি বললাম। প্রতি সন্ধ্যায় ইশ আর অমির সাথে দেখা হয়। কিন্তু ওরা এ কথা বলে নি আমায়।

"হ্যা, জানেন, ভাইয়া বাড়িতে হিসেবে নিকেশ নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ শুরু ক'রে দিয়েছে। তাকেও টিউশনি করাতে পারেন," সে ফিক ক'রে হেসে ফেলল। "এখন যাই। আমার ক্লাস নিয়ে তাড়াহুড়োর কিছু নেই।"

"পরের বুধবারে যাব," চেঁচিয়ে বললাম আমি।

"সুন্দর মেয়ে," আমার মা সতর্কতার সাথে বললেন। "তুই ওকে পছন্দ করিস?"

"না। ছাত্রি হিসেবে ভয়াবহ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতে সেদ্ধ করা সবজির অরুচিকর খাবার খেলাম। তারপর ইশ আর অমি এসে পড়ল।

"দোকান কেমন চালাচ্ছিস?" আমার তেজোদীপ্ত গলা শুনে চমকে উঠল ওরা।

"তোর গলা শুনে তো ভালই মনে হচ্ছে," ইশ বলল

"হিসেব রাখার কাজটা করছে কে?" বলে উঠে বসলাম।

অমি ইশের দিকে ইঙ্গিত করল।

"আর? চলছে কী রকম? দু'একজন খদ্দের?"

"পুরো সপ্তায় কারোর জন্য ছাড় দেই নি," বলে ইশ খাটের উপরে আমার পাশে বসে পড়ল। আরেকটু আরাম করার জন্য আমার বালিশটা টেনে নিতে উদ্যত হল সে।

"রাখ," কথাটা বলে কনুই দিয়ে বালিশটা চেপে রাখলাম।

"এটা কী?" ইশ বলল। বালিশের নিচে গোলাপী কাগজের ইঞ্চি খানেক চোখে পড়েছে তার। দেখে হেসে ফেলল।

"কিছু না। এ নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না," আমি বললাম। অবশ্য তারই বোন। তাকেই তো মাথা ঘামাতে হবে।

"কার্ড?" অমি বলল।

"হ্যা, আমার কাজিনের কাছ থেকে পেয়েছি," বললাম আমি।

"তাই নাকি?" বালিশটা আমার হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য সুড়সুড়ি দিতে কাছে এল ইশ।

"থাম তো," বললাম আমি। মেজাজ হালকা আছে দেখাতে চাইলাম। শক্ত ক'রে চেপে রাখলাম বালিশটা। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল আমার।

"পণ্ডিতের মেয়েটা না?" অমি চাপা হাসি দিল।

"যাই হোক," আমি বললাম। মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত বালিশের উপরে বসে পড়লাম।

"ব্যবসা আর মজা এক সাথে চলছে," বলে ইশ হাসল। ভাওতা দেওয়ার জন্য আমিও হাসতে লাগলাম।

"আচ্ছা, এবার কাজের কথায় আসা যাক," বলল ইশ।

"ঋণ নেয়াটা...আমার বড় একটা ভুল হয়ে গেছে," দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে কথাগুলো বললাম।

"মামা বললেন আমরা মন্দিরের দোকানটা আবারও চালাতে পারি," অমি বলল।

"কোন শর্ত দেয় নি?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"সেরকম কিছু না," বলল অমি।

"তার মানে?"

"তার ক্যাম্পেনের কাজে একটু সাহায্য করতে হবে," বলল ইশ। "চিন্তার কিছু নেই, তোর কিছু করা লাগবে না। অমি আর আমি সাহায্য করব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"প্রথমে তার ঋণটা শোধ ক'রে দিতে হবে। দিতেই হবে," আমি জোর দিয়ে বললাম।

"সেটা চুকিয়ে দেয়া যাবে," ইশ আমার চোখের দিকে তাকাল। সাহসী কথা, কিন্তু এই প্রথমবার বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলল কথাটা।

"টাকাগুলো আমি বিনিয়োগ করেছিলাম বলে দুঃখিত..." মনে হল এজন্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত কিন্তু অমি আমাকে বাধা দিল।

"ব্যবসার শরীক হিসেবে সবাই এক সাথেই কাজটা করেছি। আমাদের মধ্যে তুই-ই সবচেয়ে বেশি স্মার্ট।"

তার শেষ বাক্যটা সঠিক কিনা আমি নিশ্চিত নই। ব্যবসায়ী হিসেবে আমি ভয়াবহ দুর্যোগের মত। "কাল দেখা হবে," বললাম আমি।

ওরা চলে যাওয়ার পরে কার্ডটা বের ক'রে ভাঁজগুলো ঠিক করলাম। ঘুমানোর আগে কার্ডটা পড়লাম আটবার।

আমি কাজে না থাকার কারণে আমার বন্ধুদের কিছু গুণ বিকাশের সুযোগ হয়েছে। হিসেবে কিছু ভুল ছাড়া ভালভাবেই অ্যাকাউন্টসটা ম্যানেজ করেছে তারা। প্রতিদিনের বিক্রিগুলো ছকে লিখেছে, ডান পাশে দামও লিখে রেখেছে। এসব জিনিসে কোন ছাড় দেয় নি তারা। দোকানটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে। জিনিসপাতি সহজেই খুঁজে বের করা যায়। হয়ত একদিন আমি ভাল ব্যবসা করে সব পূরণ করে দেব। না, আর স্বপ্ন দেখা যাবে না। নিজেকে বাগে আনতে চেষ্টা করলাম। ইন্ডিয়া স্বপ্ন দেখার জায়গা নয়। শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাপারই খেয়াল করলাম। বিশেষ ক'রে একবার ব্যর্থ হওয়ার পরে হিন্দু দর্শনে আরো বেশি কিছুর আকাঙ্ক্ষা করার চাইতে যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন সাধু সন্তদের উদ্ভাবিত দারুণ কোন দর্শন এটা নয়। কিন্তু যে দেশে নিয়মিত সব আশা আকাঙ্খা ধ্বংস হয় সেখানে টিকের থাকার জন্য ভাল একটা মন্ত্র। মন্দিরের দোকানটাই আমার জন্য মোক্ষম আর এর থেকে সামান্য কিছু আয় করাটাই হচ্ছে কর্ম। এর বেশি কিছু আশা করা যাবে না। নিঃশ্বাস ফেললাম। একটু ভাল লাগছে। ক্যাশ ড্রয়ারটা খুললাম আমি।

"দুই সপ্তাহের আয় খুব কমই হয়েছে। তবে ভূমিকম্পটার কথাও মনে রাখতে হবে। তরপর আবার ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া সিরিজটা হল," ইশ তার কোণার জায়গা থেকে বলল।

"খেলাধূলা করার জন্যে লোকজনের কাছে আর কোন কারণও নেই," অমি বলল।

"তা ঠিক। কিন্তু সিরিজের কী খবর?" আমি বললাম। ক্রিকেট শিডিউলটা আমার জানা ছিল না।

"প্রথম টেস্টে ইন্ডিয়া হেরে গেছে। আরো দুটা হবে। পরেরটা কলকাতায়," ইশ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ধুর, ওয়ান ডে'র কথা জানতে চাচ্ছি?"

"পাঁচটা ওয়ান ডে হবে। এখনও শুরু হয় নি ওগুলো," অমি বলল। "আমি বেশি কিছু আশা করি না। এইসব অস্ট্রেলিয়ানরা অন্য ধাতুতে তৈরি।"

"ওরা কিভাবে পারে–আমার সেটাই জানতে ইচ্ছে করে," বলল ইশ।

মামার আগমনের কারণে আমাদের কথাবার্তা বন্ধ হল। কাউন্টারে একটা বাদামী ব্যাগ রাখতে রাখতে তিনি বললেন, "গরম শমোচা, সাবধানে।"

আগের অবস্থায় থাকলে আমি ভ্রুকুটি করতাম। ভূমিকম্পের পর নতুন গোবিন্দের চোখে মামাকে আর বৈরী মনে হচ্ছে না, রোদেলা উঠোনে বসে বসে চা আর শমোচা খাচ্ছি আমরা। দারুণ উপাদেয়। আমার মনে হয় শমোচা মানুষের জানা সবচেয়ে ভাল জল-খাবার।

"যা হয়ে গেছে সব ভুলে যাও," মামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন। "এ রকম ধ্বংসযজ্ঞ আমি জীবনেও দেখি নি।"

"কেমন ঘুরলেন মামা?" অমি বলল। মামা ভুজ থেকে মাত্র ফিরে এসেছেন।

"সব জায়গার অবস্থাই খারাপ, সারা গুজরাট ধরে ক্যাম্প করা দরকার। কিন্তু পারেখজিই বা কতটুকু করতে পারবেন?"

মামা সারা রাত জেগে বেলরামপুর স্কুলে অস্থায়ী ত্রাণ শিবির খুলে বসলেন। পারেখজি ট্রাকের পরে ট্রাক বিভিন্ন খাবার, শস্য, কম্বল এবং অন্যান্য জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত লোকজন নড়াচড়া শুরু করেছে। প্রাণ ফিরে আসছে সব কিছুতে।

"ক্যাম্প বন্ধ ক'রে দেব তিন সপ্তাহ পর," মামা অমিকে বললেন, "তারপর আমার আসল কাজের জায়গা অযোধ্যায় ফিরে যেতে পারব।"

ক্যাম্পের কারণে এলাকায় মামার অনেক ভক্ত জুটে গেছে। আশ্রয় যে কেউই চাইতে পারে। কিন্তু সাহায্যের জন্য মুসলমান পরিবার খুব কমই যাচ্ছে। এমন কি গেলেও ক্যাম্পের লোকজন তাঁদের রেশন দিলেও একথা বলে দিত ভুল করে না যে, ক্যাম্পের প্রত্যেকেই হিন্দু। এইটুকু বৈষম্য রয়ে গেছে। তারপরও নতুন ক'রে জন্ম হওয়া আমার কাছে কাজটা মহৎ বলেই মনে হচ্ছে।

"মামা, আপনার ঋণ," তার দিকে ফিরে বললাম, কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না।

"আমার ছেলে অযোধ্যায় আমার সাথে যাবে। তোমরাও চলে এসো," তিনি বললেন। আমাদের চেহারায় অনিচ্ছুক ভাব দেখে বললেন, "মানে ব্যবসা আবার চাঙ্গা হওয়ার পর।"

"আমরা এখানেই আপনার সাহায্য করতে পারব, মামা," অমি বলল। "ক্যাম্পের পরে আর কোন কাজ আছে কি?"

"ওহ্ হ্যা, চামচে মাটি নিয়ে ক্যাম্পেইন করতে হবে," বললেন মামা। আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না।

"আমাদের অযোধ্যায় যাওয়ার একটা কারণ আছে। গানিব্যাগ ভরে মাটি নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসি ওখান থেকে। বেলরামপুরের প্রত্যেক হিন্দু বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, রামের জন্মস্থানের এক চামচ মাটি তারা ঘরে রাখতে চায় কি না। এটা তারা উঠোনে রাখতে পারে, চারাগাছে দিতে পারে কিংবা যাই করুক না কেন। পারেখজি আইডিয়াটা দারুণ দিয়েছে।"

পারেখজির পেঁচানো অথচ নিখুঁত যুক্তিটা বুঝতে পারলাম। কেউ অযোধ্যার এক চামচ মাটি রাখতে অস্বীকৃতি জানাবে না। আবার সেটা রাখলে তারা এই বিষয়টার সাথে নিজেদেরকে এক রকমভাবে জড়িয়ে ফেলবেই। নিজের অজান্তেই লোকজনের মধ্যে অযোধ্যার জন্য লড়াই করার স্পৃহা তৈরি হবে। তার মানে খুব সহজে ভোটব্যাঙ্কও যাবে বেড়ে।

আমার কথাবার্তার মাঝে হতাশাটুকু মামা খেয়াল করেছেন।

"ছোটখাটো একটা ক্যাম্পেনের জন্য মার্কেটিং-স্ট্র্যাটেজি এটা। অন্য পার্টিগুলো আরো অনেক বেশি আয়োজন করে।"

আরেকটা শমোচা তুলে নিলাম।

"ঠিক আছে, মামা, রাজনীতি আমার মাথায় ঢোকে না," আমি বললাম, "আমার কিছু বলার নেই। আমরা আপনার কাজে সাহায্য করব। আপনার জন্যেই তো আমাদের আয়-উপার্জন টিকে আছে। আমরা সারাজীবনের তরে আপনার কাছে ঋণী।"

"তোমরা আমার সন্তানের মত। বাবার কাছে সন্তানের ঋণ থাকে কিভাবে?"

"ব্যবসা এখন খারাপ। কিন্তু নতুন করে ঋণের কিস্তি..." মামা আবার আমার কথার মাঝে বাঁধা দিলেন।

"ওসব ভুলে যাও, বাবারা। একটা দুর্যোগ তোমাদের উপর দিয়ে চলে গেছে। যখন পার শোধ ক'রে দিও। আর এখন থেকে তোমরাও আমাদের পার্টির সদস্য, ঠিক আছে?"

মামা উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের জড়িয়ে ধরলেন। আমি অনাগ্রহ নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাকে, লোকজনের কাছে ঋণী থাকাটা ভাল লাগে না আমার। "মামা, আমি দুঃখিত। আমি উদ্ধত, রুঢ় আর বেয়াদবী আচরণ করেছি আপনার সাথে। বুঝতে পারছি এই দোকানটাতেই আমার ভাগ্য। ভগবান হয়ত এরকমই চেয়েছিলেন। আমি সেটা মেনে নিয়েছি," বললাম তাকে।

"যুবক বয়সে আমাদের সবারই এই রকম অবস্থা থাকে। তবে কি ভগবানে বিশ্বাস করা শুরু করেছ তুমি?" বলে মামা হেসে ফেললেন।

"আমার মধ্যে অজ্ঞেয়াবাদের মাত্রা কিছুটা কমে এসেছে।"

"বাবা, আজ আমি সবচেয়ে ভাল এই খবরটাই শুনলাম," মামা বললেন। "এই ক্ষয়ক্ষতি থেকে তাহলে ভাল একটা কিছু হয়েছে।"

এক লোক আমাদের দোকানের ভেতর ভারি একটা কাঠের ট্রাঙ্ক টানতে টানতে নিয়ে এল।

"কে? ওহ্, পণ্ডিতজি?" আমি বললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পণ্ডিতজি হাঁপিয়ে গেছেন। তার সাদা মুখ গোলাপী লাল হয়ে গেছে। ট্রাঙ্কটা মেঝের উপরে ঠিকমত রেখে দিলেন। "একটা খেলার দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। লোকটা টাকা দিতে পারল না। জিনিসপত্র ভর্তি কয়েকটা ট্রাঙ্ক দিয়ে শোধ ক'রে দিয়েছে। আমার টাকা দরকার। তাই ভাবলাম তোমাদের কাছে নিয়ে আসি।"

"আমার কাছেও তো টাকা নেই," তাকে একটা শমুচা দিতে দিতে বললাম, "পণ্ডিতজি, ব্যবসার অবস্থা খারাপ।"

"এখনই তোমার কাছে টাকা চাইছে কে? এখন শুধু দোকানে রেখে দাও। আরো একটা ট্রাঙ্ক পাঠিয়ে দেব। বিক্রি যাই হবে তোমরা অর্ধেক রাখবে আমার আমাকে অর্ধেক দেবে। এই এক ট্রাঙ্কেই দশ হাজারের মাল আছে। বাড়িতে আরো ছয়টা রয়েছে। কি বলো?"

নিতে যেহেতু কোন ঝুঁকি নেই তাই ট্রাঙ্কগুলো নিলাম। এতগুলো জিনিস দোকান থেকে বিক্রি করতে হলে অলৌকিক কিছুর দরকার হবে আমাদের। তখনও বুঝতে পারি নি ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটা সেরকমই অলৌকিক একটা ঘটনা ঘটাবে।

মামা পণ্ডিতজির সাথে পরিচিত হলেন। বয়স্ক লোকজনের মত করেই তাদের আলাপচারিতা শুরু হল নিজ শহরের নাম, বর্ণ, উপ-বর্ণ এসব দিয়ে।

"আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে," ফিসফিস ক'রে বলল ইশ, তবে মামা এবং পণ্ডিতজির শুনতে পারার মতই সেটা।

"কোথাও যাবে নাকি?" মামা জানতে চাইলেন।

"হ্যা, ক্রিকেট ম্যাচ আছে। আমরা যাদের শেখাই তাদের একজন খেলছে," ইশ বলল, তবে আলীর নামটা সে উল্লেখ করল না।

অমি দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে দিয়ে আমাদের ইশারা করলে আমরা সবাই মাথা নিচু ক'রে মামার চরণ স্পর্শ করলাম।

"আমার বাবারা," মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে করতে মামা বললেন।

"ঐ স্টুপিড দলটার গাধা ছেলেটাকে নিয়ে চিন্তা করবে না। তুমি ওদেরকে নাস্তানাবুদ করেছ," আলীকে বলল ইশ।

এলাকায় একটা ম্যাচ দেখে ফিরে আসছি। আলীর দলই জিতেছে। তার স্কোরই সর্বোচ্চ। আলী আট ওভার টিকে ছিল। ইশ মনে হল খুশি যে, শেষ পর্যন্ত শেখানোর ফল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অন্য দলের ক্যাপ্টেন আলীর হাঁটুতে লাথি মেরে পালিয়ে গেছে। আমাদের বিজয়ের আনন্দটা তাই মাটি হয়ে গেল।

"ওরা আবার মারবে আমায়?" আলী বলল।

"না, কেউ তোমার গা ছোঁয়ার আগেই আমি তাদের মারব..." আলীর কপালে চুমু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেতে খেতে ইশ বলল। ইশ ভাল বাবা হতে পারবে। ওর নিজের বাবার মত হবে না ও। যার মুখ দিয়ে কোন আনন্দের কথা বের হয় নি কখনও।

আলী খোঁড়াচ্ছে। অমি তাকে টেনে তুলল। "ওকে আমি দোকানে নিয়ে যাব," বলল সে। "মাকে বলব ওর জন্য কিছু হলুদ দুধ তৈরি ক'রে দিতে। ও ডিনারে যা খেতে চায় খেতে দে।"

"আমি কাবাব খাব," আলী সাথে সাথে বলল।

"কাবাব? আমাদের দোকানে," ইতস্তত করলাম আমি।

"ঠিক আছে, কাউকে বলার দরকার নেই," অমি বলল।

"ও এখন তৈরি হয়ে গেছে," ইশ বলল। কাজী ধাবায় কাবাব ভাজার ধোঁয়ার পেছনে তার মুখটা জ্বলজ্বল করতে দেখা যাচ্ছে। "ওকে কখনও খেলতে দেখেছিস? সে খেলতে গিয়ে অপেক্ষা করে, দৌড়ায়, অন্যের জন্য সাহায্য করে। বড় হিট করার সময় না আসা পর্যন্ত একটানা খেলে যায় সে। ফিল্ডিং ভাল করে না। কিন্তু ওটা বাদ দিলে সে পারফেক্ট। ও এখন তৈরি।"

মুরগীর টিক্কার গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছে। অমি আসলে জীবনে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত। "কী জন্যে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমরা রুমালি রুটি, ভেড়ার মাংসের শিক কাবাব আর মুরগীর বাচ্চার মাংসের টিক্কার অর্ডার দিলাম। সাথে পেঁয়াজ আর সবুজ চাটনি। ওয়েটার খাবারগুলো ঠোঙায় ভরে দিল। ইশ বলল, "অস্ট্রেলিয়া এখন ইন্ডিয়ায় টুর করছে, ঠিক কিনা?"

"তো?" বললাম আমি।

"ও এখন অস্ট্রেলিয়ানদের মুখোমুখি হবার জন্য একদম তৈরি।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১০

ইন্ডিয়া বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচ, কলকাতা, ১১-১৫ই মার্চ, ২০০১

১ম দিন

বেশির ভাগ সময় জীবনে খারাপ জিনিসগুলোই ঘটে। অবশ্য মাঝে মাঝে অলৌকিক ব্যাপারও ঘটে যায়। আমাদের কাছে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটা ছিল ধন্বন্তরী ওষুধের মত। ওই ম্যাচের প্রত্যেকটা দিনের কথা মনে আছে। আলীকে অস্ট্রেলিয়ান দলের মুখোমুখি করবে–সেই আজব, একেবারে অসম্ভব আইডিয়াটার কথা ইশ বারবার বলে চলছে।

"অস্ট্রেলিয়ানদের সাথে দেখা করবি?" কাউন্টারের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে অমি বলল। টিভির সামনে মেঝেতে ইশ আর আমি বসে আছি।

"ওরা এখন ইন্ডিয়ায়," বলল ইশ। টিভিতে দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান দল ব্যাট করছে। ইশ সেদিকেই ইশারা করে কথাটা বলল। "আমরা কখন এরকম একটা সুযোগ পাব?"

"ও কি পাগল নাকি?" অমি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই পাগল। দেখা করলে করবি কী? সত্যিই করবি নাকি?" আমিও যোগ দিলাম।

"আলীর ব্যাপারে ওদের মতামতটা জানতে চাই।"

"কিভাবে?" আমাদের সাথেই নিচে বসে অমি জানতে চাইল।

"আমরা কোন একটা ম্যাচ দেখতে যাব। হয়ত একটা ওয়ান ডে ম্যাচ দেখব," ইশ বলল।

"খেলা দেখতে যাওয়ার মত টাকা নেই," আমি বললাম।

"ওয়ান ডে সিরিজ পরের দু'মাস ধরে চলবে। ব্যবসা চাঙ্গা হলে যাওয়া যাবে," ইশ বলল।

"ওরা আমাদের বাঁশ দিচ্ছে। ব্যবসা আর চাঙ্গা হবে না," স্কোর দেখতে দেখতে বললাম, প্রথম দিন চা বিরতির সময়ে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর গিয়ে দাঁড়াল ১৯৩/১।

"যদি হয়, মানে যদির কথা বলছি," ইশ বলল। আমার কথা শুনে যতটা তার চাইতে স্কোর দেখে বেশি হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ধর ম্যাচ দেখতে গেলাম। তারপর? হেইডেনের দরজায় নক্ ক'রে বলবি, 'এই যে, এই ছেলেটারে একটু দেখেন তো।' ওদের সাথে দেখা করার কথা ভাবিস কিভাবে?" আমি ব্যঙ্গ করে বললাম।

"জানি না," স্ক্রিনের দিকে মুখ ফেরালো ইশ। মুখে রাগের ছাপ। "ভাল ক'রে বল্ কর বাবারা।"

"এই যে, আপনারা কি ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দেখছেন?" একটা নারী কণ্ঠে আমাদের কথায় বাঁধা পড়ল।

এক বয়স্ক মহিলা পূজার থালা নিয়ে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে।

"হ্যা?"

"আমার নাতি আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ খেলা দেখতে পারবে?" তিনি জানতে চাইলেন।

মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালাম, মহিলার সাথে ছোট একটা ছেলে আছে। যে কেউ এসে দোকানের ভেতরে সময় কাটাবে, সেটা আমার পছন্দ না। আমার ইতস্তত ভাব বুঝতে পারলেন তিনি। "আমরা কিছু একটা কিনব। আমি ভেতরে ভজনে যাব আর বাবলু খেলা দেখবে।"

"অবশ্যই। ভেতরে আস," ইশ দরজা খুলে দিলে ছেলেটা ভেতরে এসে টিভির সামনে বুঁদ হয়ে বসে পড়ল। ইশ আর আমি কয়েকবার বিরক্ত দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকালাম।

"এত কাছ থেকে দেখো না, বাবলু। আচ্ছা, আমি শ্রীমতি গাঙ্গুলি। স্কুলের জন্য ক্রিকেটের জিনিসপত্র কিনতে কিছু পরামর্শ দরকার আমার। আপনারা যদি এক সময় আসতে পারতেন।"

"স্কুল?" আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

"হ্যা। আমি এলিস বৃজের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল। খেলার সরঞ্জামের ভাল সাপ্লয়ার আমরা কখনও পাই নি। সবাই আমাদেরকে সরকারী স্কুল ভেবে প্রতারণা করার চেষ্ট করে। আপনারা স্কুলে সাপ্লাই দেন তো, নাকি?"

উত্তরটা হবে–না। স্কুলে সাপ্লাই দেই না আমরা।

"হ্যা," আমি বললাম। "আসলে আমাদের নিজস্ব উপদেষ্টা আছে। তার নাম ইশান। ও আগে জেলা পর্যায়ে ক্রিকেট খেলত।"

"ভাল, তাহলে আপনাদের সাথে দেখা করব," শ্রীমতি গাঙ্গুলি বললেন। তিনি চলে যাওয়ার পরে তার ব্যবসার প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম আমরা।

"ক্যান্ডি নেবে, বাবলু?" অমি বলল। শ্রীমতি গাঙ্গুলির সাথে সংশ্লিষ্ট যে কাউকে প্রভাবিত করার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে এখন।

"কিন্তু আমরা তো কোন সাপ্লায়ার নই," ইশ একটু পরে বলল।

"তাতে কি? তুই আমার জন্য এটুকু কর। এ থেকে নিয়মিত আয় করা যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ব্যবসাটা তোকে পাইয়ে দিলে কি গোয়ায় যাওয়া যাবে?"

"গোয়া?" ভ্রু উপরে উঠে গেল আমার।

"*শেষ ওয়ান ডে খেলাটা দেখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে যাচ্ছি। টাকা জমাতে* পারলে চল, আলীকেও সাথে নিয়ে যাই।"

"কিন্তু..."

"বল, হ্যা।"

"আচ্ছা," আমি বললাম। মল নিয়ে কলঙ্কজনক ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরে ইশকে খুশি করতে চাচ্ছিলাম। দিনের হিসেবটা দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালাম আমি।

"দারুণ, খেলাটা দেখছিস?" ইশ বলল, "পুরো উল্টে গেছে।"

টিভির দিকে তাকালাম, সম্ভবত মন্দিরের ভেতরে শ্রীমতি গাঙ্গুলির প্রার্থনা ভগবান শুনেছেন। হরভজন সিং নামের এক নমশূদ্র টি-টাইমের পরে গর্জে উঠলে সব উইকেটগুলো পড়ে গেল। ১৯৩/১-এর পরে দিন শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান গিয়ে দাঁড়াল ২৯১/৮।

"ভাজি, তুমি মহান," টিভিতে চুমু খাওয়ার জন্য ইশ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

"এত কাছ থেকে টিভি দেখবেন না," বাবলু নামের ছেলেটা বলল।

"বড়দের কথা সবসময় শুনবে না। কাছ থেকে টিভি দেখে কেউ কখনও অন্ধ হয়ে যায় নি। মানুষ কম্পিউটারে কাজ করে না?" উত্তেজনায় ইশ লাফাচ্ছে।

শ্রীমতি গাঙ্গুলি দু'ঘন্টা পরে বাবলুকে নিতে আসলেন। দুটো টেনিস বল কিনে দিলেন তাকে। লোভ হচ্ছিল বল দুটো কিনে দিয়ে দিই। কিন্তু তিনি হয়তো ভুল বুঝতে পারেন আমাদের।

"এই যে," একটা কার্ড দিয়ে বললেন তিনি। "প্রতি সোমবার বোর্ড মিটিং হয়। এসে আমাদের একটু জানাবেন কি আপনারা কী রকম হেল্প করতে পারবেন?" চারটা দিন সময় আছে তৈরি হওয়ার জন্য। ইন্ডিয়া এই ম্যাচে জিতলে বোর্ড খোশমেজাজেই থাকবে।

"অবশ্যই, তাহলে আপনাদের সাথে দেখা করছি," বলে বাবলুর দিকে একটা ক্যান্ডি এগিয়ে দিলাম।

২য় দিন

২য় দিনের ম্যাচ নিয়ে একটা কথাই বলা যায়, 'হতাশাজনক'। ২৯১/৮ থেকে শুরু ক'রে ফার্স্ট ইনিংস শেষে অল আউট হওয়ার আগে ৪৪৫ রানের বিশাল স্কোর ক'রে ফেলল তারা। ব্যাট করতে নামল ইন্ডিয়ানরা। কোন স্কোর না করেই আউট হয়ে গেল ওপেনার রমেশ।

"এই রমেশ বালটা কে?" ইশ মহা বিরক্ত হয়ে বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু শুধু যে রমেশই খারাপ খেলল তা না। টেন্ডুলকার করল ১০, অন্যেরা আরো কম। সর্বোচ্চ স্কোর রাহুল দ্রাবিড়ের। ২৫। দ্বিতীয় দিনে ইন্ডিার স্কোর গিয়ে দাঁড়াল ১২৮/৮।

ইশ ডিনারের সময় রাগে চাপাতি ছিঁড়ে ফেলল। "নির্ঘাত অস্ট্রেলিয়ানগুলো ভাবছে ইন্ডিয়ার সাথে শুধু শুধু কষ্ট ক'রে খেলতে আসার কোন মানে নেই।"

"যেন ড্র হয় সেই প্রার্থনাই কর। ড্র হলে বিক্রি হতে পারে। আর নইলে ব্যবসা পাল্টাতে হবে। আমাদের দেশে স্পোর্টস নিয়ে ব্যবসার কথা ভাবাটাই ভুল," অমির দিকে ডালের পাত্র বাড়িয়ে দিয়ে বললাম।

"ওদের লোকসংখ্যা মাত্র বিশ মিলিয়ন। আমাদের এক বিলিয়নেরও বেশি। প্রতি বছর দুই পার্সেন্ট হারে বাড়ছে। তার মানে প্রতি বছর একটা ক'রে অস্ট্রেলিয়ার জন্ম দিচ্ছি আমরা। তারপরও ওরাই সেরা। কোন না কোন সমস্যা তো আছেই।"

"আমরা কি আরেকটা ফুলের দোকান খুলব? মন্দিরে সবসময় ফুলের চাহিদা থাকে," আমি বললাম।

ইশ আমার কথায় গুরুত্ব দিল না। ফলো-অনে যেন না পড়ে যায় সেজন্য বিড়বিড় ক'রে কিছু একটা বলল সে। কিন্তু সেটাও এখন সুদূর পরাহত বলেই মনে হচ্ছে।

৩য় দিন

পর দিন সকালে কেন যে টিভিটা অন করেছিলাম জানি না। ইন্ডিয়া প্রথম ইনিংস বাড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু দুপুরের খাবারের আগে অল আউট হয়ে ১৭১ রানে গুটিয়ে গেল তারা। "অস্ট্রেলিয়ানরা ইন্ডিয়াকে ফলো-অন করতে বলেছে," ভাষ্যকার বললেন। কপাল চাপড়ালাম আমি। টেস্ট ম্যাচে হেরে যাওয়াটা এক রকম ব্যাপার। কিন্তু ইনিংস পরাজয় মানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সপ্তাহ ধরে পার্ক খালি পড়ে থাকবে। ছেলেপেলে ক্রিকেট না খেলে বই পড়বে। ইন্ডিয়ার পরাজয়ের কথা বার বার মনে করিয়ে দেওয়া হবে তাদের। কেন যে এই ব্যবসাটা শুরু করেছিলাম? কী রকম বোকা আমি? এর বদলে মিষ্টির দোকান কেন খুললাম না? ইন্ডিয়ানরা সবসময়ই মিষ্টি খায়। কেন খেলাধুলা? কেন ক্রিকেট?

"শালার চমৎকার ফলো-অন," সাথে সাথেই এই নতুন পদবাচ্যটি বানিয়ে ফেলল ইশ। হাত মুষ্টি পাকিয়ে ভয়াবহভাবে টিভির কাছে চলে এল সে। "ওদের স্কোর ছিল ২৯১/৮, এর এখন কিনা ওরাই আমাদের ফলো-অনের কথা বলে?"

"টিভি বন্ধ ক'রে দেব?" আমি বললাম। দোকানটাও চিরদিনের জন্য বন্ধ ক'রে দেব কিনা সে কথাও ভাবলাম।

"দাঁড়া, খেলাটা দেখব। এত শোচনীয় পরাজয়ের পরে আমাদের ক্রিকেটারদেরর চোখের দৃষ্টিটা আমি একটু দেখতে চাই," ইশ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তারা তোমার দিকে তাকাচ্ছে না। তুমি টিভিতে ওদের দেখছো, বন্ধু," অমি বলল।

"এই ম্যাচটা ড্র হলে তোদের সবাইকে রাতের ডিনারে দাওয়াত করব। ঠিক আছে? না, একটা না। দুটো ডিনারের দাওয়াত," ইশ বলল।

দ্বিতীয় ইনিংসে ইন্ডিয়া একজন খেলোয়াড় পাল্টালো। ওপেনার রমেশের জায়গায় নিয়ে আসল নতুন এক খেলোয়াড় ভি.ভি.এস লক্ষ্মণকে।

"স্বজনপ্রীতি ক'রে সুযোগ পাওয়া লোকে দলটা ভরে গেছে। সবাই আজকে একবার ক'রে চান্স পাবে মাঠে নামার জন্যে," ইশ বলল। ইন্ডিয়ান ওপেনার ব্যাটসম্যানদ্বয় ফলো-অন ইনিংস খেলার জন্য ক্রিজে নামছে।

কিন্তু ব্যাটে-বলে দারুণ সংযোগ ঘটাচ্ছে লক্ষ্মণ। চারের পরে চার মেরে যাচ্ছে সে। তৃতীয় দিন শেষে ইন্ডিয়ার সম্মানজনক স্কোর দাঁড়াল ২৫৪/৪-এ। প্রথম ইনিংসের ১৭১ যোগ করলে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৪৪৫-এর সমান হওয়ার জন্য ইন্ডিয়ার আর মাত্র ২০ রান দরকার। ইনিংস পরাজয়ের সম্ভাবনা এখন আর নেই। আর, হ্যা, এখন আমরা ড্রও করতে পারি।

"দেখেছিস, ইন্ডিয়ান দলটা এরকমই। ঠিক যে সময় তুই আশা ছেড়ে দিবি তখনই তারা আবার তোর মধ্যে আশা জাগিয়ে তুলবে," আমি বললাম।

"লক্ষ্মণের কাজ এখনও শেষ হয় নি। ড্র করতে হলে তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে," ইশ বলল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। এখন আমাকে স্কুল মিটিংয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হবে।

AMARBOI.COM

৪র্থ দিন

বিশ্ব ক্রিকেটে ইন্ডিয়া যদি কোনদিন আধিপত্য ক'রে থাকে তবে সেটা ম্যাচের চতুর্থ দিনেই করেছে। হ্যা, ১৯৮৩-এর ২৫ জুন বিশ্বকাপ জেতে ইন্ডিয়া, কাজেই সেই দিনটাকেও গণনায় ধরা যায়। কিন্তু যেদিনটার কথা বলছি, সেদিন দু'জন ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যান এগার জন অস্ট্রেলিয় ক্রিকেটারকে নাচিয়ে ছেড়েছে। সবার সামনেই তারা এটা করেছে, আর সেটা করেছে সারাদিন ধরে। টেস্টের চতুর্থ দিনে জলবিয়োগের জন্যেও ইশ টিভি ছেড়ে গেল না।

ওই দিনের ঘটনাটা এরকম : লক্ষ্মণ আর দ্রাবিড় খেলা শুরু করল পঞ্চম উইকেটে ৩৫৭ রান যোগ করে। চতুর্থ দিন ২৭৪/৪ স্কোর দিয়ে শুরু হয়ে ৫৮৯/৮ এ গিয়ে শেষ হল। অস্ট্রেলিয় দলের এগার জনের মধ্যে নয় জন খেলোয়াড়ই ঘুরে ফিরে বল করল সারাদিন। কিন্তু কেউ কোন উইকেট পেল না। ইডেন গার্ডেনে লাখখানেক মানুষের ভীড় যেন সম্মোহিত হয়ে বসে আছে। বারবার লক্ষ্মণের নাম ধরে চিৎকার দিচ্ছে তারা। স্টিভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াহ্ এসব শুনে দৃশ্যত রুষ্ট হচ্ছেন। যে দলটাকে তারা ফলো-অন করতে দিয়েছে তারাই কিনা এখন একজন মাত্র ব্যাটসম্যানকে আউট করতে পারছে না!

লক্ষ্মণ নট আউট থেকে ২৭৫ রানে ওই দিনের মত খেলা শেষ করল। পুরো ইন্ডিয়ান দল প্রথম ইনিংসে যত করেছে একা তার রান তার চাইতেও বেশি। দ্রাবিড় ১৫৫ রান ক'রে নট আউট আছে। অনেকগুলো উইকেট আমাদের এখনও বাকি। অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ৩৩৭ রান বেশি। হাতে আছে আরো একদিন।

"এইবার আমি ঘুমাতে পারব। ড্র হলে যে ডিনার দেওয়ার কথা, সেসব জিনিস কিতে হবে," দোকানের ঝাঁপ নামানোর সময় ইশ বলল।

"আশা করি পার্কে কিছু বাচ্চা-কাচ্চা আবার খেলতে এসেছে," আমি বললাম।

৫ম দিন

মানুষের প্রত্যাশার কোন শেষ নেই। দু'দিন আগে একটা ড্র হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছিলাম আমরা। সেখানে পঞ্চম দিনের শুরুতে নতুন আশার আলো দেখা যাচ্ছে। ২৮১ রান ক'রে লক্ষ্মণ চলে গেল। তার এগার ঘণ্টার ইনিংসকে স্বাগত জানানোর জন্য উঠে দাঁড়াল পুরো স্টেডিয়ামের সমস্ত দর্শক।

ইন্ডিয়া দলের ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলি একটা বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত নিল। ওই দিন এক ঘণ্টা খেলে ৬৫৭/৭-এ ইন্ডিয়ার ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিল সে। তার মানে অস্ট্রেলিয়াকে আবার ব্যাট করতে হবে এখন, আর জেতার জন্য দিনের বাকি সময়টাতে তাদের করতে হবে ৩৮৫ রান।

"গাঙ্গুলি কি পাগল? খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেল ব্যাপারটা। আমাদের খেলে যাওয়া উচিত ছিল। ড্র করেই শেষ ক'রে দেয়া দরকার ছিল খেলাটা," আমি বললাম।

"হয়ত তার মনে অন্য কিছু আছে," ইশ বলল।

"কী?" মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল অমি।

গাঙ্গুলির মনে যে কী আছে তা আমিও নিশ্চিত ক'রে জানি না। ঠিক আছে, আমাদের ভাগ্য ভাল। বিশাল স্কোর ক'রে খেলাটা ড্রর দিকে নিয়েছি আমরা। কিন্তু পুরো সময়টা ধরেই তো খেলা যেত, তাহলে ক্যাপ্টেন ইনিংস ডিক্লেয়ার করল কেন? অবশ্যই কোন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই এই কাজটা করেছে সে। মানে ইন্ডিয়ার বিজয়ের কথা ভেবে আর কি।

"সে এতটা নিশ্চিত হতে পারে না। ফলো-অনে পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। ইনিংস পরাজয় হতে পারত আমাদের। এখন গাঙ্গুলির কি সত্যিই মনে হয় এই অস্ট্রেলিয়ানগুলোকে আউট করতে পারবে সে?" আমি বললাম।

অস্ট্রেলিয় উদ্বোধনী ব্যাটসম্যানরা ক্রিজে নামার সময় ইশ ইতিবাচকভাবে মাথা নাড়ল। গাঙ্গুলি অস্ট্রেলিয়দের জন্য জেতার স্কোর রেখে দিয়েছে ৩৮৪। লোভনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কোর–কঠিন, তবে সম্ভব। অস্ট্রেলিয়রা চাইলে নিরাপদে খেলে খেলাটা ড্র ক'রে দিতে পারে। কিন্তু ওদের খেলার ধরণটা এরকম নয়।

"এই যে গণিতবিদ সাহেব, এরকম কি কখনও ঘটেছে? এরকম কখনও হয়েছে, ফলো অনে পড়েছে যে দল, তারাই শেষমেশ ম্যাচে জিতে গেল?" ইশ জানতে চাইল। অমিকে ইশারা করল বিশেষ জরুরি একটা প্রার্থনা শুরু ক'রে দেওয়ার জন্য।

উপরের তাক থেকে ক্রিকেট ডাটা বইটা টেনে বের করলাম। এ ধরনের বই আমাদের এখানে খুব কমই বিক্রি হয়। কিন্তু প্রকাশকের জোরাজুরিতে কয়েক কপি রাখতে হয়েছে। দশ মিনিট ধরে খোঁজাখুজি ক'রে তারপর বললাম, "হুম, আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে।"

"কতবার?" ইশ আরো জানতে চাইল। তার চোখ টিভি পর্দায় সেঁটে আছে।

"দু'বার," বললাম আমি। খেয়াল করলাম চোখ বুজে নীরবে চুপ ক'রে আছে অমি।

"তাহলে এরকম ঘটনা ঘটে। কত সময়ের মধ্যে দু'বার হয়েছে?" ইশ বলল।

"গেল একশ দশ বছরে মাত্র দু'বার ঘটেছে।"

ইশ আমার দিকে ফিরল। "মাত্র দু'বার?"

"১৮৯৪-তে একবার, তারপরে আবার ১৯৬৮ সালে," বই থেকে জোরে জোরে পড়ে শোনালাম। "দু'বার জিতেছে ইংল্যান্ড–কার বিরুদ্ধে অনুমান কর দেখি? অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে! দুঃখিত বন্ধু, পরিসংখ্যানের দিক থেকে বলতে গেলে এই ম্যাচ শেষ।"

ইশ মাথা নেড়ে সায় দিল।

"সম্ভাব্যতা এতই কম যে, আমার মনে হচ্ছে, ইন্ডিয়া জিতলে গোয়া ঘুরে আসার ব্যাপারে আমার রাজি হয়ে যাওয়া উচিত," কৌতুক ক'রে বললাম আমি।

"কিংবা ইন্ডিয়া যদি জিতে যায় তাহলে তুই ভগবানে বিশ্বাস করা শুরু করবি?" অমিও ফাঁকতালে কথাটা বলে দিল।

"হ্যা," আমি কিছু না বুঝেই বলে ফেললাম।

অমিকে বেশি বেশি প্রার্থনা করতে নিষেধ করে দিলাম। খেলা ড্র হলেই ভাল। গাঙ্গুলি বোধহয় ঝুকিটা আমলে নেয় নি। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হবে যদি অস্ট্রেলিয়া রানগুলো তুলে ফেলতে পারে।

"১৬১/৩," চা বিরতির সময় অস্ট্রেলিয়ার স্কোরটা পড়ে শোনাল অমি। আমরাও এখন চা খাচ্ছি।

"দোকানটা পরিষ্কার ক'রে ফেলি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খেলা শেষ হয়ে যাবে। কিছু খদ্দের পাওয়া যাবে হয়ত," আমি বললাম। "ড্র হলেই ভাল। অস্ট্রেলিয়ানদের উপর অন্য কোন সময় ঝাল মেটাবো আমরা," একেবারে অনিচ্ছায় ঝাড়ুটা হাতে নিল ইশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্ডিয়ান দল মনে হয় চায়ের সাথে বিশেষ কিছু মিশিয়ে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ফিরে এসে ১৬৬/৩ করল। তারপরে আসল পাঁচটা মারাত্মক ওভার। হরভজন সিং হ্যাট্রিক ক'রে ফেলল এই পাঁচ ওভারে। তারপরে অস্ট্রেলিয়ার রান গিয়ে দাঁড়াল ১৭৪/৮-এ। আট রানেই অস্ট্রেলিয়ান দলের অর্ধেক শেষ।

"ইশ, চোদনার মত টিভির সামনে দাঁড়িয়ে থাকিস না," আমি বললাম। কিন্তু ইশ কেবল দাঁড়িয়ে রইল না সেই সঙ্গে বাচ্চাদের মত লাফাচ্ছেও।

"রাখ তোর পরিসংখ্যান, রাখ তোর সম্ভাব্যতা," ইশ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। লোকজন গণিত নিয়ে খারাপ কিছু বললে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু ইশকে আমি বেনিফিট অব ডাউট দিলাম। মানে আপাতত ছাড় দিলাম আর কি। চোখের সামনে ইতিহাস নির্মাণ হচ্ছে দেখলে দু'একটা গাল-মন্দ হজম করা যায়।

অনতিবিলম্বে বাকি দুই ব্যাটসম্যানের মাথার ছাল তুলে ফেলল তারা। হরভজনকে চুমু খেয়ে টিভির পর্দাটা থু থু দিয়ে মাখিয়ে ফেলেছে ইশ। ছয় উইকেট নিয়েছে সে। ইন্ডিয়া ম্যাচ জিতে গেল। এ যাবতকালে সবচেয়ে দেখবে মত একটা খেলা।

ইডেন গার্ডেনে প্রতিটি প্ল্যাকার্ড পোস্টার আর ব্যানার যা কিছু ছিল সবকিছুতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। টিভি ভাষ্য শোনা অসম্ভব হয়ে গেল। কারণ যতবার একেকজন ইন্ডিয়ান দলের সদস্যের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে ততবারই পুরো স্টেডিয়াম চিৎকার ক'রে উঠছে।

কোমরে হাত দিয়ে ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইশ। তার চোখে সত্যিকারের ভালবাসা দেখতে পাচ্ছি আমি। প্রায়ই দেখতাম ইশ নীল পোশাক পরা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, যেন সেও ওদের একজন হতে চায়। কিন্তু আজ আর তার মধ্যে নিজের জন্য কোন অনুতাপ দেখছি না। আমার মনে হয়, তাদের মত হওয়ার চাইতে আজ সে চাচ্ছে, তারা জিতে যাক। সে দেখছে হরভজন শুধু লাফাচ্ছে। ট্রফি নেওয়ার জন্য গাঙ্গুলি এল যখন ইশ হাত তালি দিয়ে উঠল।

"দুটো বল দেন, তাড়াতাড়ি। ম্যাচ খেলছি আমরা," একটা ছোট ছেলে কাউন্টারে পঞ্চাশ রুপির একটা নোট রেখে দিয়ে বলল। মহান ইন্ডিয়ান ক্রিকেট মওসুমের প্রথম খদ্দের এসে পৌঁছেছে আমাদের দোকানে।

হাত দুটো এক জায়গায় ক'রে আকাশের দিকে তাকালাম আমি। যে অলৌকিকতা তুমি আমাদের উপরে বর্ষিয়েছো তার জন্য ধন্যবাদ, ভগবান। "আমরা শুধু বল বিক্রির জন্য আসি নি, সমস্যার সমাধানও দেব আমরা," আমি বলতে শুরু করলাম।

শুরুটা খুব ভাল করেই করতে পারলাম। গত দু'রাতের চিন্তার ফসল। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের অফিসে আমরা। অফিসের অবস্থা ভাল না। ক্ষয়ে যাওয়া আসবাবপত্র, ধুলোয় পড়া ট্রফির সারি। অধিকাংশ সরকারি অফিস এবং বিল্ডিংয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো করে কয়েকটা কার্ডের উপরে পুরনো নথিপত্র স্তূপ ক'রে রাখা। মহিলা প্রিন্সিপাল এবং ছয়জন শিক্ষক-শিক্ষিকা একটা অর্ধাবৃত্তাকার কাঠের টেবিলের চারপাশে বসে আছে। এখানে কাজ করাটা নিশ্চয় কষ্টের, আমি ভাবলাম। অন্য কারো জন্য কাজ করাটাও নিশ্চয় কষ্টকর হবে, সে কথাও ভাবলাম।

অনেকক্ষণ ধরে চুপ ক'রে আছি দেখে প্রিন্সিপাল বললেন, "আপনার কথা বলুন।"

"জেলা পর্যায়ের একজন চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় আমাদের সাথে আছে। আপনাদের প্রয়োজন এবং বাজেটের উপরে ভিত্তি ক'রে একটা প্যাকেজ ডিজাইন ক'রে দিতে পারবে সে," ইশের দিকে ইঙ্গিত করে কথাটা বললাম আমি। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা তার দিকে তাকাল।

আটশ ছাত্র-ছাত্রির প্রয়োজনের হিসেব সংবলিত কিছু কাগজ দিলাম। প্রতি পৃষ্ঠা তিন রুপি হারে একটা কম্পিউটারের দোকান থেকে এগুলো লেজার প্রিন্ট ক'রে নিয়েছি। একটা পিয়ন সবার জন্য শুধু চা আর শমোচা দিয়ে গেল।

"এতে ক'রে কত খরচ পড়বে?" প্রশাসনিক প্রধান জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা একটা হিসেব করেছি। গড়ে মাসে দশ হাজার পড়বে," আমি বললাম।

"অনেক বেশি হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এটা। কোন বেসরকারী স্কুল না," প্রশাসনিক প্রধান বললেন। নোটবুকটা বন্ধ ক'রে আমার দিকে ঠেলে দিলেন তিনি।

গভীর নিঃশ্বাস নিলাম। এই পরিবেশে এরকম একটা উত্তরের কথাই ভাবছিলাম আমি। "স্যার, আমরা আরেকটু কমাতে পারি।"

ইশ আমাকে বাধা দিল, "প্রতি বছর একেকজন বাচ্চার পেছনে বার রুপি ক'রে পড়বে। একটা ঝর্ণা কলমের সমান গুরুত্বও কি খেলাধুলার নেই বলে মনে করেন?"

নোটবুক থেকে চোখ তুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

"সত্যি ক'রে বললে, নেই বলেই মনে করি আমরা। ফলাফল কী রকম হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করেই আমাদের স্কুলের মূল্যায়ন হয়। শতকরা পাশের হার আর কয়জন ফার্স্ট ডিভিশন পেল সেটাই হল আসল কথা। আমাদের সুযোগ-সুবিধা কম," প্রধান বললেন।

"সবাই এভাবে চিন্তা করলে ইন্ডিয়ার খেলোয়াড় বের হয়ে আসবে কোত্থেকে?" ইশ বলল।

"ধনী পরিবার থেকে," প্রধান শিক্ষিকা তার চশমা খুলে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করতে করতে বললেন কথাটা।

"কিন্তু মেধা তো শুধু বড়লোকদেরই থাকে না। খরচের খাতটা আরো বাড়ানো দরকার।"

"জানেন, আমাদের অর্ধেক ক্লাসরুমেই বৃষ্টি হলে পানি পড়ে?" প্রধান বললেন। "আমরা কি চকচকে বল কিনব নাকি টুটাফাটাগুলো ঠিক করব?" চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এফ দিয়ে শুরু শব্দটা মনে মনে কয়েকবার বললাম। গোবিন্দ, এটা বাদ দাও। তোমার দরকার ব্যবসা, যে কোন ব্যবসা।

"স্যার, মাসে পাঁচ হাজারের একটা পরিকল্পনা আমরা তৈরি করতে পারি," আমি বললাম।

ইশ হাত উঁচু ক'রে আমাকে চুপ করিয়ে দিল। ওকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমার। উঠে দাঁড়াল ইশ। প্রশাসনিক প্রধানের সমান লম্বা সে। "আপনাদের এখানে কাজ কী?"

"ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া," সটান মুখ ক'রে প্রধান বললেন।

"এই পাকা ছাদের নিচে যেসব বই তারা পড়ে, সব শিক্ষা কি এর মধ্যেই রয়েছে?"

"কী?" প্রশাসনিক প্রধান অবাক হয়ে বললেন।

"জিতিন স্যার, বসেন," প্রিন্সিপাল বললেন। "ওরা কী বলতে চায় শুনে দেখি।"

জিতিন স্যার বসে পড়লেন। তার নামটা মনে রাখলাম।

"টিমওয়ার্ক বলতে কোন কিছু কি আপনার বাচ্চাদের শেখান? ভক্তি নিয়ে কোন লক্ষ্যের দিকে কিভাবে ছুটতে হয় তা কি শেখান হয়? নিয়ম-শৃংখলা শেখান? কোন কিছুর দিকে মনোযোগ দেওয়া শেখান?"

"বসো, বাবা," প্রিন্সিপাল বললেন। ইশ বসলেও চুপ থাকল না।

"কম দামে আমি রাজি না। আটশ ছেলেমেয়ে। সারা দিন তাদের ক্লাসে আঁটকে রাখতে চান। অকারণ ফার্স্ট ডিভিশনের পিছে আমরা ছুটব। কিন্তু দু'প্লেট শমোচার সমান খরচ খেলাধুলায় করব না।"

প্লেটের শমোচার দিকে সে ইঙ্গিত করলে শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই মাঝপথে খাওয়া থামিয়ে দিল। শেষমেশ প্রিন্সিপালই কথা বললেন, "আচ্ছা, দশ হাজার দিয়েই শুরু ক'রে দেখি। দেখা যাক, কেমন চলে। ছয় মাস আপনারা কাজ করতে পারবেন।"

হাত মেলানোর জন্য উঠে দাঁড়ালাম আমি। ছয়জন শিক্ষিত, পঞ্চাশের একটু বেশি বয়সী মানুষ আমাদের সাথে হাত মেলানোর জন্য উঠে দাঁড়াল। হ্যা, সত্যিকারের ব্যবসায়ী হয়ে গেছি আমি।

"যদি তাই হয় তবে আমাদের বেলাপুর স্কুলের মিটিংয়ে চলে আসেন, কেমন?" সবচেয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন।

"ওহ্, হ্যা। ইনি হচ্ছেন মিঃ ভাসালি। বেলাপুর স্কুলের হেডমাস্টার। এখানে দেখতে এসেছিলেন। এজন্য তাকে এই মিটিংয়ে বসতে বলেছিলাম," প্রিন্সিপাল পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন।

তার কার্ডটা নিলাম। ব্যবসার জন্য আমাদেরও কার্ড তৈরির অর্ডার দিতে হবে। ব্যাপারটা স্মরণে রাখলাম আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১১

"গোয়া, ওয়াও! কারো কারো জীবন এতটা ভাল কাটে!" মুখে একটা পিন নিয়ে বিদ্যা বলল। ঘরের ভেতরে একটা চৌকির উপর দাঁড়িয়ে দেয়ালে *দিল চাহ্‌তা হায়* ছবি থেকে নেয়া আমীর খানের একটা পোস্টার লাগাচ্ছে সে। আমি–তার টিউটর–পিনের ট্রে'টা ধরে আছি। টিউটর হিসেবে আমার কর্তৃত্বপরায়ন অবস্থানের সাথে এটা একেবারেই বেমানান।

"গোয়ায় যাওয়াটা তোমার ভায়েরই আইডিয়া। আসলে কাজ থেকে এরকম ছুটি নেওয়ার দরকার আমার নেই," আমি বললাম।

"অবশ্যই দরকার আছে," নিচে নামতে নামতে সে বলল। "ভূমিকম্পের কথা ভুলে যাবেন তাহলে।"

"কাজ ক'রে ঋণ শোধ করার টাকা পেলেই ভূমিকম্পের কথা ভুলে যাব। ওখানে ঘুরতেই তিন হাজার রুপি শেষ।" তার ডেস্কের কাছে ফিরে আসলাম।

নিজের জায়গায় বসে বইটা খুলল সে। প্রতিটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে একটা ক'রে চাটি মারতে লাগল।

"আরেকটু আগ্রহ দেখানো যায় না?"

"আমি অভিনয় ভাল পারি না," সে বলল।

"খুব মজার। তোমার তথাকথিত সেলফ-স্টাডি ক'রে ক্যালকুলাসের চ্যাপটারটা শেষ করেছ?"

"আমার জন্য আপনার সময় নেই, তাই সেলফ-স্টাডি করেছি," সে বলল। "যাহোক, আমি এটা বুঝি না। ভাল লাগে না, তারপরও করতে হয়। এই 'ধঃ ধঢ়' এসব কী? আর এতসব ভয়ঙ্কর প্রতীক কেন?"

"বিদ্যা, তুমি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দেবে। এমন কথা বল না যে..." অর্ধেক বলে থেমে গেলাম। ক্যালকুলাস চ্যাপ্টারটা খুললাম আমি।

"কেমন কথা বলব না?"

"নির্বোধ মানুষের মতন। এখন মনোযোগ দাও।"

"আমি নির্বোধ নই। গোয়ায় যান, ব্যবসা গোছান, টাকা কামান, অঙ্ককে যারা পছন্দ করে না তাদেরকে অপমান করুন, বন্ধুদের সময় দেয়ার দরকার নেই আপনার। আমি নিজেই সব ভাল ক'রে ম্যানেজ করতে পারব।"

'ভাল' শব্দটা সবচেয়ে জোরে বলল সে।

"আচ্ছা, কোন সমস্যা আছে?" কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যা, ক্যালকুলাসে সমস্যা আছে। শুরু করব?"

এক ঘণ্টা ধরে তাকে ক্যালকুলাস বুঝালাম। "শেষে যে অনুশীলনী আছে, ওগুলো করবে। আমার আসার আগে পরের চ্যাপ্টার পড়ে রাখবে," বলে ক্লাস শেষ ক'রে দিলাম।

সে কিছু বলল না।

"বিদ্যা, মাঝে মাঝে তোমাকে কথা বলানোটা দাঁত তোলার মত শক্ত ব্যাপার হয়ে যায়। ব্যাপারটা কী?"

"আমি এরকমই, আপনার কোন সমস্যা আছে?" পাল্টা জবাব দিয়ে দিল। তার চোখে জল এসে গেছে, লম্বা আঙুলগুলো কাঁপছে এখন। এই জল বৃষ্টিতে পরিণত হওয়ার আগেই আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে।

"চারদিন পরে আসব," দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম।

"তাতে কার কী?" আমার পেছন থেকে বলল বিদ্যা।

*

"সময়মত খাবে, ঘুম থেকে দেরিতে উঠবে না," ট্রেনের সিগনাল নিভে গেলে আলীর বাবা বললেন।

আলী এত উত্তেজিত যে তার বাবা কী বলছেন শোনার সময় নেই। একেবারে উপরের বার্থটা নিজের জন্য রিজার্ভ ক'রে নিয়ে সেখানে উঠে পড়ল সে। যাত্রা শুরুর আগে প্রার্থনা করল অমি।

"আলীর মা এসব খেয়াল রাখে না। আমাদের হৃদয়ের ধন ও," আলীর বাবা বললেন। তার চোখ ভিজে এসেছে। "মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি বিয়ে না করতাম।"

টাকা-কড়ি আর টিকেট প্লাস্টিকে মুড়ে মোজার ভেতরে রেখে দিলাম। বার বছরের একটা বাচ্চা আর দু'জন বয়স্ক মানুষের সাথে ঘুরতে গিয়ে এই দায়িত্বটা আমার উপরেই পড়ল।

"ঠিক আছে চাচা, দেখা হবে। আপনি এখন বরোদায় গিয়ে ইলেকশনের র‍্যালি করতে পারেন," আমি বললাম।

"তা ঠিক। আলীকে ওর আম্মার কাছে চার দিন ছেড়ে রাখতে পারি না।"

"এই বছর কি ইলেকশনের টিকিট পাচ্ছেন?" নিচের বার্থে সুটকেসটা বেঁধে রাখতে রাখতে বললাম। ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

"না, না, পার্টিতে আমি অত সিনিয়র নই। কিন্তু বেলরামপুরের ক্যান্ডিডেটকে আমি সাহয্য করব। আলী বেটা, বার্থে লাফাবে না, আলী..." ট্রেনের গতি বেড়ে গেলে তার গলা মিলিয়ে গেল।

আলীর হাত ধরে টেনে তাকে কোলে বসাল ইশ। "ঠিকভাবে বিদায় জানাও," ইশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল। "খোদা হাফেজ, আব্বা," চেঁচিয়ে বলল আলী। ট্রেনটা আরো রৌদ্রোজ্জ্বল ভূ-খণ্ডের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করল।

"অর্গানাইজার। অর্গানাইজারদের সাথেই দেখা করব আমরা। ভেতরে যেতে দিন," আমি বললাম। একটা লোমশ হাত আমাকে থামিয়ে দিল। ভিআইপি স্ট্যান্ডের বাইরে একটা সিকিউরিটি গার্ডের হাত সেটা।

"এখানকার ত্রিশ হাজার লোক ভেতরে যেতে চায়। আপনারা কারা? অটোগ্রাফ নিতে চান?"

"বল হ্যা," চাপা গলায় আমাকে বলল ইশ।

"আপনাদের সিনিয়রকে নিয়ে আসেন। তার সাথে কথা বলতে চাই।"

"কেন?" লোমশ গার্ডটা বলল।

একটা কার্ড বের ক'রে দেখালাম আমি। এতে লেখা, 'জুবেন সিং, চেয়ারম্যান, উইলসন স্পোর্ট।' পণ্ডিতজি একবার ইন্ডিয়ার বৃহত্তম স্পোর্টস কোম্পানির চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করেছিলেন। তার ট্রাংক থেকে কার্ডটা নিয়ে এসেছি সাথে ক'রে।

"উইলসন স্পোর্টসের মালিক আমি। কিছু এনডোর্সমেন্ট ডিল নিয়ে কথা বলতে চাই। আপনি সহযোগিতা করবেন নাকি..."

সিকিউরিটি গার্ড ঘেমে গেল। ডেকে আনল তার ম্যানেজারকে। একই কথা তাকেও বললাম। তিনি সিকিউরিটির চেয়েও বড় কর্তাকে ডাকলেন। সুট পরিহিত অবস্থায় এলেন তিনি। আমি একটা ভুয়া টেলিফোন করলাম। ভান করলাম যে, দশ কোটি রুপির ব্যবসায় অর্ডার দিচ্ছি। তবুও তার সন্দেহ কাটল না। গুজরাটি ভাষায় আরেকটা কল করলাম। তার চেহারা নরম হয়ে এল।

"গুজরাটি?" তিনি বললেন।

তার দিকে তাকিয়ে ভাল কোন জবাব খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলাম। ইন্ডিয়ার কোন্ এলাকায় কোন্ লোককে দেখলে তাকে সবাই পছন্দ করবে নাকি অপছন্দ করবে সেটা বোঝার উপায় নেই।

"হ্যা," দৃঢ়ভাবে বললাম।

"ওহ্, কেমন আছেন?" গুজরাটি ভাষায় বললেন তিনি।

ইন্ডিয়ার বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক ক্লাবগুলোর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

"আহমেদাবাদ থেকে এসেছি," আমি বললাম।

"অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া এসেছেন কেন?" তিনি বললেন।

"খেলা দেখতে এসেছিলাম। অস্ট্রেলিয়ানরা খেলছে দেখে ভাবলাম কোন ব্র্যান্ড অ্যামব্যাসাডার খুঁজে পাব হয়ত।"

"অস্ট্রেলিয়ান কেন? ইন্ডিয়ানদের বানালে সমস্যা কি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, কিন্তু বোঝা গেল আমাদের উপরে বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করেছে তাদের। "ইন্ডিয়ান দলের জন্য অত সামর্থ্য নেই। ভাল খেলোয়াড়দের দাম অনেক চড়া। আর খারাপ খেলে যারা, আচ্ছা শোনেন, অজিত আগারকারের স্বাক্ষর দেওয়া একটা ব্যাট কিনবেন আপনারা?"

গার্ড মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। কানের কাছ থেকে ঝুলে থাকা একটা মাইক্রোফোনে কথা বলে আবার আমাদের দিকে মনোযোগ দিল সে। "আপনাদের একজন আমাদের সাথে থাকুন," সিকিউরিটি হেড বললেন।

"তাহলে ও থাকুক," অমির দিকে ইশারা ক'রে বললাম।

"আপনাদের সাথে একজন গার্ড থাকবে। আর এই বাচ্চা ছেলেটা? চলে যাবে?"

"ওহ্, হ্যা। ওতো ক্যাম্পেনে আছে। দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা কোচ আর ছাত্র এই থিম নিয়েই কাজ করছি।"

ক্যাঁচ ক্যাচ শব্দে গেটটা খুলে গেল। গার্ডরা এত বেশি আমাদের শরীর হাতড়ে চেক করল যে, নিগ্রহের পর্যায়ে পড়ে সেটা। এক সময় চেকিং শেষ হলে চটকদার লাল ফাইবার গ্লাসের সিটগুলোর ভিতর দিয়ে হেঁটে একটা খালি জায়গায় বসে পড়লাম। স্টেডিয়ামটা এখান থেকে সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। ইন্ডিয়ান ইনিংস শেষ হওয়ার পরে আমরা এসেছি। এখন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং চলছে।

"অমি ঠিক থাকবে তো?" ইশ ফিসফিস ক'রে বললে আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"অস্ট্রেলিয়ান দল আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকব আমরা, ঠিক আছে?" সিকিউরিটি গার্ডকে আমি বললাম। পাছে সে আবার সন্দেহ করে বসে। সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"আপনি কি গুজরাটের লোক?" ইশ তাকে জিজ্ঞেস করল।

"না," গার্ড বলল। তাকে দেখে বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে। যেন কোন গুজরাটি মেয়ে তাকে ছ্যাকা দিয়েছে।

"এই পাঁচ সারি পেছনে আস্তে ক'রে তাকিয়ে দ্যাখ," ইশ বলল।

আমি ফিরে দেখলাম ইন্ডিয়ান দলের পোশাক পরা মাথায় বারগুন্ডি পাগড়ি, এক অল্প বয়সী ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

"শরনদ্বীপ সিং, বারো নম্বর খেলোয়াড়। দুপুর বেলা হয়ত সে দলে ঢুকবে। গিয়ে হাত মেলাব নাকি?"

"পাগলামি করিস না। একবার সন্দেহ হলেই ধরা পড়ে যাবি। পাছায় লাথি দিয়ে এখান থেকে বের ক'রে দেবে," আমি বললাম।

"ওটা নেব?" সাদা পোশাক পরা ওয়েটার কোমল পানীয় নিয়ে একবার ঘুরে গেলে তাকে দেখে আলী প্রশ্নটা করল।

"মনে কর তুমি দুশ' কোটি রুপির কোম্পানির মালিক। যাও, গিয়ে নিয়ে আস, আলী," আমি বললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু পরেই আমরা সবাই লম্বা গ্লাসে ক'রে ফানটা খাচ্ছি। স্পন্সরদের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ।

আমাদের স্ট্যান্ডে গুঞ্জন উঠলে সবাই পেছন ফিরে দেখল, ড্রেসিং রুম থেকে হলুদ পোশাক পরা লোকজন বেরিয়ে আসছে। অস্ট্রেলিয় দলের সদস্যদের দেখে আমার হাত শক্ত ক'রে ধরে থাকল ইশ। তারা এসে আমাদের দু'সারি সামনে বসল।

"এ হচ্ছে স্টিভ ওয়াহ্, অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন," ইশ আমার কানে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল। তার মুখের কথায় হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

হ্যা-সূচক মাথা নেড়ে গভীর নিঃশ্বাস নিলাম। হ্যা, সবাই ওইখানে আছে– বেভান, লেম্যান, সাইমন্ডস, এমনকি ম্যাকগ্রাও। কিন্তু বিহ্বল ভক্তদের মত তাদের দিকে চেয়ে থাকার জন্য তো আর আমরা এখানে আসি নি। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আমাদের।

"ইশ ভাইয়া, ওই যে পন্টিং, প্যাড পরে আছে। একজনের পরেই," আলীর চিৎকারে আমার শান্ত শান্ত ভাব করার চেষ্টাটা নষ্ট হয়ে গেল।

কয়েকজন খেয়াল করল আমাদের। কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিল। যেহেতু আলী নিতান্তই এক বাচ্চা ছেলে। সত্যিকার ভিআইপি'রা তারকাদের সাথে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করলেও তাদের দেখে কখনও চেঁচিয়ে ওঠে না।

একটা শ্বেতাঙ্গ যুবক এল। তাকে অবশ্য চিনতে পারলাম না। আমাদের এক সারি সামনে বসে পড়ল সে। অস্টেলিয় দলের শার্ট পরে আছে। কিন্তু সাধারণ খাকি হাফ প্যান্ট পরা। কোঁকড়ানো চুল আর গাঢ় নীল চোখ। বয়স বিশের বেশি হবে না।

অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ছক্কা মারলে ভিআইপি'রা হাত তালি দিয়ে উঠল। সাধারণ গ্যালারিতে বিষাদগ্রস্ত নীরবতা বিরাজ করছে। ইশ বোলারকে গালাগালি দিতে চেয়েছিল কিন্তু বিবেকে বাধা দিল তাই চুপ ক'রেই থাকল সে।

অস্ট্রেলিয় দল হাই-ফাইভ করল ছক্কার মারার কারণে। সামনের কোঁকড়া চুলওয়ালা বালক আর পূর্ণবয়স্ক লোকের মাঝামাঝি বয়সী ছেলেটা মুষ্টি পাকাল। আলী পরপর তিনটা ফানটা খেয়ে শেষ ক'রে ফেলেছে।

"যা, কথা বল, আমার কাজ শেষ," ইশকে তাগাদা দিলাম আমি।

"কয়েক ওভার শেষে ম্যাচটা সেটল হোক, তখন যাব," ইশ বলল।

সত্তর করার পরে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট হেইডেন আউট হয়ে গেল। ভিআইপি গ্যালারিতে তুমুল করতালি। ক্রিজে যাওয়ার সময় দলের জন্য সদস্যরা হর্ষধ্বনি করতে লাগল। তিন বলেই শ্রীনাথের কাছে পন্টিং ধরা খেলো।

ইশ আর নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারল না। "হ্যা, এগিয়ে যাও, শ্রীনাথ। এগিয়ে যাও," আনন্দে বলে উঠল সে। ভিআইপি গ্যালারিতে নিম্ন-মধ্যবিত্তের উচ্ছ্বাস দেখে কিছু লোক বিরক্তি প্রকাশ করল চোখমুখ বিকৃত করে।

বেভান ইতিমধ্যে প্যাড পরে ফেলেছে। নিজের ইনিংসের শুরু করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে সে। কোঁকড়া চুলের বালক আর মাঝবয়সী ছেলেটা ইশের দিকে ফিরে তাকাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও ইন্ডিয়া। আমরা জিততে পারব। সিরিজ জেতা সম্ভব, এখন তো সিরিজ ২-২'এ ড্র আছে," ইশ আপন মনে বলে চলল।

ছেলেটা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে একটু সচেতন হয়ে উঠল ইশ।

"ঠিক আছে, তোমরাও ভালই খেলছো, ইয়ার!" সে বলল।

"দুঃখিত, আমরা..." আমি বললাম।

"আমার দল হলে আমিও তাই করতাম," সে বলল। কথা বলার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। দলের কারো ভাই-বেরাদর হবে হয়ত।

ইশের মনোযোগ পাওয়ার জন্য কনুই দিয়ে আলতোভাবে গুতো দিলাম তাকে।

"হাই," ইশ বলল, "আমি ইশান, গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে এসেছি আমরা। আর ও হল জুবিন। উইলসন স্পোর্টসের মালিক, এ হচ্ছে আলী।"

"তোমাদের সাথে পরিচিত হতে পেরে ভাল লাগল। হাই, আমি ফ্রেড, ফ্রেড লি।"

"আপনি কি দলে খেলেন?" ফ্রেডকে জিজ্ঞেস করলাম।

"এখন খেলছি না, পিঠে সমস্যা আছে। কিন্তু হ্যা, অস্ট্রেলিয়ার জন্য এক বছর আগেই খেলা শুরু করেছিলাম।"

"ব্যাটসম্যান?"

"বোলার, পেস বোলার," ফ্রেড উত্তরে জানাল।

"ফ্রেড, আমাদের একটু কথা বলা দরকার। এই ছেলেটাকে নিয়ে। সত্যিকার অর্থেই একটু কথা বলা দরকার," ইশ বলল। উত্তেজনায় নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে তার।

"অবশ্যই, বন্ধু। খেলা শেষ হলে আমি আসব," ফ্রেড লি বলেই দ্রুত সামনে এসে ইশের পাশে বসে পড়ল।

শ্বেতাঙ্গ কারো সাথে আমাদের দেখে স্বস্তি পেল সিকিউরিটি গার্ড। আর যাইহোক, আমরা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কেউ হব।

এক ঘণ্টার মধ্যে ইশ তার কাহিনী শেষ ক'রে ফেলল।

"আপনি কি চান ওকে টেস্ট করি? বন্ধু, আপনি বরং তাকে তার নির্বাচকদের বা এ ধরনের কারো কাছে নিয়ে গিয়ে দেখান।"

"বিশ্বাস করুন, ইন্ডিয়ান নির্বাচকরা যদি এত ভালভাবে কাজ করত তাহলে যে দেশের লোকসংখ্যা আমাদের এক পঞ্চমাংশ, তাদের কাছে এত বেশি খেলায় হারতাম না। কিছু মনে করবেন না আশা করি।"

"আমাদের দলকে হারানো কঠিন। এর কিছু কারণ আছে," ফ্রেড ধীরে ধীরে বলল।

"আচ্ছা, সেজন্যই তো চাইছি, আপনি তাকে একটু টেস্ট করেন। এই এক বছর ধরে আমি ওকে দেখাশোনা করেছি, এবং ক'রে যাবো। চব্বিশ ঘণ্টা ভ্রমণ ক'রে এসেছি আপনাদের দলের কারো সাথে দেখা করার জন্য কারণ আপনাদের উপরে আমার আস্থা আছে।"

"তাতেই বা কী হবে? আমি ভাল বললে কি কোন লাভ হবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি যদি বলেন ছেলেটার মাঝে বিশ্বমানের সম্ভাবনা আছে তাহলে আমি তাকে সেই অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রে দেব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। প্লিজ, তাকে কয়েকটা বল করুন।"

"বন্ধু, প্রত্যেকের জন্য এভাবে বল করলে দেখা যাবে..."

"আমি মিনতি ক'রে বলছি, ফ্রেড। স্পোর্টসম্যানের কাছে স্পোর্টসম্যানের মিনতি। কিংবা তার চাইতে বরং বলা ভাল, বড় স্পোর্টম্যানের কাছে নিতান্তই ক্ষুদ্র এক স্পোর্টম্যানের মিনতি।"

নিষ্পলক নীল চোখে ফ্রেড ইশের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমি আমার জেলার হয়েও খেলেছি। আরো বেশি এগোনোর কোন গাইড লাইন পাই নি," ইশ বলে চলল। "এই খেলার জন্যেই আমি পড়াশোনা বাদ দিয়ে বাবা-মা'র সাথে লড়াই করেছি, ক্যারিয়ারকে এক পাশে ফেলে রেখেছি। আমার কাছে এটাই সব। আপনার কাছে যারা আসবে তারা সবাই এরকম হবে না।"

ফ্রেড শুনে হাসল। "বন্ধু, তোমরা ইন্ডিয়ানরা এই আবেগগত বিষয়ে খুব দক্ষ। বিশ্বাস কর, আমিও এই খেলার জন্য অনেক কিছু বাদ দিয়েছি।"

"তার মানে আপনি রাজি হচ্ছেন?"

"চারটা বল, বেশি না। ম্যাচের পরে আশেপাশেই থাকবে," বলে নিজের সিটে গিয়ে লাফিয়ে বসল ফ্রেড লি। "আর আশা কর অস্ট্রেলিয়া যেন জেতে, তাহলে আমার মন মেজাজও ভাল থাকবে, আমিও আমার কথা রাখতে পারব।"

ইশের হাসি মিলিয়ে গেল। "সেটা তো আমি আশা করতে পারব না। ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু কামনা করতে পারব না আমি।"

"ঠাট্টা করেছি, বন্ধু। তোমরা আবেগ দেখাতে খুব পাকা..." ফ্রেড টিপে বলল।

অস্ট্রেলিয়ান ভাষার অর্ধেক কথাবার্তাই আমার বোঝার বাইরে। তারপরও আমরা হেসে ফেললাম।

"আমাদের বন্ধুকে ডাকেন, তাকে প্রয়োজন," দৃঢ়কণ্ঠে গার্ডকে বললাম।

দু'মিনিট পরে অমি আসল। তার এত পিপাসা পেয়েছে যে, এসেই আলীর হাতে থাকা পানীয়টা নিয়ে নিল।

"কী করছিলি তোরা? দু'ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা ক'রে আছি।"

"বন্ধুত্ব করছিলাম," অস্ট্রেলিয়া চার মারলে ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে কথাটা বললাম।

অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জিতে গেলেও অনুতাপ করার সময় ইশের রইল না। আলীকে যে এখনই প্যাড পরাতে হবে।

ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেলে আমরা আধ ঘণ্টা পর মাঠে এলাম।

"উনি পেস বোলার," ইশ আলীকে বলল, "হেলমেট লাগবে?" আলী মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পরে নাও," আলীর মাথায় হেলমেট পরিয়ে দিল ইশ।

"রেডি, বন্ধু?" বোলারের জায়গা থেকে ফ্রেড লি চেঁচেয়ে বলল।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল আলী। ইশ দাঁড়াল উইকেট কিপারের জায়গায়। মুখে হিংস্র ভাব ফুটিয়ে দশ পা দৌড়ে ফ্রেড লি তীব্র গতিতে বল করলে আলীর শরীর ঘেষে বলটা চলে গেল। বল ধরার জন্য পিছিয়ে গেল ইশ।

"কোন প্রতিভা আছে নাকি?" আবার বল করার জন্য দৌড়ানোর প্রস্তুতি নিতে নিতে ফ্রেড বলল।

"এ্যাই, কি হল আলী?" বলল ইশ।

"দেখতে পাচ্ছি না। বলটা সাদা। আর বিদেশী লোকটার চেহারা দেখে ভয় লাগছে।"

"চেহারার দিকে তাকিও না। বলের দিকে তাকাও।" হেলমেটটা খুলতে খুলতে ইশ বলল। বাউন্ডারির কালো স্ক্রিনটা ঠিক ক'রে দেয়ার জন্যে অমি দৌড়ে গেল।

দ্বিতীয় বলটা একেবারে পারফেক্ট ডেলিভারি দিল ফ্রেড লি। তবে এবার আলী আঘাত হানতে সক্ষম হল। ব্যাটে লেগে বলটা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোণে ঘুরে খুব নিচু দিয়ে সীমানার বাইরে চলে গেলে। ছক্কা!

"ব্লাডি হেল! এটা কিভাবে মারল?" বলল ফ্রেড।

"আরো দুটো বল," আমি বললাম। বুঝলাম ফ্রেডের মাথায় কী খেলছে। নিতান্তই একটা বাচ্চা ছেলে। তার কাছে অপদস্থ আর পরাজিত হওয়ার অনুভূতিটা শুরু হয়েছে মাত্র।

ফ্রেডের তৃতীয় বলে একটা চার আর শেষ বলে আবারও ছক্কা হল। প্রচণ্ড অপমানিত দেখাচ্ছে তার চেহারা। 'বন্ধু' কথাটা সে যতবারই বলে থাকুক না কেন, গলার ভঙ্গি এখন শান্ত থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে, সে এমন একটা লোক ক্রিকেট নিয়ে কোন আত্মপ্রত্যয় যার মাঝে নেই।

"কিভাবে করল ও," নিজের চুল টানতে টানতে বিড়বিড় ক'রে বলল ফ্রেড লি।

আলীর দিকে তাকালাম আমরা। পিচে বসে পড়ে মাথা ধরে আছে সে।

"ঠিক আছ তো?" ইশ জানতে চাইল। আলী ক্লান্ত বোধ করছে এখন।

"কী হল?" ফ্রেডও জানতে চাইল।

"বেশি ফোকাস করলে ক্লান্ত হয়ে যায় সে। বড় কয়েকটা হিট করার পরে একটু পুষিয়ে নেওয়ার দরকার হয়। এলাকায় ওকে পুরো ইনিংস খেলা শিখিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজকে..."

"এতটা ভ্রমণ ক'রে এসেছে সেই ক্লান্তি। আর শেতাঙ্গ মানুষের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেছে সে।"

"এটা তাকে মোকাবেলা করতেই হবে," ইশ বলল। আলীর প্যাড খুলে ফেলার জন্য নিচু হল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যা, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আর প্রশিক্ষণ দরকার। তাহলে আরো ভাল করবে," বলল ফ্রেড।

"আপনার তাই মনে হয়?"

"এটাই ফ্রেডের রায়।"

"আপনারা একটু অপেক্ষা করেন, আমি একটা কল করব," বলে ফ্রেড তার মুঠোফোনে একটা নম্বর ডায়াল করার জন্য দূরে সরে গেল। ফ্রেডের কথা শুনতে পেলাম না। কিন্তু দশ মিনিট ধরে প্রাণবন্ত কথোপকথন চালিয়ে আমাদের কাছে ফিরে এল।

"ধন্যবাদ, ফ্রেড," ইশ বলল। তার চেহারায় গর্বের ছাপ দেখতে পাচ্ছি।

"তোমরা ওকে অস্ট্রেলিয়ায় কিছু দিনের জন্য নিয়ে আসছ না কেন? আমার একাডেমিতে থেকেই প্র্যাকটিস করুক," ফ্রেড এমনভাবে নিমন্ত্রণ দিল যেন অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়াটা নবরংপুরে অটো নিয়ে যাওয়ার মতই সহজ কোন ব্যাপার।

"সত্যি?" ইশ বলল।

হ্যা, বেশ ভালই বলেছেন, মনে মনে ভাবলাম আমি। গোয়ায় আসার জন্য কষ্ট ক'রে সেকেন্ড ক্লাস টিকিট জোগার করেছি। টাকা বাঁচানোর জন্য ওই রাতেই আবার ফিরে যাচ্ছি। অথচ ইশ কিনা এখন অস্ট্রেলিয়ায় যেতে চাইছে!

"আমরা যেতে পারব না, ফ্রেড," মাঝখান থেকে আমি বললাম।

"কেন?" ফ্রেড জিজ্ঞেস করল।

"আমাদের অতো সামর্থ্য নেই। আমার কোন ক্রিকেটের ব্যবসা নেই।"

"কী?"

"ছোট্ট একটা ক্রিকেটের দোকান চালাই আমরা। আপনাদের কাছে এই উদ্দেশ্যে আসার জন্য মিথ্যে বলেছি।"

পরিস্থিতি টান টান হয়ে গেল।

"হলি মলি," ফ্রেড হেসে বলল। "তোমরা খুব চালাক। যাইহোক, তোমাদের ইন্ডিয়ান দলের খেলোয়াড়দের মত আমি অতো ধনী নই। কাজেই বুঝতেই পারছ। কিন্তু ধরা পড়লে তোমরা তো ঝামেলায় পড়ে যেতে।"

"সেরা কাউকে দিয়ে আলীকে একটু বাজিয়ে নিয়ে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম আর কি," ইশ বলল।

"তাহলে তাকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা কর। কালকে ইন্ডিয়া ছাড়ছি আমি। তোমাদের ব্যবসাটা কত বড়?"

"খুবই ছোট খাট," ইশ বলল,"আর টিকেটের দাম তো অনেক।"

"আচ্ছা, আমার এক সাবেক বান্ধবী কোয়ান্টাস-এ কাজ করে। দেখি কী করা যায়," আমরা ফিরে আসার সময় ফ্রেড বলল। "শুধু ইশ আর আলী, ঠিক আছে?"

"একদম ঠিক আছে," আমি তাড়াতাড়ি বললাম।

"না, আমরা পার্টনার, ফ্রেড। হয় সবাই একসাথে আসব নয়ত আসব না। আমাদের চারটা টিকিট দরকার," ইশ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দাঁড়াও," বলে ফ্রেড আরেকটা কল করতে গেল।

"ঠিক আছে," কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল ফ্রেড, "চারটা টিকেটের ব্যবস্থা করতে পারব।"

"ওয়াও," ইশ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল। "দেখেছ আলী, তোমার জন্যেই এটা হল।"

কথাটা শুনে হেসে ফেলল আলী।

"কিন্তু জুলাই মাসে গেলে ভাল হয়," ফ্রেড বলল। "তখন অস্ট্রেলিয়ায় শীতকাল আর টিকিটও খুব সস্তায় পাওয়া যায়।"

"জুলাইতেই যাব তাহলে," আমি বললাম। "গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা আসতে পারব না। তখন বিক্রির জন্য ভরা মওসুম।"

টিকিট ছাড়াও পাসপোর্ট, ভিসা আর ভ্রমণের সময় থাকার খরচ আছে, সেটাই ভাবলাম। এতসব কাজে কিছু সময় তো বের করা দরকার। একাজ করতেই হবে এমন কথা নেই। কিন্তু রোজ রোজ তো আর বিদেশে যাওয়া হবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১২

"এখানে কিছু পুরনো জিনিসপত্র আছে। কিন্তু তোমাদের দোকানের জন্য খুব মানাবে," একটা জীর্ণশীর্ন গুদাম ঘরের দরজা খুলতে খুলতে মামা বললেন।

বহু বছর পরে এই প্রথম ঘরটাতে সূর্যের আলো প্রবেশ করল। টলতে টলতে দ্রুত চলে গেল দুটো ইঁদুর। খালি চটের ব্যাগ, ইটের স্তূপ আর রাজমিস্ত্রির কাজের পরিত্যক্ত জিনিস ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

"সব কিছু গোছগাছ করতে কয়েক সপ্তাহ লাগবে। ছাদে ছয়টা লাইট লাগবে, অমি," আমি বললাম।

"পনের ফুট বাই পনের ফুট। ভাল সাইজ," মামা বললেন।

"মামা, এর জন্য কত ভাড়া দিতে হবে?" বললাম আমি।

পাইকারী ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত ছিল আমার। পুরো নিশ্চিত ছিলাম যে, সাম্প্রতিক ক্রিকেট সিরিজের কারণে চাহিদা একেবারে শীর্ষে উঠে যাবে। ধার ক'রে জিনিসপত্র নিতে পারলে টাকা কামানো যাবে।

"গাধা। বাবা কখনও ছেলের কাছ থেকে ভাড়া নেয় না," মামা বললেন।

এই ধরনের উপকার আমি ঘৃণা করি। ভেবেছিলাম গুদাম ঘরের ভাড়াটা দোকানের ভাড়ার অর্ধেক হবে। খুচরা বিক্রির উপযোগী ক'রে তোলার জন্য এর কোন সম্মুখভাগ নেই।

"আর ছেলেদের কথা বলতেই মনে পড়ে গেল। আমি চাই আজই তোমরা আমার ছেলের সাথে দেখা কর," বলে মামা চিৎকার দিতে লাগলেন, "ধীরাজ, ধীরাজ।" ধীরাজ মামার চৌদ্দ বছরের ছেলে। মন্দির প্রাঙ্গন থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে এল সে। তার পরনে স্পাইডারম্যান টি-শার্ট আর জিন্স। হাতে রয়েছে সিঁদুর এবং একটা প্লেটে চন্দন বাটা। জামা কাপড়ের ঢঙের সাথে হাতের পাত্রের জিনিসের দারুণ বৈপরীত্য।

"বাবা, এই যে তোমাকে একটা তিলক দিয়ে দিই," ধীরাজ বলল।

ধীরাজ মামার কপালে একটা তিলক দিয়ে দিল। "তোমার দাদাদের সাথে পরিচয় হও," মামা বললেন, "গোবিন্দ, ইশান আর অবশ্যই অমি।"

"হাই," আমি বললাম।

"আপনারা ক্রিকেট দোকানের মালি না? আমি ক্রিকেট খুব ভালবাসি।" ছেলেটার গলা বয়ঃসন্ধিতে পড়ে মাত্র ভাঙতে শুরু করেছে।

"ও অনেক ছোট, তারপরও স্কুল শেষে আমার ক্যাম্পেনে কাজ করে," মামা গর্ব ক'রে বললেন। "অযোধ্যায় এরই মধ্যে দু'বার যাওয়া হয়ে গেছে। তোমার দাদাদেরও তিলক দিয়ে দাও, বাবা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরাজ আমাদের কপালেও তিলক দিয়ে দিল। "আমি পূজা শেষ করব। ইশ ভাইয়া, আপনি একদিন আমাকে ক্রিকেট টিপস দেবেন।"

"অবশ্যই দেবে..." মামা বললেন।

"ইলেকশনের আর মাত্র ছ'মাস বাকি। কয়েক মাসের মধ্যেই র‍্যালি শুরু হয়ে যাবে। পারেখজিকে দেখিয়ে দিতে হবে সাংঘাতিক কাজ করতে পারি আমি।"

দশটা একশ' রুপির নোট বের ক'রে মামার হাতে দিলাম আমি।

"গুদাম ঘরের জন্য ভাড়া, মামা," বললাম তাকে।

"রেখে দাও," তিনি বললেন।

"না বলবেন না, মামা। আমি এরই মধ্যে আপনার কাছে অনেক ঋণী হয়ে পড়েছি। ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছে। আপনার ঋণও তাড়াতাড়ি শোধ ক'রে দেব," বললাম আমি।

*

"হ্যালো পণ্ডিতজি, শুনতে পাচ্ছেন?" আমি বললাম। গুদামঘর খোলার এক মাস পরে পণ্ডিতজির কাছ থেকে একটা কল পেলাম। মন্দিরের ঘণ্টার কারণে কথা বলা কঠিন হয়ে গেল। তার গলা শোনার জন্য সেই ভয়ংকর মোবাইল লাইনে কান খাড়া করে রাখতে হচ্ছে।

"আমার যথেষ্ট হয়েছে, গোবিন্দ। এবার আমার মেয়েটাকে বিয়ে দেব। কাশ্মীরে ফিরে যাব আমরা।"

"আমি জানি পণ্ডিতজি," বললাম তাকে। এক ডজনবার এই গল্প তিনি আমাকে শুনিয়েছেন।

"হ্যা, কিন্তু গত সপ্তায় ভারি সুন্দর একটা পরিবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল। দু'ছেলে আছে ওদের। দু'জনই লন্ডনেই স্থায়ীভাবে থাকে। তারা আমার দু'মেয়েকেই নিতে চায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা ক'রে ফেলতে চাইছি।"

"এক অনুষ্ঠানেই?"

"হ্যা, খরচ কত বাঁচবে, চিন্তা করেন। কিন্তু একটা অনুষ্ঠানে করলেও তারা খুব জাকজমক অনষ্ঠান চায়। গুদামঘরটা আমি বেঁচে দিয়েছি, কিন্তু জিনিসপত্র কেনার জন্যে তো' কাউকে দরকার।"

"মালপত্রের দাম কত হবে?"

"বিক্রির দাম দু'লাখ। এর থেকে আপনাদের মত খুচরা ব্যবসায়ীরা নিয়েছে শতকরা বিশ ভাগ লাভ আর আমি রেখেছি দশ ভাগ। আসল দাম হচ্ছে পুরোপুরি এক লাখ চল্লিশ হাজার।"

"আমি এক লাখে নিতে রাজি আছি," তৎক্ষণাত কথাটা তাকে বললে ইশ আর অমি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। কী পাগলা পরিকল্পনা করছি আমি এখন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এক লাখ চল্লিশ হাজার হচ্ছে কেনা দাম। এখন এটা আমার কাছ থেকে লোকসানে কিনতে চান?"

"আমি সব কিছুই কিনব।"

"পরের মাসের মধ্যে টাকা দিয়ে দিলে এক লাখ দশে নিতে পারেন," পণ্ডিতজি বললেন।

"এক লাখ। বললাম তো, এর বেশি পারব না," দৃঢ় কণ্ঠে বললাম তাকে।

"মালপত্র নিতে পারবেন কখন? গুদামঘর যে কিনেছে তার আগে জায়গা দরকার," পণ্ডিতজি বললেন।

"আজই," আমি বললাম।

পরে যখন ইশ আর অমিকে এটার কথা বললাম, চিন্তায় তাদের কপালে ভাঁজ পড়ে গেল। আমি সোনার খনির ব্যবসা দেখতে পেলাম। সর্বশেষ যে সিরিজটা হয়ে গেল তাতে ইন্ডিয়ার পারফরম্যান্স খুব ভাল। কয়েক সপ্তাহেই গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হবে। এর সবগুলো বিক্রি হলে দ্বিগুণ টাকা আয় হবে আমাদের।

"তুই কী করছিস জানিস তো, নাকি?" ইশের মধ্যে সন্দেহ আছে।

তার দিকে তাকালাম। আমার ঝুঁকিতেই একবার সে ফাঁদে পড়েছে। তারপরও কথা থাকে, ঝুঁকি না নিয়ে তো আর ব্যবসা করা চলে না।

"হ্যা, জানি। তোরা আমাকে বিশ্বাস করিস?"

"অবশ্যই," সে বলল, "কিন্তু তার মেয়ে?"

"কী?" হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"তাকে নিয়ে তোর একটা ব্যাপার আছে না," ইশ আমাকে মনে করিয়ে দিল।

"ওহ্," বলে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম আমি। কাকে নিয়ে কার কি ব্যাপার আছে তোর কোন ধারণাই নেই রে ভাইয়া আমার, ভাবলাম আমি।

*

পরের তিন মাসে বিক্রি-বাট্টা যেন বিস্ফোরিত হয়ে গেল। মে আর জুনে ইন্ডিয়ার প্রতিটি বাচ্চা ক্রিকেট খেলে। ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া সিরিজকে বিশেষজ্ঞরা ঐতিহাসিক বলেছেন। আসল ম্যাচগুলো যখন হয়েছে তখন অনেকেরই পরীক্ষা চলছিল।

"হরভজন কি এভাবে বল ধরে?" সাত বছর বয়সী একটা ছেলে ছোট মুঠির ভেতরে বল ধরার চেষ্টা করতে করতে বলল।

"লক্ষ্মণ আর আমার ব্যাটিং স্টাইল একদম একরকম," পার্কে আরেকটা ছেলে বলল কথাটা।

মন্দিরের দোকানে খদ্দের তিনগুণ হয়ে গেছে। পাইকারী ব্যবসা ক'রে বেশ ভালই ফল পাওয়া গেল। খুচরা বিক্রেতাদের ডাক আর থামে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী? পণ্ডিতজি কাশ্মিরে ফিরে যাচ্ছেন? যাইহোক, সিটি মল স্পোর্টস শপের দু'বাক্স বল?" একজন বলল।

"পণ্ডিতজির ব্যবসাটা আমিই নিয়ে নিয়েছি। আমাদের ডাকলে দু'ঘণ্টায় ডেলিভারি দিয়ে দিই," স্যাটেলাইটের আরেকটা বড় দোকানিকে বললাম।

"না, শুধু নগদে হবে। আহমেদাবাদে কোন ভাল মানের স্টক নেই। এখন চাইলে এখনই টাকা দিতে হবে," এক লোক ধারে কিনতে চাইলে তাকে বললাম।

নগদ টাকার হিসেব রাখি আমি, ডেলিভারি দেয় অমি আর ইশ দোকান চালায়। স্কুল আবার খুলে গেছে, ফলে মাসিক সাপ্লাইয়ের ব্যবসাটাও সে দেখাশুনা করে। এখন আমরা চারটা স্কুলে সাপ্লাই দিই। ১৫ই আগস্ট জাতীয় ছুটির দিনেই শুধু আমরা দোকান বন্ধ রাখি।

"আমাদের ঘুড়ি রাখা উচিত ছিল। আকাশে দ্যাখ। সহজে টাকা আয়ের উপায়," টাকা গুণতে গুণতে বললাম।

"তাড়াতাড়ি টাকা গোনার কাজ শেষ কর," অমি বলল। "মামা চারটার মধ্যে যেতে বলেছেন।"

স্বাধীনতা দিবসে একটা র‍্যালির পরিকল্পনা ক'রে রেখেছেন মামা। একই দিনে আলীর বাবা তার দলের প্রার্থীর জন্য বক্তৃতার পরিকল্পনা ক'রে রেখেছেন। তারচেয়েও বড় কথা হচ্ছে, দুটো র‍্যালিই একই জায়গায়। নানা পার্কের উল্টো দিকের রাস্তার মোড়ে।

"চারটার মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব। কিন্তু গত চার মাসে আমাদের কী লাভ হল সেটা ভাব," দু'জনেরই মুখোমুখি হলাম আমি।

দু'জনেই কাঁধ ঝাঁকাল।

"সত্তর হাজার," আমি বললাম।

"সত্তর কী?" ইশ বলল।

"হ্যা, ওটাই। ওর থেকে চল্লিশ হাজার আবার ঋণ শোধ করতে খরচ হয়ে যাবে। বাকি তিরিশ আমাদের," বলে তাদের প্রত্যেকের কাছে এক তোড়া নোট দিয়ে দিলাম।

"এই টাকাটা কীভাবে ভাগ হবে, সে সিদ্ধান্ত কে নেবে?" ইশ বলল।

"আমি, কোন সমস্যা আছে?" বললাম তাকে। বুঝলাম কড়াভাবে কথাটা বলে ফেলেছি।

"না। তাহলে আমাদের কতটুকু ঋণ বাকি আছে?"

"সুদ হিসেব করলে আর মাত্র বিশ হাজার বাকি। বছর শেষে সব শোধ হয়ে যাবে," বলে সিন্দুকে তালা লাগিয়ে শার্টের পকেটে চাবিটা রেখে গুদাম ঘরে কী কী জিনিস স্তুপ করা আছে দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

"এই গোবিন্দ," আমার হাত নিচে টানতে টানতে ইশ বলল।

"কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অস্ট্রেলিয়া," সে বলল।

"দ্যাখ, এই নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। ফ্রেডের সাথে দেখা হওয়াটা দারুণ। আলীর দক্ষতাও ভাল। কিন্তু প্রত্যেকের জন্যে ভিসার খরচ তিন হাজার রুপি ক'রে লাগবে।"

"ফ্রেড তো টিকেট দিচ্ছে," ইশ বলল।

"কিন্তু তারপরেও তো আমাদের অনেক খরচ হবে। আমার মনে হয়, একেক জনের জন্য কমপক্ষে দশ হাজার। তার মানে আমাদের চার জনের জন্য চল্লিশ হাজার," আমি বললাম। যাওয়ার ইচ্ছে আমারও আছে। কিন্তু আনন্দ ফূর্তিতে এত খরচের সামর্থ্য আমার নেই।

"এই নে দশ হাজার," বলে ইশ টাকার তোড়াটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল, "আস্ট্রেলিয়া তহবিলের জন্য আমার চাঁদা।"

ইশ আর অমির দিকে তাকালাম আমি।

ওরা হচ্ছে পাগলা, কঠিন পাগলা।

"এই টাকা বাড়ি নিয়ে গিয়ে তোর বাবার কাছে টাকার তোড়াটা দিয়ে দে। তোর এটাই করা দরকার।"

"এতে ক'রে বাবা শুধু আমাকে গালাগাল করার জন্য আরেকটা কারণ খুঁজে পাবে," ইশ বলল।

"আমারটা এই," অমিও তার তোড়াটা ছুঁড়ে দিল।

"আহ্ অমি," আমি বললাম।

"আমি টাকার জন্য কাজ করি না। আমি তোদের সাথে আছিআমাকে যেন পুরোহিত হতে না হয় সেজন্যে। আমার কাছে এই-ই যথেষ্ট।"

"আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা ব্যবসার কাজে জমিয়ে রাখি আর..." সাথে সাথে আমার কথায় বাধা পড়ল।

"না, এই টাকাটা কেবলমাত্র অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার জন্য।"

"ব্যবসাটা মাত্র জমতে শুরু করেছে, উফ!" বলেই আমি আমার বান্ডিলটাও বাড়িয়ে দিলাম।

"তাহলে তো হয়েই গেল," বলল ইশ, "তিরিশ হাজারের বিশাল অঙ্কের টাকা যোগাড় হয়ে গেল আমাদের। এখন যদি তুই ঋণ শোধ না করিস তবে আর কোন সমস্যা থাকে না।"

"অসম্ভব, ইশ। ঋণ শোধ করতেই হবে।"

"শোধ করব কিন্তু পরে," বলল ইশ।

"ইশ, তুই কথা শুনিস না। শেষ পর্যন্ত অন্যান্য খরচ যদি বেশি হয়ে যায়?"

"যতটা সম্ভব কম খরচ করব আমরা। ওখানে থাকার সময় যথেষ্ট টেপলা আর খাকরা নিয়ে যাব। থাকার আয়োজন করবে ফ্রেড। ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখ। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটেল দল," ইশ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। আর্থিক ব্যাপারে আনাড়ী আমার শরীকরা আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন তারা বাচ্চা ছেলে, ক্যান্ডি খেতে চাইছে।

"ঠিক আছে। শালার ট্রাভেল এজেন্টটা কে, দেখি তার সাথে কতটুকু দরকষাকষি করা যায়," বললাম তাদেরকে।

"এই তো হয়ে গেল," এজেন্টের নম্বরে ডায়াল করতে করতে বলল ইশ।

"এক সপ্তাহ, এর বেশি দিন থাকতে পারব না। আর একেকটা দিনের জন্য ওখানে খরচ অনেক বেশি," ফোনটা হাতে নিতে নিতে বললাম।

অমি ফোনটার সংযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিল। "পরে করব। চল, এখন নানা পার্কে যেতে হবে," বলল অমি।

*

"দু'বার। অযোধ্যার সেই জায়গায় দু'বার খোঁড়াখুঁড়ি করেছে তারা," মামা দুটো আঙুল উঁচু ক'রে বললেন।

তার কথায় প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কথার জোরের কারণে যতটা তার চেয়ে বেশি খারাপ মানের লাউড স্পিকারের জন্যে। প্রথম সারিতে এক মাথায় ইশ আর আমি বসে পড়লাম। অমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে রইল। দলের একটা তকমা লাগিয়ে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে সে। যদিও তাকে দেখে ভবঘুরে ছোকরার মতই লাগছে। তার কাজের মধ্যে পড়ে মঞ্চে বসে থাকা প্রত্যেকের জন্য ডিনারেল ওয়াটারের ব্যবস্থা করা।

মামা প্রচারের কাজটা ভালই করছেন। দুশ' লোক জমায়েত হয়েছে। এলাকায় সমাবেশের জন্য খারাপ না। প্রার্থী হাসমুখজি রাজ্যের রাজনীতির প্রবীণ ব্যক্তিত্ব এবং পারেখজির দীর্ঘসময়ের সহযোগী। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে বসে আছেন তিনি। হাসমুখজির বক্তৃতার আগে মামা পাঁচ মিনিট মাইকে কথা বলার খ্যাতিটা উপভোগ করছেন বেশ।

"সেই ১৯৭৮ সালের দিকে সরকারের নিজের সংস্থা আর্কিয়োলজি সার্ভে অব ইন্ডিয়া মন্দিরের সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ সরকার সেটা লুকিয়ে ফেলে। তারপর ১৯৯২'তে আমাদের প্রিয় করসেবকদের দেয়াল ভেঙে ফেলতে বাধ্য করা হয়। তারাও কিছু নিদর্শন খুঁজে পেয়েছিল সেখানে।"

মামার এক একটা কথা শেষ হয় আর থেমে থেমে ইশ আঙুল মটকায়।

"তারা হরি-বিষ্ণুর খোদাই করা মূর্তি খুঁজে পায়। তাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, অতীতে এখানে একটা মন্দির ছিল। কিন্তু সেকুলার দল এই খবরটারও কবর দিয়েছে। করসেবকদের দিকে মনোযোগ সরিয়ে বলেছে, তারা নাকি ধ্বংযজ্ঞ চালিয়েছে। কিন্তু যে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেল তার কী হবে? ইন্ডিয়ায় হিন্দুরা কি সুবিচার দাবি করতে পারে নাকি পারে না? সুবিচারের জন্য কোথায় যাব আমরা? আমেরিকায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামা মঞ্চ থেকে নামার পরে সবাই হাততালি দিল। মামারও প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি ভাবলাম।

হাসুমুখজি মাইকের কাছে এলেন। তিনবার গায়ত্রী মন্ত্র পড়ার জন্য সবাইকে চোখে বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন তিনি। বললেই সবাই এই কাজটা করে। সামনে বসে থাকা লোকজনও তাই করল। কোন কথা বলার আগেই হাসমুখজিকে পছন্দ হয়ে গেল তাদের।

মঞ্চ থেকে নেমে আমার কাছে এল অমি। "গোবিন্দ, মামা চাচ্ছে তুই আলীর বাবার র‍্যালির উপরে গোপনে নজরদারি কর। আর ইশ, তুই মঞ্চের পেছনের দিকটাতে আসতে পারবি? জল খাবারগুলো ভাগ ক'রে দিতে হবে।"

"কিন্তু কেন?" আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

"মামাকে সাহায্য করার জন্য কথা দিয়েছিলি, মনে আছে?" অমি বলল। মৃদু বাতাসে তার রেশমী তকমাটা উড়ছে।

হেটে পার্কের অন্য দিকটাতে যে র‍্যালি হচ্ছে, সেখানটাতে গেলাম। এখানকার সাজসজ্জায় গেরুয়া রঙ কম, সাদা রঙই বেশি।

"গুজরাট মেধাবী লোকদের জায়গা," আলীর বাবা বক্তৃতা দিচ্ছেন। "তারা জানে, রাজনীতি এবং ধর্ম আলাদা জিনিস।"

শেষ সারিতে একটা জায়গায় বসে জনতার উপরে চোখ রাখছি। মামার সভায় শতভাগ লোকই হিন্দু। এখানে তা নয়। এখানে মিশ্র। মামা যে রকম বলেছেন, সে অনুযায়ী সেকুলার পার্টি যদি মুসলমানদের পক্ষেই বেশি থাকে, তাহলে এখানে এত হিন্দু বসে আছে কেন?

"যেসব ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তারা নিজেদের সময়ে রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন। সত্যিকারভাবেই ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে হলে ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে হবে। ধর্ম যার যার, রাজনীতি সবার," আলীর বাবা বললেন।

"আপনি কি দলের সদস্য?" কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল।

না-সূচক মাথা নাড়লাম। বুঝলাম সে হিন্দু। "আপনি?" বললাম তাকে।

"হ্যা, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে," সে বলল। আলীর বাবা আসল প্রার্থী গুলাম জিয়ানকে মঞ্চে আহ্বান করলেন। সত্তর বয়সী লোকটা কথা বলা শুরু করলে মাইক্রোফোনগুলো বন্ধ হয়ে গেল। জনতার মাঝে গুঞ্জন উঠল, বিদ্যুৎ চলে গেছে নাকি? না, নিজস্ব জেনারেটর তো রাখা হয়েছে এখানে।

"এটা অন্তর্ঘাত। হিন্দু পার্টি এটা করেছে," ভীড়ের ভেতর থেকে একজন বললে উদ্বেগে বাতাস ভারি হয়ে এল। ভাবলাম দৌড়ে গিয়ে মামাকে সতর্ক ক'রে দেব কিনা।

"চলে এসেছে, আগত মহিলা ও পুরুষগণ, দয়া ক'রে বসে পড়ুন। ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে," হাত জোড় ক'রে আলীর বাবা মঞ্চে এলেন। ফ্যানগুলো আবার ভো-ভো ক'রে ঘুরতে শুরু করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিম্পাঞ্জিদের চুমু খাওয়া আর মীমাংসা ক'রে ফেলার ব্যাপারটা মনে পড়ল। কিন্তু এখানে ঠিক কোন চুমোচুমি নেই। শুধু চেয়ারগুলো আছে। প্রতিবার ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে এগুলো ছুঁড়ে মারা যায়।

বাইরে চলে এসে এক ট্রাভেল এজেন্টের সাথে দেখা করলাম। "অস্ট্রেলিয়ায় চারটা ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাই আমরা। দাম বুঝেসুঝে বলেন।"

গুলাম জিয়ানের বক্তৃতার সময় ফিরে এলাম আবার। আলীর বাবা আমাকে চিনতে পেরে কাছে এলেন, "ইনায়েত, গোবিন্দ ভাই। এখানে আসার কী কারণ? স্বাগতম, স্বাগতম আপনাকে।"

"আপনি বেশ ভাল বলেন। ইশ আলীকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে, জানেন কিছু?" আমি বললাম।

"সে বলেছে আমাকে, ইনশাল্লাহ আপনারা যাবেন। আলী প্রতিদিন অন্তত দশবার তার ইশান ভাইয়ের নাম নেয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার চাইতে ইশান ভাই-ই তার বেশি কাছের। ও-ই তার বাবা। গোয়া, অস্ট্রেলিয়া, তাকে কখনও যেতে বাধা দেই নি। সে এখানে আসি নি কেন?"

"না, মানে সে আর অমি তো... "

"অন্য র‍্যালিতে, তাই তো? চিন্তার কিছু নেই, আমি বুঝি। যার যার পছন্দ।"

"আমি একজন ব্যবসায়ী। রাজনীতিতে কোন আগ্রহ আমার নেই," বললাম তাকে। "আসলে আমাকে এখন যেতে হবে।"

আমার সাথে সাথে কয়েক পা হেঁটে এলন তিনি। "আমি ইশান ভাইয়ের সাথে দেখা করব, তাকে হাই-হ্যালো করার জন্যে আর কি।"

তাকে বলতে চাইলাম, মামার র‍্যালিতে আসার আইডিয়া তার জন্য ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে। রাজনীতি তার কাছে অবসর বিনোদন হতে পারে, মামার কাছে এটা জীবন-মরণ ব্যাপার। মামার র‍্যালির দিকে হেটে যাচ্ছি আমরা। কোন কথা বললাম না আমি।

হাসমুখজি তখনও মঞ্চে খুব হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছেন। "বুকে হাত দিয়ে দেখেন। কী মনে হয়? হিন্দু হিসেবে ভুল করেন নি? হাজার হাজার বছর আগে আমাদের যদি সেরা সংস্কৃতি এবং প্রশাসন থেকে থাকে, এখন কেন নেই?"

মামা মঞ্চ থেকে আমাদের দেখতে পেয়েই আঙুল তুলে ইশারা করলেন। ভীড়ের ভেতর থেকে কিছু লোক আমার এবং আলীর বাবার দিকে তাকাল।

"এ্যাই, এ লোকটা কে?" বলল দলের এক কর্মী।

জনতা আমাদের দুয়োধ্বনি দিল। আলীর বাবার দাঁড়ি খুবই বেমানান লাগছে এখানে।

"এখান থেকে চলে যা, বিশ্বাস ঘাতক," ভিড়ের মাঝখান থেকে একজন বলল। "ওকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার," আরেকজন তা দিল উৎসাহী হয়ে। হাসমুখজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলা থামালেন। ভাগ্য ভাল, তিনি শান্ত আছেন। মামা আর হাসমুখজিকে অভিবাদন জানানোর জন্য হাত তুললেন আলীর বাবা।

"আলীর আব্বা, চলে যান," তার দিকে না তাকিয়েই বিড়বিড় ক'রে বললাম।

অমি দৌড়াতে দৌড়াতে আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে ফেলল। "কী করছিস তুই? তোকে গোয়েন্দাগিরির জন্য পাঠালাম আর তুই কিনা আরেকটা গোয়েন্দা নিয়ে এসেছিস এখানে?"

আলীর বাবা অমির কথা শুনতে পেয়ে আমার দিকে তাকালেন। না-সূচক মাথা নাড়লাম আমি। একটা সবজান্তার হাসি দিলেন আমার দিকে তাকিয়ে। তারপর চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

"এসব বালের গোয়েন্দাগিরি আমি পরোয়া করি না," চেঁচিয়ে জবাব দিলাম। সন্দেহ হল তিনি বোধহয় শুনতে পেলেন কথাটা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৩

"প্রথমবার গোয়া, এবার অস্ট্রেলিয়া। কী ব্যবসা করেন আপনারা?" বিদ্যা জানতে চাইল। নতুন যে এক রুপির কয়েন বেরিয়েছে তার চোখের আকারও ওরকম হয়ে আছে।

"ইশ ফ্রেডকে চিঠি লিখেছিল। ফ্রেডও তার কথা রেখেছে। ডাকে টিকিট পেয়েছি আমরা," বললাম তাকে। ক্লাস শেষ ক'রে ফেলেছি আমরা। এরপরে অনেকটা সময় অনপুস্থিত থাকব। সেই কথাই তাকে বলতে চাইছি।

"তাহলে কোন্ দু'জন যাচ্ছে?" বলল সে।

"দু'জন না, চারজন। আলী এবং আমরা তিনজন," বললাম আমি।

"ভিখিরির ভাগ্য," হেসে বলল সে।

"তার মানে, দশদিন আমি দূরে থাকব। তবে তোমার বই দূরে থাকবে না। বিদ্যা, আমার সব ছাত্র-ছাত্রিই ভাল রেজাল্ট করে। আমাকে ডুবিয়ো না।"

"আপনিও আমাকে ডুবিয়েন না," সে বলল।

"আমি কিভাবে তোমাকে ডোবাব?"

"না, কিছু না। তাহলে অস্ট্রেলিয়ায় কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?"

"সিডনি। ফ্রেড তো ওখানকারই লোক। আলী তার অ্যাকাডেমিতে এক সপ্তাহ প্র্যাকটিস করবে। তোমার দাদা কোন কিছুতে একবার মন লাগালে সত্যিই অনেক দূর যায় সে।"

"আমি আবার অন্য রকম। আমি ফোকাস করতে পারি না। নিশ্চিত মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করব। কলেজেও এই বাড়িতেই পড়ে থাকতে হবে। তারপর গুজরাটের কোন ব্যাকওয়ার্ড জায়গায় আরেকটা নরকে বিয়ে হবে।"

"গুজরাট ব্যাকওয়ার্ড না," প্রতিবাদ জানালাম আমি।

"হয়ত আমিই বেশি ফরোয়ার্ড।"

চোখে চোখ পড়ল। ঔদ্ধত্যের কোন ভর্তি পরীক্ষা হলে বিদ্যা তাতে সহজে টপকে যাবে। তার গাইড বইগুলো খুললাম।

"পড়াশোনা এত বিরক্তিকর কেন? জীবনে কিছু হওয়ার জন্য এত নীরস একটা জিনিস কেন করতে হবে?"

"বিদ্যা, দার্শনিক প্রশ্ন করবে না। গাণিতিক প্রশ্ন হলে কর," বলে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

"অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার জন্য কিছু নিয়ে আসবেন না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার দাদাকে বল। তুমি যা চাও সে তাই-ই নিয়ে আসবে।" বইগুলো আবার স্তূপ ক'রে রাখলাম। যতটুকু দরকার তার চেয়ে কোনভাবেই বেশি টাকা খরচ করব না আমি। "যাহোক, আমাদের বাজেট খুব কম," আমি বুঝিয়ে বললাম, যেন বুঝতে পেরেছে সেভাবেই হ্যা-সূচক মাথা নাড়ল।

"তাহলে, আপনি কি আমাকে মিস্ করবেন?"

আমি নিচের দিকেই তাকিয়ে থাকলাম।

"লোকজনকে কতটুকু পর্যন্ত মিস্ করা যাবে সেব্যাপারেও কি আপনার বাজেট আছে নাকি?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"অঙ্ক কর, বিদ্যা, মনোযোগ দাও," বলে চলে এলাম।

*

"আপনারা কি ক্লান্ত নাকি হিট প্র্যাকটিস করবেন?" বিমানবন্দরে এই কথাগুলো বলেই ফ্রেড আমাদের স্বাগত জানাল।

"আমার শোয়ার বিছানা কই," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আহমেদাবাদ থেকে মুম্বাইয়ে রাতারাতি ট্রেনে চড়ে এসেছি, সিঙ্গাপুর হয়ে সিডনি যাওয়ার জন্য চৌদ্দ-ঘণ্টার একটা ফ্লাইটে ওঠার জন্য আরো ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। বদ্ধ পরিবেশে ত্রিশ ঘণ্টার ভ্রমণ। ঘুম দিয়ে মড়ার মত পড়ে থাকতে চাচ্ছিলাম।

"ওহ্, মানে প্র্যাকটিসের সময়েই আমরা এসে পেঁছেছি?" সিডনির রাস্তাঘাটের দিকে তাকালো ইশ। সকাল ৭টায় জগিং করছে লোকজন, ফুটপাথ একেবারে ভরে গেছে, ছবি-পোস্টকার্ড, কফির দোকানে সুস্বাদু মাফিন কেকের বিজ্ঞাপন।

খাকরার ব্যাগে মৃদু আঘাত করলাম। এই শহরে কোন পিঠা কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই।

"আমি সকালবেলা অ্যাকাডেমির মাঠে যাই," অ্যাক্সিলেটরে পা রাখতে রাখতে ফ্রেড বলল। "একটা হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করেছি আপনাদের। প্রথমে বলব, একটু ঘুমিয়ে নেন। সন্ধ্যায় প্র্যাকটিসের জন্য ফিলিপ এসে আপনাদের তুলে নেবে।"

*

"এই যে, এ হচ্ছে আলী। ব্যাটসম্যান," প্র্যাকটিস করতে আসা অন্য খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে ফ্রেড বলল। ফিলিপ ছাড়াও আছে হৃষ্টপুষ্ট শরীরের পিটার আর চশমা পরা স্পিনার স্টিভ। বাকি নামগুলো সাথে সাথেই ভুলে গেছি।

ফ্রেড চিৎকার দিল। "প্রত্যেকে পাঁচ রাউন্ড ক'রে। সীমানা রেখার খুব কাছে যেতে হবে। কোন শর্টকাট মারা যাবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ট্রেলিয়ায় প্র্যাকটিসের প্রথম দু'ঘণ্টা ছিল মরণ প্র্যাকটিস। অ্যাকাডেমি মাঠের পাঁচ পাক মানে নানা পার্কের বিশ পার্ক আর ব্যাংকের উঠোনের পঞ্চাশ পাক। দৌড়ানোর পরে অসংখ্যবার উঠ-বস, বুকডন আর ক্রাঞ্চ করা। প্রতি পাঁচজন ছাত্রের তত্ত্বাবধান করার জন্য তিনজন ক'রে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক আছেন। প্রথমবার আমি যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠার পর একজন আমার দিকে দৌড়ে এল। পরের বার একই ঘটনা ঘটলে তিনি বললেন, "এই নাটক বন্ধ করেন, বন্ধু।"

সহনশীলতা প্রশিক্ষণ শেষে পিচে ফিরলাম আমরা। তাদের বললাম, আমি কোন খেলোয়াড় নই, কিন্তু যাহোক না কেন, ফিল্ডিং আমাকে করতেই হবে।

"এই যে, বল কর," ফ্রেড বলটা আলীর কাছে ছুঁড়ে দিল।

"সে তো আসলে বল করে না," ইশ বলল।

"জানি, বার্ল কর..." ফ্রেড হাততালি দিয়ে বলল।

আমার কাছাকাছি বাউন্ডারিতে ফিল্ডিং করার জন্য দাঁড়াল ফিলিপস।

"বার্ল কী?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"অস্ট্রেলিয়ার খিস্তি, বন্ধু," ফিলিপ হাসল, "এর মানে একবার চেষ্টা ক'রে দ্যাখ।"

ইশ উইকেট কিপার হতে চাইলেও ফ্রেড তাকে স্লিপে দাঁড়াতে বলল। এইসব জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের কাছে আলীর বোলিং কোন কিছুই না। রজার বলটা বার কয়েক বাউন্ডারির দিকে পাঠিয়ে দিল। একবার বলটা ফিলিপ আর আমার মাঝেও এসে পড়ল কিন্তু সেটা ক্যাচ ধরা খুব কঠিন ছিল। আরেকটা ফিল্ডার আমার দিকে চিৎকার ক'রে বলল, "তাড়াতাড়ি করেন।" কথাটা অনুবাদ ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দিতে হল না কাউকে।

বলটা ছুঁড়ে পাঠিয়ে দিলাম তার কাছে। এই অস্ট্রেলিয়ার মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে কী করছি আমি?

যতই দিন যেতে লাগল বেশি বেশি অস্ট্রেলিয় কথা শিখতে লাগলাম। 'অনিয়া' কথাটার অর্থ হচ্ছে 'তোমার ভাল হোক'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর চলতি মানে হল সাবাস। সহজ বল হচ্ছে 'পিস অর পিজ'। আর ভাল বলকে বলে 'প্যাকড এ ওয়ালপ,' মশার নাম 'মজিস,' আর কোমল পানীয়কে বলে, 'কোল্ডিস'। দীর্ঘ বিরতি নিলে ফিলিপ আরো অশ্লীল কথা বলত। "আপনার পাইথনটা পানি ছাড়বে নাকি?"

অন্ধকার হয়ে আসছে।

"সব গোছগাছ কর," ফ্রেড ঘোষণা করল। যদিও আলী এখনও পর্যন্ত ব্যাট করে নি।

লকার রুমে ইশকে মনমরা দেখে ভ্রু উঁচুতে তুলল ফ্রেড।

"আমি ভাল আছি," তার ইশারার জবাবে বলল ইশ। অমি আর আলী ডাবের বাইরে হাঁটাহাঁটি করছিল।

"ফেয়ার ডিনকাম!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঠের টুলটা থেকে চোখ তুলে তাকাল ইশ।

"সে জিজ্ঞেস করছে, আপনি সত্য বলছেন কিনা," আমার নবলব্ধ ভাষা জ্ঞান জাহির করে বললাম।

"কালকে কখন প্র্যাকটিস হবে, ফ্রেড? পারলে ইংলিশে বলেন," ইশ বলল।

"আপনি কি হুইঙ্গার?" ফ্রেড বলল।

"হুইঙ্গার মানে..." ইশ বাধা দিতেই আমি বললাম। "হুইঙ্গ মানে কী তা আমি জানি। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে কোন ব্যাটসম্যানকে ডেকে এনে তাকে ব্যাট করতে না দেওয়ার যুক্তিটা ব্যাখ্যা করতে পারে কেউ?"

ফ্রেড হাসল, "ওহ্, তোমার ক্ষুদে প্রতিভাটাকে দিয়ে ব্যাট করাতে চেয়েছিলেন। কী জন্য? কয়টা ছক্কা মারতে পারে দেখানোর জন্য। প্রথম দিনেই বাচ্চাটাকে দিয়ে ওর প্রতিভা দেখাতে চাচ্ছ সবাইকে?"

"না, তা না, আমি..."

"বন্ধু, অনেক প্রতিভা দেখি আমরা। এআইএস থেকে স্কলারশিপ পাওয়া প্রতিটি বাচ্চাই প্রতিভাবান। কিন্তু আমি যদি তাদের গর্ব চূর্ণ না করি বাকি জীবনটা তারা গুণ্ডা-বদমাসই থেকে যাবে। স্পোর্টসম্যান কোন চিত্রতারকা নয়, বন্ধু। যদিও তোমাদের দেশে তাদের তাই মনে করা হয়।"

"কিন্তু ফ্রেড..."

"তোমাদের ইন্ডিয়ানদের ভাল মেধা আছে। কিন্তু প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমার উপর বিশ্বাস রাখ, বন্ধু।"

"আমরা এখানে মাত্র এক সপ্তাহ আছি।" ইশের কথা শুনে তাকে অসহায় মনে হচ্ছে।

"সপ্তাহটা ভাল করেই কাজে লাগাব আমি। কিন্তু আজকের শিক্ষাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিনয়ী না হতে পারলে বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না সে," ফ্রেড কথাটা বলেই নিজ ঘড়িতে সময় দেখল। "বউকে বলে এসেছি কিছু সময় বাইরে থাকব। নববধূর নাইটির মতই আমি দূরে আছি।"

*

"হুর্‌রে!" সবাই চেঁচিয়ে উঠল এক সঙ্গে। XXXX বিয়ারের গাঢ় বাদামী বোতলগুলোতে টুংটাং আওয়াজ তুললাম আমরা। ফোরেক্স নামেও এগুলো পরিচিত।

"হাই!" ওয়েট্রেস ফ্রেডকে জড়িয়ে ধরে বলল। এতটাই আকর্ষণীয়া যে তাকে ওয়েট্রেস হিসেবে মানায় না।

"উউউহ্..." সে চলে যেতেই ফ্রেডের ছাত্রেরা ফ্রেডকে ক্ষ্যাপাতে চেষ্টা করল।

"কোন উপায় নেই, বন্ধু। অন্য কারো দিকে চোখ দিলে বউ সহ্য করবে না," ফ্রেড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল। "কিন্তু তোমরা তো অবিবাহিত। পুরো ইন্ডিয়া জুড়ে নিশ্চয় অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে তোমাদের জন্য।"

প্রত্যেকে আমাদের দিকে তাকাল। "আমাদের কোন বান্ধবী নেই," অমি বলল।

"নেই কেন? ইন্ডিয়ান মহিলারা তো দারুণ হট," বলল মাইকেল।

"কাজ নিয়েই খুব ব্যস্ত থাকি," আমি বললাম।

"ব্যস্ত? এমন কোন পুরুষের কথা আজ পর্যন্ত শুনি নি যে ব্যস্ততার জন্য রুট করতে পারে না, বন্ধু," রজার বলল।

সবাই হেসে ফেলল। রুট মানে হচ্ছে, বাদ দিন। এটা না বললেও হবে।

"এই সুন্দরীগুলোকে দ্যাখো," চারটা মেয়ে ভেতরে ঢুকতেই মাইকেল বলল।

"বাদামি পোশাক পরাটা মন্দ না। 'NCR5'," বলল মাইকেল।

"NCR10," রজার বলল।

"নীলটা?" ফিলিপ জানতে চাইল।

"ওটা NCR0। ওটাকে নিয়ে আস, দেখি," বলল রজার। হেসে উঠল সবাই।

"NCR কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। পরিবেশে তখন একটা গণিত গণিত ভাব চলে এসেছে।

"NCR হচ্ছে *Number of cans required*। কোন মেয়ের সাথে সেক্স করার জন্য যে কয় বোতল বিয়ার খরচ করতে হয় তার সংখ্যা," ফ্রেড বলল।

"মাইকেল একবার একটা বাজে মেয়ের সাথে অভিসারে গিয়েছিল। সে স্বীকার করেছে NCR 80," রজার বলল। সবাই অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়ল।

"এই যে ক্ষুধার্ত ছেলেরা, আসো খাই," ওয়েটার প্লেটগুলো দিয়ে যাবার সময় ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠে বলল হাজেল।

অস্ট্রেলিয়রা প্রধানত মাংসের তৈরি খাবার খায়। আমরা শুধু একটা পিজ্জা খেলাম। কারণ এটাই ছিল একমাত্র চেনা খাবার।

"আপনার আরো বেশি ক'রে আমিষ দরকার," মাইকেল বলল। খাওয়ার সময় তার উর্দ্ধবাহুর মাংসপেশী ফুলে ফেঁপে উঠছে।

অমি বলল, "আমি দিনে দু'লিটার দুধ খাই।"

ইশ ফ্রেডের পাশেই বসে আছে। তাদের কথোপকথন শুনতে পাচ্ছি না। কিন্তু দেখলাম, ইশ প্রায়ই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ছে। অস্ট্রেলিয়ায় রুটিং গল্প বাদ দিয়ে ইশের কাছে গেলাম।

"তুমি যদি বোলার হও এবং বল যদি তোমার হাতে থাকে তাহলে খেলা নিয়ন্ত্রণ করছো তুমি। তোমাকেই ব্যাটসম্যানকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বস্ কে? "ফ্রেড বলছে, "আলীর বেলায়ও একই কথা। শুধু শট মারলেই হবে না। অন্য দলকে জানান দিতে হবে যে, বস্ কে।"

"ঠিক," ইশ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আস্তে আস্তে আমার খেলোয়াড়েরা আলীকে বল করার নতুন নতুন উপায় শিখিয়ে দেবে। সংকল্প থাকলেই শুধু সহজাত গুণটাকে কাজে লাগানো যায়। চ্যাম্পিয়নের এই দুটো গুণই আছে।"

ইশ মাথা নেড়ে সায় জানাল।

"হাই গোবিন্দ!" ফ্রেড আমাকে চিনতে পেরেছে। "রুটিংয়ের জন্য টিপস্ লাগবে না? আমরা তো শুধু একঘেঁয়ে কোচিংয়ের টিপস্ নিয়েই কথা বলছি।"

ফ্রেড ইশকে সমকক্ষ হিসেবে দেখছে ব'লে গর্বে তার বুকের ছাতি ফুলে উঠলো।

একটা কথা মনে পড়ে গেলো আমার। "গতকাল একটা স্কলারশিপের কথা বলছিলে। কী সেটা? আসলে অস্ট্রেলিয়াতে খেলাধুলার পুরো ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করে?"

"অস্ট্রেলিয়া সব সময় জেতে কেন, সেটা জানতে চাচ্ছো?"

"সবসময় জেতে না," বলল ইশ।

"সব সময় না, সেজন্য উপরওয়ালার শুকরিয়া। প্রতিপক্ষের উপরে আধিপত্য করতে ভালবাসি আমরা, কিন্তু লড়াই করতেও ভালবাসি। চ্যালেঞ্জ থাকলে তবেই সেরা কিছু বের হয়ে আসে।"

"হ্যা সব সময় না জিতলেও অনেক বেশি জেতে অস্ট্রেলিয়া। প্রতিটি অলিম্পিকে একগাদা পদক পায়। ক্রিকেটে তো অধিপত্য আছেই। কিভাবে, ফ্রেড?" আমি বললাম।

"অনেক কারণ আছে, বন্ধু। কিন্তু এটা সবসময় এরকম ছিল না।" ফ্রেড বুদ্বুদ ওঠা পানিতে চুমুক দিল, "সত্যি বলতে কি ১৯৭৬-এর মন্ট্রিল অলিম্পিক গেম্‌সে অস্ট্রেলিয়া একটা পদকও জেতে নি।"

"কিন্তু আপনারা তো গত বছর ভাল করেছেন," বলল ইশ।

"হ্যা ২০০৬-এ সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া ৫৬টি পদক পেয়েছিল। আমেরিকা, রাশিয়া আর চায়নার পরেই তার স্থান। এই দেশগুলোর প্রত্যেকটিতে দশগুণ জনসংখ্যা আছে," একটু বিরতি দিল সে। "মন্ট্রিলের কলঙ্কজনক অবস্থাকে জাতীয় লজ্জা হিসেবে দেখে অস্ট্রেলিয়া। এজন্য সরকার *Australian Institute of Sports* অর্থাৎ AIS তৈরি করে পৃথিবীর সেরা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে।" ফ্রেড পানি খাওয়া শেষ করে বলে চলল :

"আর আজকে AIS-এ শত শত লোক চাকরি করছে–কোচ, ডাক্তার, ফিজিওলোজিস্ট। দুশ' মিলিয়ন ডলারের তহবিল পায় তারা, খুব ভাল সুযোগ-সুবিধা আছে সেখানে। প্রতি বছরে তারা সাত শত স্কলারশিপ দেয়।" ফ্রেড স্প্যাঘেটির প্লেটটা আমার দিকে ঠেলে দিল।

ফিতার মত দেখতে পাস্তা খেতে খেতে শুনতে লাগলাম আমি। হিসেব করছিলাম, বিশ মিলিয়ন লোকের জন্য সাতশত স্কলারশিপের সাথে ইন্ডিয়ার তুলনা হয় কীভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপাত মেলাতে হলে দেখা যাবে, বছরে ইন্ডিয়াতে পঁয়ত্রিশ হাজার স্পোর্টস স্কলারশিপ থাকতে হবে।

"স্কলারশিপটা কি? টাকা?" ইশ জানতে চাইল।

"শুধু টাকাই না, বন্ধু। সব কিছুই আছে। ভাল কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা, টুর্নামেন্ট খেলতে যাওয়া, স্পোর্টস সায়েন্স, ওষুধ কোন্‌টা নেই বলো। সবচেয়ে ভাল জিনিসটা হচ্ছে, তুমি এমন একটা গোষ্ঠীর অংশ হয়ে গেলে যেখানে সবাই খেলাধুলার ব্যাপারে খুবই নিবেদিতপ্রাণ। সেই অনুভূতি বলে বোঝাতে পারব না," ফ্রেড বলল, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল তার।

"অনুভূতিটা আমিও জানি," ইশ বলল। ইশের চোখ নীল নয়, তারপরও সেগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

খাওয়া হয়ে গেলে প্লেটগুলো নিয়ে গেল ওয়েটার।

"এই স্কলারশিপ প্রোগ্রাম থেকে কি কোনো বিখ্যাত খেলোয়াড় বেরিয়েছে?"

"অনেক বেরিয়েছে। মাইকেল বেভান, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, জাস্টিন ল্যাঙ্গার, ডেমিয়েন মার্টিন, গ্লেন ম্যাকগ্রা, রিকি পন্টিং, অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস, শেন ওয়ার্ন..."

"কী বলছো? এরা তো সবাই ক্রিকেটের একেকটা কিংবদন্তী," ইশ বলল।

"কিংবদন্তী–সুন্দর কথা।" ফ্রেড হাসল। "আশা করি একদিন আমিও এই অবস্থানে যাব।"

"আপনারও কি স্কলারশিপ আছে?" আমি বললাম। ফ্রেড মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"আপনি তো ইতোমধ্যেই কিংবদন্তী, ফ্রেড," ইশ বলল।

"না, আমি শুরু করেছি মাত্র। আর একটা কথা বলি তোমাদের। কিংবদন্তীর ব্যাপারটা পুরোটাই কষ্ট-কল্পনা। একটু মেধা থাকার পরে সেটাকেই ঠিকমত কাজে লাগাও, দেখবে ভাল ফল পাচ্ছ। সেই অর্থে, অস্ট্রেলিয়া কিংবদন্তী তৈরি করতে পারে।"

"আর আমরা পারি না?" ইশ জিজ্ঞাসা করল।

"তোমাদের দিয়েও সম্ভব। যদিও ঠিক এখনি প্রশিক্ষণের চেয়ে মেধার উপরেই তোমরা নির্ভর কর বেশি। তোমাদের জনসংখ্যা বিশাল। তাদের একটা ক্ষুদ্র অংশই মেধাবী হয়ে জন্মায়। টেন্ডুলকারের মতন বা হয়ত আলীর মতন।"

"হ্যা, কিন্তু," ইশ বাম হাতের তালু দিয়ে ডান হাতের তালুতে আঘাত করল, "এই রকম প্রশিক্ষণ ইন্ডিয়ায় পেলে কী হতো চিন্তা করো।"

"ক্রিকেট শেষ হয়ে যেত। ইন্ডিয়াই আধিপত্য করত; আমাদের মত দলগুলোকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। অন্তত বর্তমান সময়ের জন্য হলেও আমরা নিজেদেরকে কিংবদন্তী ভাবতে পারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের দিনগুলোতে ব্যাট করল আলী। ছক্কা মারা দেখে প্রত্যেক বোলার বিহ্বল হয়ে গেল। দুই ইনিংসেই পঞ্চাশ রান ছাড়িয়ে গেল সে। শুক্রবার দিন সকাল বেলা আলী রক্ষণাত্মক ব্যাটিং করল। বল বেশি দূরে গেল না। ক্রিজে টিকে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো আলী।

"দৌড়াও, এক রান নাও," বাউন্ডারি লাইন থেকে ইশ বলল। "আলী দৌড়াও" ইশ আবার বলল। দৌড়াতে বলা হচ্ছে শুনে আলী অবাক হয়ে গেলেও দৌড় লাগল।

"আরো জোরে," ইশ চিৎকার দিয়ে বলল, "ঘুমিয়ে থেকো না।"

ফিল্ডার বোলারের কাছে বল ফেরত পাঠালে আরো দ্রুত দৌড়াতে লাগল আলী।

"লাফ দাও," বলল ইশ। আলী লাফিয়ে উঠল। ক্রিজ পার হলেও বাম গোঁড়ালিতে পুরো দেহের ভর দিয়ে সে পড়ে গেলে সবাই তার দিকে দৌড়ে গেল। দাঁত লেগে পড়ে আছে আলী। চোখে জল।

"ওহ্, উঠে দাঁড়াও। নাটক করার সময় নেই," ইশ বলল।

"ব্যাপার না, বন্ধু," ফ্রেড ইশকে বলল। ডাক্তার ডাকার জন্য ইশারা করল সে। কয়েক মিনিটের মধ্যে একজন প্যারামেডিকেল ডাক্তার চলে এলেন। আলীর ফুলে ওঠা গোড়ালীতে বরফের মোড়ক রেখে দিলেন তিনি।

"ভাগ্য ভাল কিছু ভাঙে নি বা স্থানচ্যুত হয় নি। লিগামেন্টে একটু আঘাত পেয়েছে মনে হচ্ছে," তিনি বললেন। পেইন কিলার দিয়ে ক্রিপ ব্যান্ডেজে বেধে দিলেন জায়গাটা। আলী পায়ে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে চেষ্টা করল। "দুই দিন খেলাধুলো করার দরকার নেই। তারপরে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"চিন্তার কিছু নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খেলতে পারবে আবার," লজ্জিতভাবে বলল ইশ। তার চোখে অপরাধবোধ জেগে উঠল।

"প্রত্যেকেই," ফ্রেড হাততালি দিলো, "সবাই বসে পড়ো।"

ফ্রেডের চারপাশে বৃত্তাকারে পিচের উপরে বসে পড়লাম আমরা। "তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক এবং শক্ত খেলোয়াড়। তোমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করতে চাও। কিন্তু এই ব্যাপারটাত আমি সেরকম জোর দিতে চাই না। নিজের দৈহিক সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রাখবে।"

"আমি সেটা বিবেচনায় রাখি," ইশ বলল। কথাটা বলার তাড়ণা অনুভব করছিল সে। "কিন্তু একটা রান নেওয়া যেত। আমরা ইন্ডিয়ানরা এটাই মিস্ করি। আমরা লাফ দিতে চাই না। ঝুঁকি নিতে চাই না।"

"পৌরুষ দেখানোটাই খেলা নয়। নিজের অবস্থার কথা ভুলে যাবে না।"

"মানে?" আমি বললাম।

"একটা ভঙ্গুর শরীর তোমার, সেটা ভোলা যাবে না। এটার কিছু হলে তোমার সব কিছু শেষ। এটার নিরাপত্তা বিধান অবশ্যই করতে হবে। আর ইশ, নিজের ছাত্রকে তোমারই রক্ষা করতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইশ মাথা নিচু ক'রে থাকল।

"ক্যারিয়ারের শুরুতে আমার পিঠের সমস্যার জন্য সবকিছু প্রায় শেষ হওয়ার জোগাড় হয়েছিলো," ফ্রেড বলল। "বাকি জীবনটা একটা দোকানে সুট বিক্রি করেই কাটিয়ে দিতে হত। কারণ এই একটা চাকরিই আমি পেতে পারি।" সে আরো বলল, "একই ভুল আমিও করেছিলাম, একদিনেই নিজের সবটুকু ঢেলে দিয়ে শেষ করে ফেলতে চাইছিলাম, কিন্তু ক্যারিয়ার পেতে চাইলে দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা করতে হবে। হ্যা, প্যাশনটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ম্যাচের সময় মাথাটা পরিষ্কার রাখতে হবে।"

পরে লকাররুমে ফ্রেডের কাছে মাফ চাইল ইশ। "আলীকে আর কখনো আঘাত পেতে দেবো না।"

"ছেলেটা ভাল। তার জন্য কিছুটা বিস্ময় জাগে আমার মধ্যে। রবিবার সন্ধ্যায় চলে যাচ্ছে, তাই না?"

"হ্যা, দু'দিন পর," ইশ বলল, "এত দ্রুত সপ্তাহটা চলে গেল, বিশ্বাসই হচ্ছে না।"

"তোমাদের সবার জন্য রবিবারের নাস্তা আমি করাব। তোমারদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কারো সাথে দেখা করিয়ে দেব তখন।"

বোনডি সমুদ্র সৈকতটা এত সুন্দর যে তার জন্য আলাদা একটা কফি টেবিল বুক করার দরকার পড়ে। প্রথমত আকাশটা। অস্ট্রেলিয়ার আকাশের রঙ ইন্ডিয়ার থেকে আলাদা। রঙের দোকানে যে আসমানী নীল রঙ থাকে, এটা দেখতে ঠিক সেরকম। এতটা কুয়াশাপূর্ণ যে চোখে লাগে। দূষণের বালাই নেই। মাইলের পর মাইল ধরে সমুদ্র দেখা যায়। বেলাভূমিতে প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে মিহি বালি মিশে দারুণ ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। ঢেউগুলো সার্ফ করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী। তারপরও রিল্যাক্স করার মত প্রশান্তিময়।

কিন্তু ঐ গ্রীষ্মে সৈকতটার সবচেয়ে সুন্দর দিক ছিল এর লোকজন–পুরুষ নয়। নারীরা। জমকালো এবং টপলেস। আগে যদি কখনো টপলেস নারী না দেখে থাকেন তো এ ধরণের জায়গায় গেলে সেটা দেখতে পারবেন।

"নিশ্চিত একশ'র মতো নারী এখানে আছে," শিস্ বাজিয়ে বললো ইশ। "আর প্রত্যেকটাই নক আউট!"

কথাটা সত্যি। ব্যাপারটা এরকম যে, দুনিয়ার সব সুন্দরী নারীরা একে অন্যের কাছে ই-মেইল চালাচালি করে বোনডিতে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেন।

"একটা ছাতার নীচে বসতে চাও?" নৈসর্গিক সৌন্দর্যের একটা জায়গায় এসে আমি বললাম। ছয়জন টপলেস নারী সেখানে ফ্রিসবি খেলছে।

"ওয়াও! দ্যাখ, রীতিমত ওদের স্তন..." অমি ইঙ্গিত ক'রে দেখাল।

"একশ' মহিলা এখানে আছে। তার মানে আমাদের তাকানোর জন্য দুইশ স্তন রয়েছে," বললাম আমি। সব জায়গায় গণিত নিয়ে আসার জন্য খোঁচা খেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে জায়গায় বড় হয়েছি সেখানে হাতাকাটা ব্লাউজ পরা মানেই কেলেঙ্কারির ব্যাপার, আর টপলেসের কথা বলতে গেলে এমবিএ-র মত করে বলতে হয়, 'প্যারাডাইম শিফট' ।"

"ওদের সাথে খেলতে পারব না। ফ্রিসবির দিকে চোখই যাবে না আমার," ইশ বলল।

"উজ্জ্বল চুলের ঐ মেয়েটাকে দ্যাখ, ওয়াও, কী বিশাল।"

"স্বর্গ এরকমই হবে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে।" অমি বলল।

ব্যাপারটা মজার হলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই উন্মুক্ত স্তনের ব্যাপারটা সাধারণ হয়ে গেল। আমার মনে হয়, ভাল জিনিসের ব্যাপারে মানুষ খুব দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এক সাথে একশ' টপলেস নারী দেখার চাইতে একশ' দিন ধরে প্রতিদিন একটা করে দেখতেই আমি বেশি পছন্দ করবো। বালির উপরে বসে পড়লাম আমি। ইশ আর অমি একটু পরই সমুদ্রে সাঁতার কাটতে গেল। সিক্ত টপলেস নারীদের বেশি হট লাগে কিনা তারা সেটা দেখতে চায়। হ্যা, আমরা সব অসুস্থ লোকজন।

আমার পাশে ছাতার নিচে একজন শ্যামাঙ্গীকে দেখলাম, বিকিনির উপরে একটা শার্ট পরে আমার দিকে পিঠ দিয়ে আছে, তার চিকন পিঠের উপরে লম্বা কালো চুল। শরীরের অর্ধেকটা জুড়ে কিছু একটা মেখে নিল বোধহয় সে। হয়ত তেল বা লোশন কিংবা এ ধরনের কিছু, যা কিনা মেয়েরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় মনে করে।

কিছু একটা যেন আমার ভেতরে গিয়ে আঘাত করল। মনে হল কেউ একজন আমার বুকে আঘাত করছে। শ্যামাঙ্গী মেয়েটা ঠিক বিদ্যার মত করে চুল ঘষছে। দেখলাম দূরে অমি এবং ইশ কিছু পানি ছিটাচ্ছে একে অন্যের দিকে। একজন আরেকজনকে ধাক্কাধাক্কি করতে হাসাহাসি করছে তারা।

নানা রকম চিন্তা মাথার মধ্যে ছুরপাক খাচ্ছে এখন। যেমন চুলের ভেতরে তৈলাক্ত আঙুল। বিদ্যা এখানে থাকলে কি ভাল হতো না? সে তো এটাই চাচ্ছিল, নাকি? সব কিছু বাদ দিয়ে স্বাধীনতাই চাচ্ছি? বোনডির মত মানসিকতাই তার, নাকি? হয়ত ভেবেছিল বিকিনি পরে পাশে হাঁটাহাঁটি করলে তাকে আমি মেরেই ফেলব। আরে দাঁড়ান, কে মেরে ফেলত তাকে–আমি নাকি তার দাদা ইশ? আমি কেন মাথা ঘামাবো? কিন্তু আমিই তো বললাম যে, আমি তাকে মেরে ফেলব? আর তার কথাই বা আমি ভাবছি কেন? আমার মনোযোগ সরানোর জন্য আশেপাশে এত এত সুন্দরী টপলেস নারী রয়েছে। কিন্তু ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রতি রাতে তার কথাই মনে পড়ে কেন? আর কেনই বা নির্বোধ সব প্রশ্ন করা থেকে আমার মন বিরত হয় না?

হাজার হাজার মাইল দূর থেকে কোন মেয়ের কথা যদি আপনার মনে পড়তে থাকে যখন কিনা আশে পাশে নগ্নবক্ষা রমনীরা আছে, তাহলে বুঝতেই হবে কিছু একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলমাল আছে। নোটবুকটা খুললাম। আমার এই নোটবুকটা সব জায়গায় সাথে সাথে রাখি। পরের তিন মাসের জন্য একটা বাজেট তৈরি করতে চাচ্ছিলাম। এক গোছা লম্বা চুল পেলাম নোটবুকের মাঝে। ইশ, অমি বা আমার এরকম চুল নেই। মাত্র একজন মানুষকেই জানি যার এরকম লম্বা চুল আছে। তাকে ভুলে থাকার জন্যই নোটবুক খুলেছিলাম কিন্তু এখন দেখি খোলার পরে তাকেই বেশি মনে পড়ছে।

অমি দৌড়াতে দৌড়াতে আমার কাছে এল। ভার গা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল আমার পায়ে পড়ছে। নোটবুকটা বন্ধ করে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে।

"পানিটা সেই-রকম, আয়, পানিতে নামি," হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে।

"না, আমার কাজ আছে, একটা কল করতে হবে," আমি বললাম।

"কার কাছে কল করবি?"

"সাপ্লায়ারদের কাছে," তার চোখের দিকে না তাকিয়েই বললাম।

"এখান থেকেই করবি? টাকা বেশি লাগবে না?"

"সংক্ষেপে কল করব। কয়েকটা কয়েন লাগবে মাত্র," আমি বললাম।

"বোনডি'তে কাজ করবি? যাকগে, আমি আবার ডুব দিতে গেলাম," বলে অমি সমুদ্রের দিকে দৌড়ে চলে গেল। জিনিসপত্র সাথে নিয়ে সৈকতের কেনাকাটা করার জায়গার দিকে হেঁটে গেলাম আমি। একটা পাবলিক ফোন খুঁজে পেলাম সেখানে।

ওর নম্বরটাতে ডায়াল করলাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৪

ফোনটা দু'বার বেজে উঠলে আমি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। ভাবলাম বুথ ছেড়ে চলে যাই। কয়েনগুলো ঢুকিয়ে আবার ডায়াল করলাম।

"হ্যালো? ইশান ভাইয়া?" ফোন তুলেই বিদ্যা বলল।

ফোনটা দুই ডলারের কয়েন গিলে ফেলেছে। আবার লাইন কেটে দিলাম। *শালা, কি করছি এসব আমি?* নতুন কয়েন ঢুকিয়ে আবার কল করলাম। সাথে সাথে ফোন ধরল সে, "ভাইয়া শুনতে পাচ্ছ?" শুধু নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। নিশ্চয় অস্বাভাবিক আচরণ ক'রে ফেলেছি। কিন্তু এর থেকে ভাল কিছু বলার পেলাম না।

"গোবিন্দ?" সে বলল। সতর্ক কণ্ঠ। *সে কি আমার নিঃশ্বাস ফেলা বুঝতে পেরেছে?* কি করবো আমি? "হাই," আমি বললাম। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিলাম না।

"গোবিন্দ, ওয়াও ইন্টারন্যাশনাল নাম্বারটা দেখেই বুঝেছি, হুম বলেন?" টেলিফোনে এ যাবত যত কথা বলেছি, এই 'বলেন' কথাটাকে আমি সবচাইতে অপছন্দ করি। কল করেছি বলেই কি আমাকে কিছু বলতে হবে?

"তো, আমি..."

"অস্ট্রেলিয়া কি রকম? মজা করছেন? বলেন না আমায়?"

আবার 'বলেন' বলাতে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে তাকে। কিন্তু এইমাত্র আমি যা ভাবছিলাম, তাকে বোধহয় সেটা বলা উচিৎ।

"হ্যা, সুন্দর। তোমার পছন্দ হবে এই জায়গা," আমি বললাম।

"কোন্ জায়গা বলবেন না? কোথায় আছেন এখন?"

"বোনডি সৈকত। খুব সুন্দর। পারফেক্ট জায়গা," বললাম আমি। অবশ্য নির্বোধের মতন বর্ণনা দিয়েছি। কিন্তু দেখতে হবে না, যে মেয়েটাকে কল করার কথা না তাকেই কল করা হচ্ছে, তাও আবার প্রথম বার।

নার্ভাসনেস আরো বেড়ে গেল। সাংঘাতিক দ্রুত কয়েন শেষ হয়ে যাচ্ছে ফোনে। প্রতি ত্রিশ সেকেন্ডে এক ডলার ক'রে যাচ্ছে। আরো কয়েন ঢুকাতে থাকলাম।

"ওয়াও, আমি সত্যিকারের সৈকত জীবনে কখনো দেখি নি। কী রকম ওটা? অসীম জল আর জল? সারাজীবন চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় নাকি আপনার?"

"হ্যা, আর আকাশটাও অসীম।" *দুর! ব্যাটা, ওর কথা থেকে ধার না করে অন্য কিছু বল।*

"ইশ আর অমি কোথায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পানিতে আছে। আর আমি একটা বুথে।"

তারপর সেই প্রশ্নটাই সে জিজ্ঞাসা করল যেটা আমি কোনোভাবেই চাচ্ছিলাম না জিজ্ঞাসা করুক "তো, আপনি কল করলেন কেন?"

"ওহ্, কিছু না। প্রস্তুতি কেমন চলছে? ইন্টিগ্রেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ। তুমি জানো।"

"ইন্টিগ্রেশনের জন্য কল করেছেন?"

"না মানে অন্য..."

"আমার কথা মনে পড়েছে আপনার?"

"বিদ্যা।"

"কী?"

"বোকার মতো প্রশ্ন কোরো না।"

"আমার অবশ্য আপনার কথা মনে পড়ছে। অনেক বেশিই মনে পড়ছে," সে বলল। তার গলা ভারী হয়ে আসছে।

"ইয়ে মানে, ঠিক আছে, সেটা..." আমি বললাম। অর্থহীন, দুই-এক শব্দে উত্তর দিতে আমি ওস্তাদ।

"হ্যা, টিউটর হিসেবে না, বন্ধু হিসেবে। খুব ভাল একজন বন্ধু হিসেবে।"

ইন্ডিয়ান মেয়েদের জন্য 'খুব ভাল বন্ধু' মানে সাংঘাতিক ব্যাপার। এখান থেকে আপনি দ্রুত আরো সামনে এগিয়ে যেতে পারেন, কিংবা ভুল করে ফেললে ইন্ডিয়ান নারীদের কাছে এ যাবতকালের সবচেয়ে খারাপ ক্যাটাগরিতে পড়ে যাবেন–সেটা হচ্ছে, রাখি দাদা। রাখি-দাদা মানে হচ্ছে, 'আমার সাথে কথা বলতে পারেন কিন্তু ঘুণাক্ষরেও মনের মধ্যে উল্টাপাল্টা কিছুর স্থান দেয়া যাবে না।'

আমার ভেতরে কোন ছোট্ট কণ্ঠ যেন চিৎকার দিয়ে বলছে, "ওকে বল, তুই ওকে মিস্ করছিস, গাধার বাচ্চা। নইলে সারাজীবনের জন্য রাখি পেয়ে যাবি তুই।"

"আমিও মিস্ করছি। তুমি এখানে, মানে সিডনিতে থাকলে আরো মজা হতো।"

"ওয়াও! আপনি এ পর্যন্ত আমাকে যা কিছু বলেছেন তার মধ্যে এটাই সবচাইতে সুন্দর।"

আমি নীরব থাকলাম। সুন্দর কিছু বলার পরে তড়িঘড়ি করে আবার কিছু বলতে যাবেন না। সুন্দরের রেশটা তাহলে কেটে যাবে।

"তোমার জন্য এখান থেকে কিছু নিয়ে আসব?" আমি বললাম।

"বাজেট তো টাইট, তাই না?" সে বলল।

"হ্যা, কিন্তু ছোটোখাটো কিছু নিলে সমস্যা নেই..."

"আমার একটা আইডিয়া আছে। ঠিক যেখানটায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, ওখানকার সৈকত থেকে আমার জন্য কিছু বালি নিয়ে আসবেন। তাহলে সিডনির কিছুটা অংশ আমার সাথে থাকবে।"

বালি? অদ্ভুত অনুরোধ। পারতঃপক্ষে সস্তা। একেবারেই মাগনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সত্যি?" আমি বললাম।

"হ্যা, এক ম্যাচ বাক্স ভরে বালি নিয়ে আসবেন। আর জায়গা থাকলে তার ভেতরে কিছু অনুভূতিও ভরে পাঠাবেন," বলল সে।

ফোনের ডিসপ্লে পিটপিট করতে শুরু করলো। মানে আরো টাকা ভরতে হবে। ভয় দেখাচ্ছে। আর না হলে এখানেই আমার প্রথম প্রেমালাপের মৃত্যু ঘটবে। আর কোন কয়েনও তো হাতের কাছে নেই।

"শোন, আমাকে যেতে হবে, আর কোন কয়েন সাথে নেই," বললাম আমি।

"অবশ্যই। তাড়াতাড়ি দেশে আসেন। কেউ একজন আপনাকে মিস্ করছে।"

"তিন দিন পরই ফিরে আসব। আমিও তোমাকে মিস্ করছি," বলে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলাম। *ওয়াও, যেটা অনুভব করছিলাম সেটাই বলে ফেলতে পারলাম তাহলে।*

"আমি আপনাকে কিছু একটা বলতে চাই..." বলল সে।

"কী?"

বিপ। বিপ। বিপ। বিপ। টেলস্ট্রা নামে অস্ট্রেলিয়ার একটা গাধা কোম্পানি আমার প্রথম রোমান্টিক সময়টি মাটি করে দিল।

হেটে ফিরে আসলাম, যে মেয়েটা বালি চাইল তার কথাই ভাবতে লাগলাম শুধু। একটা ছোট কল করতেই এক বেলার খাওয়ার সমান খরচ হয়েছে আমার। ভাবলাম, টেলিকম কোম্পানিগুলোর এতে করে কত লাভ হয়।

ব্লু অরেঞ্জ ক্যাফে নামে একটা জমজমাট আউটডোর রেস্টুরেন্ট পেরিয়ে এলাম। এক গ্লাস বিয়ার নিয়ে লোকজন ঘন্টার পরে ঘণ্টা বসে থাকে। লোকজনকে বার্গার এবং ভাজা স্যান্ডউইচ দেওয়ার জন্য সুন্দরী পরিচারিকরা চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

পানশালা থেকে একটা ম্যাচবাক্স নিয়ে কাঠিগুলো একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে হেটে বেলাভূমির কাছে চলে গেলাম আমি। পানি আমার পায়ের আঙুলে এসে ছুঁয়ে গেল। চারিদিকে তাকিয়ে একটু নিচু হলাম। ম্যাচবাক্সে কিছু বালি ভরে পকেটে রেখে দিলাম সবার অলক্ষ্যে।

"এই, কী করছিস তুই?" অমি বলল। ঢেউয়ের ভেতর থেকে উঠে এসেছে সে। পৃথিবীর কুৎসিততম মৎসকন্যা মনে হচ্ছে তাকে।

"কিছু না, তুই এদিকে কী করিস? অন্য দিকেই ঢেউ ভাল আছে।" আমি বললাম।

"তোর সাথে দেখা করার জন্য আসলাম। একটা কোক কেনার জন্য কিছু কয়েন দিতে পারিস? তেষ্টা পেয়েছে।"

"কয়েন সব শেষ। আজকের জন্য কিছু নগদ টাকা আছে শুধু। কিন্তু এই দিয়েই দুপুরের খাবার খেতে হবে।"

"শেষ?" অমি বলল।

"হ্যা," বিরক্ত হয়ে বললাম। আমার চেয়ে কম বুঝওয়ালা লোক প্রশ্ন করতে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে ভাল লাগে না।

"কার কাছে কল করলি?" জানতে চাইল অমি।

"সাপ্লায়ার।"

"কোন্ সাপ্লায়ার?"

"চুপ কর। এবার চল, দুপুরের খাবার খেয়ে আসি। তার আগে গা-টা শুকিয়ে নে।"

"বিদ্যা?"

তার দিকে তাকালাম। আমি বাকরুদ্ধ।

কী এলোপাথাড়ি অনুমান। আর এতে ওর কাজটাই বা কী। "কী?" বিস্মিত হয়ে বললাম।

"আমার সাথে মিথ্যা বলিসনে।"

"অমি, বিদ্যার কাছে কল করব কী জন্য?"

"অত বোকা আমি না।"

"তুমি আসলে তা-ই," আমি বললাম।

হাটতে হাটতে রেস্টুরেন্টের দিকে গেলাম আমরা। আমি ওর থেকে তিন পা সামনে সামনে হাটছি।

"তোরা যেভাবে একজন আরেকজনের দিকে তাকাস, আমি সেটা দেখেছি," আমার নাগাল ধরার চেষ্টা করতে করতে বলল সে।

"দূর হ," বলে আরো দ্রুত হাটতে লাগলাম আমি। ক্যাম্পবেল প্যারেডে চলে আসলাম আমরা। সৈকতের কাছে কিছু পানশালা আর ক্যাফে আছে ওখানে।

"আরো দেখেছি ওর পড়াশোনা শুরু করার পর থেকে ওর সম্পর্কে কথা বলতে চাস না," সে বলল।

হগ্স ব্রিদ ক্যাফে'র ভেতরে ঢুকলাম। এই দেশে পাঁচ দিন সময় কাটলো। এই রকম নাম দেখে আর আজব লাগে না এখন।

দু'জন মুখোমুখি বসলাম। মেনুটা মুখের সামনে তুলে ধরলাম যেন ওর সাথে চোখাচোখি না হয়।

"চাইলে লুকোতে পারিস। কিন্তু আমি ব্যাপারটা জানি।"

মেনুটা নিচে নামালাম।

"এটা তেমন কিছু না, কিংবা হয়ত কিছু। তবে চিন্তা করার মতো কিছু না," আমি বললাম। আবারও মেনুটা দিয়ে আড়াল করলাম।

"ইন্ডিয়ান পুরুষদের মাঝে একটা অলিখিত নিয়ম আছে, সেটা তুই মানছিস না।"

"কিসের নিয়ম?" বলে মেনুটা টেবিলে আছাড় মেরে রেখে দিলাম।

"তোর সবচেয়ে কাছের বন্ধুর বোনকে মনে জায়গা দিতে পারিস না। এটা প্রোটোকলের বাইরে।"

"প্রোটোকল: সেটা আবার কী, আমরা কি সেনাবাহিনীতে আছি নাকি? তাকে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে জায়গা দেই নি। সে-ই আমাকে তার মনে জায়গা দিয়েছে," আমি বেশ জোর দিয়ে বললাম।

"কিন্তু ওর হৃদয়ে বিদ্ধ করার সুযোগটা তো তু-ই ক'রে দিয়েছিস।"

"আসলে বিদ্ধ মানে ঠিক আঘাত করা নয়। কোন ব্যথা লাগে নি এর জন্য। বরং ভালই লেগেছে," আমি বললাম। টেবিলে রাখা দাঁতের খিলাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম যেন ওর চোখের দিকে তাকাতে না হয়।

"ধুর শালা, কত দূর এগিয়েছিস তোরা?"

"কি? এই অমি, যা ইশকে ডেকে নিয়ে আয় খাওয়ার জন্য। আমরা যে এখানে আছি সেটা তো ও জানে না।"

"হ্যা, ও আসলেই জানে না," বলে অমি চলে গেল।

আমাদের কাছে একটা জুয়ার টেবিলে একদল লোক হৈ-চৈ ক'রে খেলা করছে। ইশের আসতে এখনও পাঁচ মিনিট লাগবে। চিন্তা বেঁধে গেল মাথায়। অমি কি ইশের সাথে উল্টোপাল্টা কিছু বলবে? না, অমি অতো বোকা না।

অমি এবং ইশ হাসতে হাসতে ভেতরে ঢুকল। যাক, সব কিছু ঠিক আছে তাহলে।

"হগ্‌স ব্রিদ? একটা রেস্টুরেন্টের জন্য এর চেয়ে বাজে কোন নাম ভাবতে পারিস?" বলে ইশ হাসল।

"পারি, আমি পারি," অমি বলল।

"তাহলে আর ও কথা বলিস না। যাহোক, টয়লেটটা কোথায়? আমাকে একটু জলবিয়োগ করতে হবে..." ইশ বলল।

"ওই তো, ওখানে," তার কথার মাঝে বাঁধা দিয়ে কোণার দিকে জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম।

"তুই কী ওর সাথে খুব ঘণিষ্ঠ?" অমি আরম্ভ করল।

"তুই কী ওকে কিছু বলেছিস?" জানতে চাইলাম আমি।

"তুই কি বোকা ভাবিস আমাকে?"

"হ্যা।"

"বলি নি। এখন বল, সম্পর্ক কোন্ পর্যায়েআছে?" অমি বলল।

"পর্যায় মানে?" আমি বললাম।

"শুধুমাত্র তাকানোর একটা পর্যায় আছে। পুরনো শহরের সবচেয়ে কমন পর্যায়। তারপর শুধু-কথা-বলি পর্যায়। তারপর একটা..."

"ওরকম কিছু না। আমাদের ব্যাপারটা একেবারেই ভিন্ন।"

"ধুর শালা, ঘটনা তাহলে অনেক দূর এগিয়েছে। ঠিক কখন থেকে ভাবছিস তোদের সম্পর্কটা দুনিয়ার অন্য যে কারো চাইতে ভিন্ন? পাগলামি করিস না, ঠিক আছে?"

"পাগলামি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমি সামনে এসে ফিসফিস ক'রে বলল, "পাগলামি মানে বুঝিস না তুই? ইশ নয়তো ওর বাবা তোকে মেরে ফেলবে। গাড়ি নিয়ে আসে যে ছেলেটা তার কথা মনে আছে? আমার কথা বিশ্বাস কর, ওই ছেলেটা কিংবা ওই গাড়ির মত অবস্থা হোক, তা নিশ্চয় চাস না।"

"কী আর বলবো, এটা আসলে তেমন কিছু না। আমরা শুধুই ভাল বন্ধু," বলে টয়লেটের দিকে তাকালাম।

"শুধু ভাল বন্ধু এই কথাটা নিষিদ্ধ করে দেয়া দরকার। এর চেয়ে বিভ্রান্তিকর কিছু নেই। আরে বাবা, তুই ওর শিক্ষক। আর ওর বয়স কত? সতেরো?"

"কয়েক মাসের মধ্যে আঠারোয় পা দেবে।"

"ওহ্ দারুণ," বলল অমি।

ইশ টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল। জুয়া খেলছে যে অস্ট্রেলিয়গুলো তাদের সাথে ঠাট্টা ইয়ার্কিতে লেগে গেছে সে। আমি অমির দিকে তাকালাম।

"আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না। চিন্তা করিস না, পাগলামি কিছু করব না। ও অঙ্কে খুব দুর্বল। জানি না কেন যে ওকে পড়াতে রাজি হলাম।"

"তাহলে পড়ানো বন্ধ করে দে, নাকি?" বলল অমি।

"খাবি? আমার এখনই খাওয়া দরকার," বলে সেলুতে টোকা দিলাম।

"আমি শুধু বলছি...."

"ইশ," বারের ভেতরে চিৎকার দিয়ে বললাম, "তুই কোন্‌টা চাস? রসুনের রুটি সবচেয়ে সস্তা।"

"যাইহোক, তোর ওপরে বিশ্বাস আছে, তুই যা পারিস অর্ডার দে, সমস্যা নেই," চিৎকার দিয়ে জবাব দিল সে। অস্ট্রেলিয়ান লোকগুলোর সাথে জুয়া খেলতে শুরু করে দিয়েছে এখন।

*

"এখানকার বাড়িঘরগুলো বিশাল," আমি বললাম, ডাবল-বে নামক একটা ধনী এলাকার পাশ দিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছি আমরা।

রবিবার আমাদের শেষ দিন। ওই দিন সকালের নাস্তা করানোর জন্য ফ্রেড আমাদের গাড়িতে ক'রে নিয়ে এসেছে। ইশ, অমি আর আলী ফ্রেডের সাব কনভার্টিবল গাড়িনর পেছনের দিকে বসেছে, আর আমি সামনে। সিডনির ভোর বেলার রাস্তা দিয়ে গাড়িতে ক'রে যাচ্ছি আমরা। চুলের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয় যাচ্ছে।

"কিন্তু বেশির ভাগ লোকই সাধারণ ছিমছাম জায়গায় বাস করে," ফ্রেড বলল। "অস্ট্রেলিয়ায় কে কত টাকা অয়র করে বা কোন গাড়ি চালায় এই নিয়ে আমরা গর্ব করি না। এমনকি কে কী চাকরি করে, লোকে তাও জিজ্ঞেস করবে না। বেশির ভাগ সময় লোকজন কী জিজ্ঞেস করে জানো?"

"কী?" ইশ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

" 'আপনি কি খেলেন?' এটাই তারা জানতে চায়," বলল ফ্রেড।

"অস্ট্রেলিয়া আমার খুব ভাল লাগছে। ইন্ডিয়াও যেন একই স্পিরিট নিয়ে ক্রিকেটে এগিয়ে যায়। সেই কামনাই করি," ইশ সামনের দিকে ঝুঁকে বললো।

"এখানে খেলাধুলা হচ্ছে জাতীয় উন্মাদনা," ফ্রেড বলল। "তোমাদের দেশের উন্মাদনা কোন্ বিষয়ে?"

"বহু লোক, বহু রকমের উন্মাদনা। এইটাই হল সমস্যা," বলল ইশ।

"কিন্তু ধর্ম আর রাজনীতির চেয়ে বড় উন্মাদনা আর নেই। আর এই দুটো এক সাথে হলে উন্মাদনাটা আরো প্রকট হয়ে ওঠে," আমি বললাম।

"আমি এসব জিনিস থেকে দূরে থাকি। অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতি কৌতুক ছাড়া আর কিছু না," ইঞ্জিন বন্ধ করতে করতে বলল ফ্রেড।

পারামাত্তা পার্ক নামে একটা জায়গায় গাড়ি পার্ক ক'রে রাখলাম আমরা। ফ্রেড আমাদের ওল্ড কলোনিয়াল হাউজের ল্যাচান'স রেস্টুরেন্টে নিয়ে এসেছে। ভেতরে গিয়ে দেখি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে দু'জন লোক।

"সুপ্রভাত, মিঃ গৃনার আর মিঃ বাটলার," ফ্রেড বয়স্ক দুই লোকের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল।

"মেধাবী ছেলেটা এই?" মিঃ গৃনার আলীর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল।

"হ্যা, উপরওয়ালা যে রকম মেধা দিয়ে পাঠিয়েছে সেরকমই," আমাদের নিয়ে টেবিলে বসতে বসতে বলল ফ্রেড।

"এই দুই ভদ্রলোকই তোমাদের টিকেট পেতে সাহায্য করেছিল। আমার সাবেক বান্ধবী নয়," বলে ফ্রেড আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

"কী?" বলল ইশ। ফ্রেড আমাদের কেন দাওয়াত করেছে তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম আমরা। শুধু এক সপ্তাহ খেলার জন্য সে আমাদের নিয়ে আসে নি।

"গোয়া থেকে যে ফোন করেছিলাম মনে আছে? সেটা করেছিলাম এই ভদ্রলোকের কাছেই," ফ্রেড বলল।

"মিঃ গৃনার অস্ট্রেলিয়ান স্পোর্টস একাডেমির চেয়ারম্যান এবং মিঃ কাটলার AIS স্কলারশিপ প্রোগ্রামের প্রধান," ফ্রেড কিছু টোস্টে মাখন মাখিয়ে নিল। "আলীর ব্যাপারে আমি তাদেরকে বলেছিলাম। সে কতটা ভাল–সত্যিকারেই ভাল এবং ঠিকঠাক প্রশিক্ষণ পেলে সে অনেক দূর যেতে পারবে এই সব আর কি।"

দেখলাম ইশের মুখ আশায় জ্বলজ্বল করে উঠছে। *ওরা কি আলীকে স্পন্সর করবে?*

"সে যদি ফ্রেড এবং তার সাথের যেসব ছেলে আপনাদের সাথে খেলেছে তাদের মত ভাল হয়, ধরেন আপনারা সে রকমই," মিঃ গৃনার বলল, "তাহলে যতটুকু পারি আমাদের সাহায্য করা উচিৎ।"

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ," ইশ বললে ফ্রেড তাকে থামিয়ে দিল। বেশি উত্তেজিত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়াটা সবসময়ই ইশের একটা সমস্যা। তার বোনেরও একই অবস্থা। ব্যাপারটা হয়ত বংশগত।

"আপনি জানেন," মিঃ বাটলার তার গলা পরিষ্কার করে নিল, "বিভিন্ন স্টেট একাডেমি থেকে AIS প্রার্থী বাছাই করে। আমি আলীকে বাছাই করতে পারি। অবশ্য আলী অস্ট্রেলিয়ার কোন স্টেটে বাস করে না।"

"তো?" বলল ইশ।

"AIS-এর নিয়ম অনুযায়ী স্কলারশিপ পেতে হলে তাকে অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী হতে হবে অথবা অন্তত অধিবাসী হওয়ার প্রক্রিয়াধীন থাকতে হবে।"

"কোন ব্যতিক্রম করা যাবে না?" আমি বললাম। অমি খাওয়া নিয়ে খুব ব্যস্ত ব'লে কথা বলতে পারছে না। পুরো ভ্রমণের সময়টাতে অমি এবং আলী খুব কমই কথা বলেছে। অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চারণ রীতিতে তারা বিব্রত।

"তো, তার জন্য এই একটা উপায়ই আছে," মিঃ কাটলার কথাটা বলেই একটা নথি বের করে সেটা খুলে টেবিলের উপরে কিছু ফর্ম রেখে দিল।

"নতুবা কাটলারকে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে অনেক কলকাঠি পোড়াতে হবে," বন্ধুত্বসুলভ হাসি দিয়ে বলল মিঃ গৃনার।

"হ্যা, এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্বের ফর্ম, আপনারা হয়ত জানেন, দুনিয়ার বহুলোক এটা চায়। তবে অসম্ভব মেধাবী হওয়ার কারণে আমরা আলীকে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব দিচ্ছি।"

টেবিলের উপরে ফর্মগুলো দেখে আলী এবং অমি খাওয়া থামিয়ে দিল।

"ও অস্ট্রেলিয়ান হয়ে যাবে?" অমি বলল।

"সে একজন চ্যাম্পিয়ন হবে," বলল ফ্রেড।

"তার বাবা-মার'ও এখানে বসবাসের অধিকার থাকবে। আর ইশ, আপনি... আপনার বন্ধুরা যারা এখানে আছেন, তারাও দরখাস্ত করতে পারেন। আমরা সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করব। ভাল সম্ভাবনা আছে," মিঃ কাটলার বলল।

"তোমরা তো অস্ট্রেলিয়াকে খুবই পছন্দ কর," ইশের দিকে চোখ টিপে বলল ফ্রেড।

"ছেলেটার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন। যা শুনেছি, ওর সঙ্গতি খুবই কম," মিঃ কাটলার বলল।

ওরা গরীব অবস্থার কথা বুঝাচ্ছে আর কি। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। আলীর জীবনটাই পাল্টে যাবে। "তাদের কথায় যুক্তি আছে," ইশকে বললাম আমি। এখনও ওকে দেখে চরম বিস্মিত মনে হচ্ছে।

"আপনারা আলীকেই আগে জিজ্ঞেস করেন না কেন? তার জীবন, সিদ্ধান্তও তারই," মিঃ গৃনার বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যা, কোন চাপ দেওয়া হচ্ছে না," দু'হাতের তালু উঁচিয়ে ফ্রেড বলল।

আমরা সহজ কথায় আলীকে অফারটা বুঝিয়ে বললাম। ওয়েটার এসে আমাদের প্লেটগুলো সরিয়ে নিয়ে গেলো।

"তাহলে আলী...তুমি কি চাও?" ইশ বলল।

"দলে ঢুকতে পারলে কাদের পক্ষ হয়ে খেলব আমি?" জানতে চাইল আলী।

"অস্ট্রেলিয়া," মিঃ কাটলার বলল।

"কিন্তু আমি তো ইন্ডিয়ান," সরলভাবে বলল আলী।

"তবে তুমি অস্ট্রেলিয়ানও হতে পারবে। আমাদের সমাজ বহু জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উটেছে," মিঃ গৃনার বলল।

"না," দৃঢ়ভাবে বলল আলী।

"কি?"

"আমি ইন্ডিয়ান। আমি ইন্ডিয়ার জন্য খেলতে চাই। অন্য কারোর জন্য না।"

"কিন্তু বাবা, তোমার নিজের দেশের মতই সম্মান পাবে এখানে। আর সেইসাথে কিছু ভাল কোচিংও পাবে," মিঃ গৃনার বলল।

"আমার ভাল কোচ আছে," বলে আলী ইশের দিকে তাকালে ইশ হেসে ফেলল। জীবনে এতটা গর্বের মুহূর্ত তার আর আসে নি।

"তোমার দেশে থেকে খুব বেশি ভাল করা কঠিন হয়ে যাবে। তোমার কোচ সেটা জানে," মিঃ কাটলার বলল।

একটু থেমে ধীরে ধীরে কথা বলল আলী। "খেলোয়াড় না হতে পারলে সমস্যা নেই কিন্তু ইন্ডিয়ান না হতে পারলে অনেক সমস্যা," আলী বলল। হয়ত সে খুব বুঝেশুনে কথাটা বলে নি তবে এ যাবত কাল এটাই তার সচেয়ে গভীর কথা।

"কিন্তু," মিঃ কাটলার সামনে ঝুঁকে আলীর কাঁধের উপর হাত রেখে বলতেই সে ইশের কাছে গিয়ে তার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

কর্মকর্তা দু'জন আধা ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করল, জিজ্ঞেস করল আমরা আলীর বাবা-মা'র সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে পারি কিনা। কিন্তু অবশেষে বুঝতে পারল এতে করে মোটের উপরে তেমন কোন কাজ হবে না। ভদ্র কথোপকথনটা চালিয়ে গেলাম আমি।

"আমরা খুবই দুঃখিত। বুঝতে পারছি, এটা বড়, অনেক বড় সম্মান," আমি বললাম, "দুঃখিত ফ্রেড। আপনি অনেক করেছেন আমাদের জন্য।"

"উদ্বেগের কিছু নেই। তোমাদের এই বাচ্চা ছেলেটা ভাল এবং সেও এটা জানে। এক বিলিয়ন লোককে যে গর্বিত করতে পারবে সে আমাদের নিয়ে কেন মাথা ঘামাতে যাবে?" বলে ফ্রেড হাসল। সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে কিনা বুঝতে দিল না। বোধহয় একেই বলে স্পোর্টসম্যানের স্পিরিট–আমার মনে হল!

দেখলাম কর্মকর্তা দু'জন তাদের গাড়ির কাছে এগিয়ে যাচ্ছে।

"কিছু মনে করবেন না, বন্ধু। হয়ত পরের বার, এক্ষেত্রে পরের জীবনে। আপনারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ট্রেলিয়ানও হতে পারেন, কে জানে?" রূপালি রঙের হোন্ডা অ্যাকর্ডের ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে মিঃ গৃনার বলল।

"আমি সেটা হতে চাই না," ইশের পেছন থেকে মুখ বের ক'রে বলল আলী।

"কি?"

"পরের জীবনে আমি অস্ট্রেলিয়ান হতে চাই না। আরো একশ বার জীবন পেলেও আমি প্রতিবারই ইন্ডিয়ান হতে চাই," বলল আমাদের পুচকে আলী।

আমাদের উপর দিয়ে একটা উড়োজাহাজ উড়ে গেলে আকাশের দিকে তাকালাম আমি। আজ রাতে বাড়ি যাব মনে করে খুশি লাগছে খুব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৫

বিদ্যা, বিদ্যা, বিদ্যা–মাথার মধ্যে অ্যালার্মের মত তার নাম বেজে চলেছে। লোকজন টমেটো বিক্রি করছে, বাচ্চারা মার্বেল খেলছে তার ভেতর দিয়েই দৌড়াতে দৌড়াতে যথাসময়ে তার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম।

বহু কাজ হাতে। সাপ্লায়াররা অপেক্ষায় আছে, স্টক পড়ে রয়েছে, অর্ডার রয়ে গেছে যেগুলো এখনও শুরু করা হয় নি। অবশ্য সব কিছু ছাপিয়ে আমার মধ্যে শুধু বিদ্যার চিন্তা। আমার সত্ত্বার একটা অংশ, যৌক্তিক অংশ বলছে, এটা খুব একটা ভাল কথা নয়। নারী বিষয়ক নির্বোধ ব্যাপার-স্যাপারে ব্যবসায়ীদের সময় নষ্ট করা উচিত না। কিন্তু আমরা সত্ত্বার আরেকটি অযৌক্তিক অংশ এটাকে খুবই ভালবাসছে। আর এই অংশটাই এই মুহূর্তে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিদ্যা কোথায়? নিচতলায় বেল চেপে তার জানালার দিকে তাকালাম।

"গোবিন্দ," বিদ্যার বাবা দরজা খুলে দিলে আমি ভেতরে গেলাম। যে মেয়েটার দিকে তোমার এত খেয়াল, তার বাড়ির কোন পুরুষ মানুষকে দেখলেই তোমার আত্মায় ভীতি সঞ্চার হয় কেন?

"কাকা বিদ্যা... টিউশনি," আমি বললাম।

"সে উপরের তলায় আছে," বারান্দায় আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে বলেই কফি টেবিল থেকে একটা খবরের কাগজ তুলে নিলেন তিনি। পুরনো দিনের লোকজন খবরের কাগজ এত পছন্দ করে কেন? খবর পড়তে ভালবাসে তারা, কিন্তু এ নিয়ে কী কাজ তাদের? বারান্দায় যাওয়ার জন্য ভেতরের সিঁড়ির দিকে গেলাম।

সিঁড়িতে উঠছি এ সময় আবার কথা বললেন তিনি। "কী অবস্থা তার? মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় উতরাতে পারবে তো?"

"ও খুবই ভাল ছাত্রি," আস্তে ক'রে বললাম।

"ওর অপদার্থ দাদার মতো নয় তাহলে," কাকা বললেন। আমাকে বাদ দিয়ে এবার খবরের কাগজের মধ্যে ডুব দিলেন ভদ্রলোক।

বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। বিমান-বালার মত হাসি নিয়ে বিদ্যা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। "আমার উন্মুক্ত টিউশনের জায়গায় স্বাগতম।" একটা সাদা প্লাস্টিকের চেয়ারে গিয়ে বসল। সাথে একটা টেবিল আছে আর সামনে একটা অতিরিক্ত চেয়ার। "আমার অবশ্য অনেক সন্দেহ ছিল," নোটবুকের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল সে।

টেবিলের নিচে থেকে বেরিয়ে এল ধোঁয়া। "এটা কি?" আমি বললাম।

"মশার কয়েল," নির্লিপ্তভাবে বলল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলের নিচে ঝুঁকে সবুজ কয়েলটা দেখতে পেলাম। ধিকিধিকি ক'রে জ্বলছে। দেখলাম খালি পায়ে আছে সে। পায়ের আঙুলের শুধু শীর্ষভাগে তার মার্কামারা মুক্তোর মত সাদা নখপালিশ দেওয়া আছে। "কয়েলটায় কাজে হচ্ছে না," নিচ থেকে মাথা বের ক'রে বললাম। "তোমার মাথার উপরে একদল *মজ্জি* দেখতে পাচ্ছি।"

"মজ্জি?"

"অস্ট্রেলিয়ায় মশাকে এ নামেই ডাকে," আমি বললাম।

"ওহ্, বিদেশের কথা উঠে গেল তাহলে। অস্ট্রেলিয়ায় কেমন মজা করলেন?"

"দারুণ," কথাটা বলেই তার দিকে তাকালাম। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলাম আমি। ওই ফোনকলের পর থেকে আর স্বাভাবিক হতে পারি নি। এরইমধ্যে আমি আমার কার্ড দেখিয়ে ফেলেছি। বুকের যতো কাছেই ধরে রাখি না কেন এখন সে সবই দেখে ফেলেছে।

তার পোশাক খেয়াল করলাম, আজ একটা নতুন টকটকে লাল এবং সাদা রঙের বন্ধিনী সালোয়ার কামিজ পরেছে। তার গলায় রক্তলাল বর্ণের অশ্রুবিন্দুর মত লকেট রয়েছে আর এর সাথে মিলিয়ে কানে পরেছে দুল। সদ্য স্নান ক'রে এসেছে। তার চুল থেকে কিছুটা ডেটল সাবান, হ্যা, ডেটল সাবানই হবে, তার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেকটা মেয়ের শরীর থেকেই স্নানের ঠিক পরেই অদ্ভুত একটা গন্ধ ছড়ায়। আমার মনে হয় এটা তাদের বোতলজাত করে বিক্রি করা উচিত।

"আপনি আমার উপহার এনেছেন," কথা বলল সে, নীরবতা ভাঙার জন্য কিংবা সেটাকে ভরিয়ে তোলার জন্য।

"হ্যা," আমি বললাম।

আমার জিন্সের পকেট থেকে ম্যাচবাক্সটা বের করার জন্য উঠে দাঁড়ালাম আমি।

"ব্লু অরেঞ্জ ক্যাফে, দারুণ," সে বলল। বাক্সটা নিয়ে তার সরু আঙুল দিয়ে খুলে ফেলল সেটা।

"ওয়াও, অস্ট্রেলিয়ার একটা সৈকত আমার হাতের মধ্যে," সে বলল, গর্ব ভরে হাতে ধরে রাখল সে। যেন কোন মহারাণীর চুরি করা হীরা তাকে উপহার দিয়েছি।

"নিজেকে বোকা বোকা লাগছে। ভাল কিছু আনা উচিত ছিল," আমি বললাম।

"না এটাই ঠিক আছে। ভেতরে দেখেন, একটা ছোট্ট খোলস আছে," আমাকে সামনে ঝুঁকে আসতে ইশারা করল সে। ম্যাচবাক্সের ভেতরটা দেখতে গিয়ে আমাদের মাথা আস্তে করে ঠোকা খেল একে অন্যের সাথে।

কাছে আসার কারণে তার পায়ের আঙুলের সাথে আমার আঙুলের ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেল।

"উফ্," পায়ের পাতা সরিয়ে নেওয়ার সময় বলল সে।

"কী?" আমি বললাম।

"কিছু না, মশায় কয়েল। আগুনে পা লেগে গেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সোজা হয়ে বসলাম। তার চুল থেকে পানির ফোঁটা আমার চুলে চলে এসেছে। তার মাথার উপরে যে মশার দল উড়ছিল তার অর্ধেকটা আমার মাথার উপরেও চলে এসেছে এখন।

"একেবারে সস্তায় কাজ সারলাম কেন?" বললাম আমি।

"ভালই হয়েছে। কল করলে তো কিছু খরচ হতো।"

"হ্যা, পাঁচ ডলার ষাট সেন্ট," আমি বললাম। পর মুহূর্তেই অ্যাকাউন্ট্যান্টের মত কথা বলার কারণে অনুতাপ বোধ হল।

"এই তো। যাহোক, জীবনের সেরা উপহারগুলো মাগনা হয়," বলল সে, তারপর চুল পেছনে টেনে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে ফেলল। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। ঠিক আছে, যথেষ্ট হয়েছে, আমার ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা মিঃ যুক্তিবাদী আমাকে একথাটা বলল। এবার পড়াশুনার সময় হয়েছে।

বইগুলো খুলতেই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল সে। "তো, কল করেছিলেন কেন?"

"সেটা তোমাকে বলেছি," মিনমিন ক'রে বললাম আমি।

"সত্যিই কি আপনি আমাকে মিস্ করছিলেন?" বলে তার তালু আমার হাতের উপরে রাখলে তৎক্ষণাত হাত গুটিয়ে নিলাম। তাকে খুব বিস্মিত দেখাল।

"আমি দুঃখিত, বিদ্যা। আমার এটা করা উচিত হবে না। আমার ব্যবসায় মন দেওয়া দরকার, এসব আমার জন্য নয়, কিন্তু..." বলে মুখ সরিয়ে ফেললাম। তার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারলাম না আমি। কিংবা বলা যায় সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে আমি আর কথা বলতে পারি না।

"ঠিক আছে, আপনার দুঃখিত হওয়ার দরকার নেই," বলল সে।

"না, ঠিক নেই, আবেগের জন্য কোন সময় আমার নেই," দৃঢ় গলায় বললাম, "আর এটাও কোনভাবেই উপযুক্ত জায়গা নয়। আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুর বোন? শালার...উফ্...দুঃখিত।"

ফিক ক'রে হেসে ফেলল সে।

"সিরিয়াস হও, বিদ্যা। এটা ঠিক না। আমি তোমার শিক্ষক। তোমার দাদা আমাকে বন্ধু হিসেবে বিশ্বাস করে, আমার অনেক দায়-দায়িত্ব আছে, আছে ঋণ, ব্যবসা, আর বিধবা মা। তোমার এখনও আঠারোও হয় নি।"

"দু'মাস," দুই আঙুল দেখালো সে, "দু'মাস পরেই আমার আঠারো হবে। আমার জন্য আরেকটা সুন্দর উপহার আনার সময়। যাহোক, বলেন..."

"আচ্ছা যাহোক। ব্যাপারটা হচ্ছে অযৌক্তিক আবেগে না জড়ানোর পেছনে উপযুক্ত কারণ আছে আমার। আর আমি চাই..."

উঠে আমি যে পাশে বসে আছি সেদিকে এসে আমার প্লাস্টিক চেয়ারের পলকা হাতলের উপরে বসলো সে। আমার মুখের উপরে তার আঙুল রেখে তার দু'হাতের তালুতে আমার মুখটা কাপের মত করে ধরল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি নিয়মিত দাঁড়ি কামান না, তাই না?" কথাটা বলে বাতাসে থুতুর ছোট ছোট বুদ্বুদ ছুড়ে দিল।

"কী?" তার দিকে তাকালাম।

"মনে হয় একটা মশা আমাকে চুমু খেতে গিয়ে মুখের ভেতর ঢুকে পড়েছে," বলে আবার থুথু ফেলল সে। "ওটা কি এখনও আমার মুখের ভেতর আছে?"

মুখ হা ক'রে কাছে নিয়ে এল। আমার ঠোঁটের চেয়ে তার ঠোঁট মাত্র আট মিলিমিটার দূরে।

খুব দ্রুতই সেই দূরত্ব ঘুচে গেল। জানি না, আমিই তার কাছে এসেছিলাম নাকি সে আমার কাছে এসেছিল। দূরত্ব এত অল্প হওয়ার কারণে মীমাংসা করা কঠিন, কে প্রথম উদ্যোগটা নিয়েছিল। আমার ঠোঁট দুটোর উপরে উষ্ণ কিছু অনুভব করলাম। বুঝলাম খুব কাছাকাছি চলে এসেছি, অথবা অনেক দূর চলে গেছি আমরা।

আবারও চুম্বন করলাম। আমাদের মাথার উপরে থাকা মশাগুলোও আমাদের সাথে যোগ দিল।

আমি হয়তো বলতে পারতাম, আমাদের প্রথমের চুম্বনের সময়ে আমি আকাশের নক্ষত্র দেখেছি, সুমধুর গান শুনতে পেয়েছি। কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের যেসব শব্দ রাজত্ব করছিল তার মধ্যে ছিল (ক) নিচ তলার রান্নাঘর থেকে বিদ্যার মায়ের প্রেসার কুকারের সিটির আওয়াজ (খ) আসন্ন নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন দলের অটো থেকে প্রচারণা চালানোর শব্দ এবং (গ) মশাদের নিরবচ্ছিন্ন গুঞ্জন। তবে চুম্বনের মাঝামাঝি থাকার সময় আওয়াজ আর দৃশ্যের অস্তিত্ব রইল না। একবার ঠিক ক'রে দেখে নিলাম অন্য বারান্দাগুলোও খালি কিনা। তারপর দু'চোখ বুজে ফেললাম।

"বিদ্যা, কী করছি আমরা," তাকে জড়িয়ে ধরেই বললাম। থামাতে পারছিলাম না। সম্ভাব্যতা, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি আর ক্যালকুলাস–এই সব ক্লাসে যে প্রবল অনুরাগ চাপা পড়ে ছিল তা-ই যেন তীব্রভাবে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

"দারুণ! অসম্ভব দারুণ," আমাকে অভয় দিতে দিতে চুমু খেতে লাগল সে।

আমরা দু'জন দু'জনকে ছেড়ে দিলাম কারণ প্রবল তীব্র আবেগে আক্রান্ত যারা হয় তাদেরও তো অক্সিজেন গ্রহণের দরকার পড়ে, নাকি! দাঁত বের ক'রে হাসি দিল সে।

আমি আমার কলম আর বই গুটিয়ে নিলাম। আজ রাতে আর অঙ্ক নয়।

"চোখের দিকে তাকাচ্ছ না কেন?" মন্তব্য করল সে। গলার স্বরে দুষ্টুমি।

কিছু বললাম না আমি।

"তুমি আমার চাইতে বয়সে বড় আর অঙ্কে আমার চাইতে একশগুণ ভাল। কিন্তু কিছু কিছু দিক দিয়ে আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি পরিপক্ক।"

"ওহ্, তাই নাকি?" পাঠ্যবইগুলো গোছগাছ করতে করতে মৃদুভাবে চ্যালেঞ্জ জানালাম আমি। আমার চিবুক ধরে উঁচু করে দিল সে।

"আমার বয়স আঠারোয় পড়বে। আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারব," বলল বিদ্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাকগ্রাউন্ডে নির্বাচনে ক্যাম্পেইনরত একটা অটো থেকে লাউড স্পিকারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। "ইলেকশনেও ভোট দিতে পারব আমি," সে বলে চলল, "ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারব, বিয়ে করতে পারব, আমি..."

"পড়াশুনা করতে পার। একটা ভাল কলেজে ভর্তির চেষ্টাও করতে পার," আমি বাঁধা দিয়ে বললাম।

সে হেসে ফেলল। আমরা উঠে বারান্দার পানির ট্যাঙ্কের কাছে চলে গেলাম, ট্যাঙ্কের গায়ে হেলান দিয়ে সূর্যাস্ত দেখলাম, গণিত বাদে আর সব কিছু নিয়ে কথা হল। অ্যাকাডেমির কথা, ফ্রেডের সাথে ডিনারের কথা, অস্ট্রেলিয়ার নীল আকাশের কথা, বোনডি সৈকতের দোআঁশলা পানির কথা–সব তাকে বললাম।

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল সে। বলল তার যদি ওই সৈকতে একটা বাড়ি থাকত তাহলে ভেতরের দেওয়ালগুলো গোলাপী আর হলুদ রঙ করে দিত সে। একটা ব্যাপার খুব বিস্ময়কর, কল্পিত কোন ব্যাপার নিয়ে মেয়েরা সাংঘাতিক রকম স্পষ্ট আর নির্দিষ্ট চিন্তা করতে পারে। "কফি খাবে?" বলল সে।

"নিচে যাবে এখন?" সহজাত প্রবৃত্তিবশত তার হাতটা ধরে বললাম। আমার ভেতরে একটা কণ্ঠস্বর এখনও বাধা দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই কণ্ঠে কোন জোর নেই এখন।

"না," পানির ট্যাঙ্কের নিচে আমার হাত টেনে ধরল সে।

পাঁচ ঘন ফুটের সিমেন্টের তৈরি পানির ট্যাঙ্কটা মাটির উপরে শক্ত কংক্রিটের থামের উপরে স্থাপিত। ট্যাঙ্ক আর মাটির মাঝখানটাতে চার ফুটের মত ফাঁকা জায়গা। ট্যাংকের নিচে মাটি উপরে বসতে পারি আমরা।

"ছোটবেলা থেকেই এ জায়গাটা আমার প্রিয়," বলল সে। তাকে অনুসরণ করে হাঁটু ভাজ করে আমিও ভেতরে ঢুকে পড়লাম। পিকনিকের একটা ঝাঁপি বের করল সে। থার্মোফ্লাস্ক, লাল প্লাস্টিক কাপ আর মেরি বিস্কুট রয়েছে ওটাতে।

"বিদ্যার চিলেকোঠা-ক্যাফেতে স্বাগতম, স্যার," বলে একটা কাপ আমার হাতে ধরিয়ে দিল।

তার দিকে তাকালাম। সে এত সুন্দরী যে অঙ্ক করা তার কাজ নয়। আমার মত আহম্মকদের জন্যেই অঙ্ক।

একটা চুমুক দিলাম। আমার ঠোঁটে এখনও তার ঠোঁটের শিহরণ অনুভব করতে পাচ্ছি। কনুইয়ের উপরে ভর দিয়ে আছি তবে কংক্রিটের মেঝের জন্য ব্যথা লাগছে।

"পরের বার গদি নিয়ে আসব," সে বলল।

"দারুণ হবে," আমি বললাম।

কফি শেষ করে বেরিয়ে এলাম আমরা। বারান্দার বাল্বটা জ্বেলে দিয়ে চুম্বন আর কফির কথা ভুলে যেতে পাঠ্যবইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলাম। জীবনে এই প্রথমবারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মত ইন্টিগ্রেশনের চিহ্নগুলো নীরস মনে হল। একটা পর্যায়ে এসে দেখা গেল অঙ্ক নামের জিনিসটা একেবারেই জঘন্য।

"ধন্যবাদ," আমি বললাম।

"কী জন্য?" বলল সে।

"কফি আর...তুমি তো জানই।"

সামনের ঝুঁকে এসে আমার গালে চুমু খেল সে। "উপহারের জন্য ধন্যবাদ। সত্যিকার ঘনিষ্ঠ-বন্ধুত্বের উপহার।"

সত্যিকার-ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, আরেকটা হাইফেনযুক্ত কথা। তার মানে উন্নতি হচ্ছে।

শোয়ার ঘরের ভেতর দিয়ে বাইরে যাওয়ার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলাম।

"কত ভাল, দায়িত্ববান ছেলে। ইশ ওর কাছ থেকে কিছুই শেখে নি।" আমার পেছনে দরজাটা বন্ধ হবার আগে শুনলাম বিদ্যার বাবা তার স্ত্রীকে কথাগুলো বলছেন।

*

এসএমএস-এ একের পর এক আলাপ চালিয়ে না গেলে আমার হিসেবগুলো আরও দ্রুত করতে পারতাম। পঞ্চমবারের মত ফোনটা বিপ্ ক'রে উঠল।

"কাকে এসএমএস করিস রে?" কাউন্টার থেকে অমি জিজ্ঞেস করল।

সন্ধ্যে ছ'টা তখন। দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে প্রায়। ইশ একটা KV'তে গিয়েছে, সন্ধ্যার আরতির জন্য অমি আগে ভাগে চলে যাবে। আমার চারপাশে দু'ডজন ইনভয়েস, নোটবুক, কলম আর একটা ক্যালকুলেটর ছড়ানো ছিটানো।

"কিছু না, একটা সাপ্লায়ারের সাথে দরাদরি হচ্ছে," ফোনটার আওয়াজ বন্ধ ক'রে রাখতে রাখতে আমি বললাম।

"কল কর," অমি বলল।

"তাহলে মনে হবে আমি বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছি, আমি চাচ্ছি বরং সে-ই প্রথমে কল করুক।"

"হিসেবগুলো আগে ক'রে ফেল, গোবিন্দ। অনেকগুলো অর্ডারের দাম শোধ হয় নি এখনও, সব জট পাকিয়ে আছে," বয়াম থেকে একটা ক্যান্ডি নিয়ে মুখে ঢুকাতে ঢুকাতে অমি বলল। ক্যান্ডি খাচ্ছে সেজন্য বাধা দিলাম না। এসএমএস থেকে ওর মনোযোগ সরানোর জন্য ক্যান্ডির মত তুচ্ছ জিনিস গচ্চায় যাক।

আমার ফোনের ডিসপ্লেটা আবার জ্বলে উঠল।

আমার জন্য দিন।
নিজের মত করে সেলিব্রেট করব।
কেক চও, নাকি চাও না??

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যার নাম্বারটা 'সাপ্লায়ায় বিদ্যানাথ' নামে ফোনে সেভ ক'রে রেখেছি। পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই। আর পড়ার পরপরই তার সব মেসেজ মুছে ফেলি।

"আশা করি ইশের বোন থেকে দূরে আছিস?" অমি বলল। মেসেজগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম, কথাটা শুনে আমার দু'হাত জমে গেল। মনে মনে বললাম, এটা কাকতালীয় ব্যাপার। কাকে মেসেজ করছি অমি জানে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখ।

এসএমএস'টা জবাব দিলাম।

ঠিক আছে, যা চাও পাবে। ছোট্ট একটা।
এখন আমাকে কাজ করতে দাও। আর তুমিও
পড়াশোনা কর।

ফোনটা পাশে রেখে দিলাম। আমার জীবনে হাস্যোজ্জ্বল মুখের আনাগোনা শুরু হয়েছে।

"আমি তাকে পড়াই, অমি; তার ভর্তি পরীক্ষার জন্য কয়েকটা মাস মাত্র," কথটা বলেই কাগজপত্রের কাজের মধ্যে ডুবে গেলাম আমি।

"বিদ্যা কি..." অমি শুরু করল।

"হিসেব নিকেশগুলো করব নাকি আমার ছাত্রি নিয়ে গল্প শুরু করব?" অমির দিকে শক্ত চোখে তাকালাম।

মামা দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের দোকানে এলেন। "তাড়াতাড়ি টিভিটা চালু কর।"

"নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন-টাওয়ারে দুটো প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে; বিবিসি খবরে দেখাচ্ছে," বললেন। সরাসরি সম্প্রচার দেখে সায়েন্স-ফিকশন চলচ্চিত্রের সাথে মেলালেও অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। শত-তলা লম্বা টুইন টাওয়ারের মাঝামাঝি অংশ বিধ্বস্ত হয়ে আছে।

"পরপর দুটো প্লেন। মনে হচ্ছে পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা এটা," টিভিতে একজন সামরিক গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ একথা বললেন।

"পৃথিবীটা আর কখনই আগের মতন হবে না," বললেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।

ঝাঁপ অর্ধেক বন্ধ ক'রে রাখলাম আমরা। মন্দিরের প্রত্যেকেই টিভি সেটের চারপাশে ভীড় করেছে। রিপ্লেতে টাওয়ারের ভেঙে পড়ার দৃশ্য বার বার দেখানো হচ্ছে। নিউইয়র্কে রাস্তাগুলো ধোঁয়া, ধুলোবালি আর কংক্রিটের ধুলোয় ভরে গেছে। রিপোর্টে বলছে, হাজার হাজার লোক নাকি মারা গেছে।

"কী হল এটা..." দোকানে ফিরে এসে বলল ইশ।

"মুসলমান সন্ত্রাসীরা করেছে, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি," মামা বললেন। তার ফোনটা বেজে উঠলে নাম্বারটা দেখলেন তিনি। তারপর ফোনে মনোযোগ দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পারেখজি?" মামা বললেন, বিনয়গলিত কণ্ঠ তার।

পারেখজির কথা আমি শুনতে পারি নি।

"আমি ওটাই দেখছি এখন," মামা বললেন, "তারা তো মারাত্মক একটা হুমকি হয়ে উঠেছে। হ্যা, হ্যা, ইলেকশনের জন্য আমরা তৈরি, পারেখজি, হ্যা," বুকের ঘাম মুছতে মুছতে মামা বললেন, "বেলরামপুর কেস কোন সমস্যা নয়...হ্যা, আশেপাশের এলাকাগুলোতে কাজ করা দরকার। কিন্তু হাসমুখজিকে তো আপনি চেনেন। উনি অতটা সময় দেন না..."

বিট্টু মামা আমাদের থেকে একটু দূরে সরে গেলেন। পরের সপ্তাহের ইলেকশন নিয়ে পারেখজি তাকে টিপস দিলেন মনে হয়।

সেদিনই রাতের বেলায় গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহভাজনদের ছবি প্রকাশ করা হয়। কয়েক মাস আগে চারটা মুসলিম ছেলে একটা ফ্লাইং স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। অফিস বক্স কাটার ছুরি ব্যবহার করে বিমানটা ছিনতাই করে তারা, তারপর পৃথিবীর অন্যতম দর্শনীয় মানবসৃষ্ট দুর্যোগের জন্ম দেয়। বিন লাদেন নামের কাঠির মত পাতলা একটা লোক শৌখিন ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করেছে, বিশাল এই ঘটনাটি পুরোপুরি তার পরিকল্পনা।

"কী ব্যাপার?" মামা কল শেষ করলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করল।

"হাস মুখজি সবকিছুই খুব সহজ করে দেখেন। নিজের নির্বাচনী এলাকার রাস্তাঘাটে তাকে দেখা যায় না।"

"পারেখজি সন্তুষ্ট না?" অমি বলল।

"আমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট। খুব বেশি উদ্বিগ্ন না, উপ-নির্বাচন শুধু গুজরাটের দুটো আসনে। আসল ইলেকশন তো পরের বছর।"

মামার পিঠ চাপড়ে দিল অমি, "আমাদের বাড়িতে ও একটা MLA হবে।"

"আর কোন ধরনের সাহায্য দরকার?" অমি জিজ্ঞেস করল।

"অনেক করেছিস," বলে মামা অমিকে চুমু খেলেন, "কিন্তু পরের সপ্তাহে বাড়তি কিছু কাজ করতে হবে। পারেখজি বললেন এই হামলা হওয়ার কারণে আমাদের সুবিধা হতে পারে। পূজার সবাইকে ঘটনাটা বলতে হবে।" দোকান ছেড়ে তারা দু'জন মন্দিরে চলে গেল।

"তোর ফোন জ্বলে উঠেছে। আওয়াজ বন্ধ করা নাকি?" ইশ বলল। মেঝের ছড়ানো সবগুলো ইনভয়েস এক জায়গায় করছে সে। রাতের মত দোকানটা বন্ধ করছি আমরা।

"ওহ্, তাহলে নিশ্চয় ভুলে আওয়াজ বন্ধ ক'রে রেখেছি," বলে মোবাইলটা হাতে তুলে নিলাম, "একটা সাপ্লায়ার মেসেজ পাঠিয়েছে।"

সাপ্লায়ার বিদ্যানাথের মেসেজটা পড়লাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়তে গেলে তোমাকে চুমু খাওয়ার কথা
মনে পড়ে যায়। শুধু তোমার কথা ভাবি।
খুব মিস্ করছি।

ফোনটা পকেটে রেখে দিলাম।
"কী? তোর কাছে কিছু বিক্রি করতে চাচ্ছে?" ইশ বলল।
"হ্যা, খুব জোরাজুরি করছে," ক্যাশবাক্স বন্ধ করতে করতে বললাম।

*

"আমি এটা জানতাম, বুড়ো লোকটা কথা শুনবে না," মামা বললেন।

একবার রাগ হচ্ছে, আরেকবার কান্না পাচ্ছে তার। তার মত শক্ত প্রকৃতির বয়সী মানুষের জন্য কান্নাকাটি করা কঠিন ব্যাপার, অবশ্য মাসের পরে মাস কাজ করে তারপর নির্বাচনে হেরে যাওয়াটা তারচেয়েও কঠিন। ভোট গণনার বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। নির্বাচন কর্মকর্তারা এখনও শেষ কয়টা ভোট গণে শেষ করতে পারে নি। তারপরও সেকুলার পার্টি বাইরে ঢোল পেটানো শুরু করে দিয়েছে।

"বেলরামপুরের ভোটগুলো দেখ," মামা ব্যালট-বাক্সগুলোর দিকে ইশারা করলেন। "হিন্দু পার্টির জয় নিশ্চিত। ঐটা আমার এলাকা। বাকি দুই এলাকায় দায়িত্ব আমার কাছে দিলে ওখানেও বেশির ভাগ ভোট আমরাই পেতাম।"

তার পক্ষের বিশ জনের কিছু বেশি লোক মাথা নিচু ক'রে আছে।

"অন্যান্য এলাকার কী হয়েছে দেখ। ঐ মুসলমান প্রফেসরের সারা দিন কোন কাজ নেই। বুড়ো মহিলাদের সাথে পর্যন্ত দেখা করেছে সে। কিন্তু হাসমুখজি? হুহ, উঁচু জাত হওয়ার কারণে উপরি উপরি ভাব। রাস্তাঘাটে হাঁটাহাটি করতে পারবে না। তার ধারণা গাড়ির ভেতর থেকে হাত নাড়িয়ে ভোটে জেতা যায়। ভোট গণনায় দু'ঘণ্টা আগেই আবার চলে গেছে।"

হাত দিয়ে মুখ মুছে মামা বলে চললেন। "আমার পরিবার কি পুরোহিত না? মুসলিম মহল্লার পয়োঃনালীতে ভরা সব গলি আছে, সেখানে কি আমি যাই নি? হিন্দু ভোটার কি সেখানে নেই? তাহলে সে কেন যায় নি?"

সেকুলার পার্টির কর্মীরা মামার দলকে নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল। এদিকে মামার দলের কিছু লোক ঢোল বাদকদের উত্যক্ত করলে অবস্থা গরম হয়ে গেল একেবারে।

"অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে," অমিকে কানে কানে বললাম, "চল এখান থেকে ভাগি।"

"আমি যেতে পারব না। আমাকে মামার দরকার," অমি বলল।

ভোট গণনার স্টেশনের সামনে একটা সাদা মার্সিডিজ এসে থামলে বডিগার্ডদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা জিপও এল তার সাথে। মার্সিডিজের দরজা খুলে গেলে গার্ডরা চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল। পারেখজি গাড়ি থেকে বাইরে নামলেন।

মামা দৌড়ে পারেখজির কাছে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে বললেন, "আমি দোষী আমাকে শাস্তি দিন।" তার গলা ভারি শোনাচ্ছে।

পারেখজি তার দু'হাত মামার মাথার উপরে রাখলেন। "ওঠো, বিট্টু।"

"না, না, আমি এখানেই মরতে চাই। সবচেয়ে ভাল মানুষটাকে ডুবিয়েছি আমি।"

পারেখজি অল্পবয়সী ছেলেগুলোর দিকে শক্ত দৃষ্টিতে তাকালে সবাই একটু পিছিয়ে গেল। কাঁধ ধরে মামাকে উপরে তুললেন তিনি, "চলো, বিশালে ডিনার করতে যাব আমরা। আমাদের কিছু আলাপ আলোচনা করা দরকার।"

মামা পারেখজির কানের কাছে সরে আসলেন। এখনও মাথা নিচু করে আছেন তিনি।

"এসো, বাবা," পারেখজি অমিকে বললে ইশ এবং আমি একে অন্যের দিকে তাকালাম। সম্ভবত ইশ এবং আমার চলে যাওয়া উচিত।

"ইশ আর গোবিন্দ কি সাথে যেতে পারবে? গান্ধিনগরে এসেছিল ওরা," অমি বলল। ভাবলাম তিনি বুঝি চাইছেন আমরাও তাদের সাথে বিশালে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করি। বিশাল রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া করাটা সাধারণত আমাদের পক্ষে বেশ ব্যয়বহুল ব্যপার।

পারেখজি আমাদের দিকে তাকিয়ে চেনার চেষ্টা করলেন তবে চিনতে পারলেন কিনা জানি না।

"জিপে উঠে পড়," তিনি বললেন।

বিশাল ভিলেজ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড উটেনসিল্স মিউজিয়াম আহমেদাবাদের প্রান্তদেশে সারখেজ গ্রামে অবস্থিত। হস্তশিল্প যাদুঘর এবং গ্রামের সালিসখানা ছাড়াও এখানে একটা জাতিগত রেস্টুরেন্ট আছে, খাঁটি গুজরাটি রান্না পাওয়া যায় সেখানে।

একটা সেমি প্রাইভেট কামরায় মাটির মেঝেতে বসার ব্যবস্থা। সেখানেই বসলাম আমরা। পারেখজির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকজন বাইরে বাচ্চাদের পুতুল নাচের জায়গার কাছাকাছি দাঁড়াল। তাদের হাতের বন্দুক দেখেই পরিচারকরা অতিথির গুরুত্ব বুঝতে পারল আর সেই সাথে আমাদের জন্য তাতে ক'রে সবকিছুর সুবন্দোবস্ত হল সঙ্গে সঙ্গে। কয়েক মিনিটের মধ্যে দু'ডজন খাবার আমাদের সামনে পরিবেশন করা হল।

"খাও, রাজনীতি নিয়ে এত বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়বে না। আবেগী কথা বার্তা ভাল, কিন্তু মনে মনে সবসময় সোজা চিন্তা করবে," পারেখজি মামাকে বোঝালেন।

ধোকলা, খান্দভি, ঘুগরা, গোটা, দেলওয়াড়া এবং আরো কিছু গুজরাটি জলখাবার গোগ্রাসে খেয়ে নিলাম আমরা। আসল খাবার আসার আগেই আমার পেট ভরে গেল।

"এখন শোন," পুদিনা-চায়ের গ্লাসটা শেষ ক'রে পারেখজি বললেন, "সবকিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেরকম দেখা যায়, আসলে সেরকম নয়। হাসমুখজির হেরে যাওয়ার পেছনে একটা কাহিনী আছে। আমরা সেটা আগে থেকেই আশা করছিলাম।"

"কী?" মামা বললেন। অমি, ইশ আর আমি গোগ্রাসে খাবার গিলে চলছি।

"পার্টিতে সিনিয়র হওয়ার কারণে হাসমুখজি টিকিট পেয়েছেন, কিন্তু তিনি পুরনো ভাবধারার যে গ্রুপটা আছে তাদেরই একজন। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও তাই। দিল্লিতে আমাদের হাই-কমান্ড ওদের ওপরে সন্তুষ্ট নয়।"

"সন্তুষ্ট নয়?" মামা নির্বোধের মত করে কথাটা দ্বিরুক্ত করলেন।

"না। আমরা হিন্দু পার্টি হতে পারি কিন্তু তার মানে এই নয়, আমরা শুধু সারাদিন ধর্মই প্রচার করে যাব, কোন কাজ করব না, গুজরাট ব্যবসায়ীদের জায়গা, কোন অলস জায়গা এটা নয়। ভূমিকম্প নিয়ে প্রশাসন যেভাবে কাজ করেছে, হাইকমান্ডের সেটা পছন্দ হয় নি। লোকজনের তাতে করে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আমি জানি তোমাদেরও অনেক ক্ষতি হয়েছে," আমাদের দিকে ফিরে বললেন তিনি।

আমরা মাথা নেড়ে সায় দিলাম। ভূমিকম্পের কথাটা এখনও আমাদের মনে দগদগে ঘা হয়ে আছে।

"এই আসনগুলোতে উপ-নির্বাচন আশীর্বাদ হিসেবে এসেছিল। পুরাতনপন্থীরা তাদের প্রার্থী দাঁড় করাল। আমরা জানি, তারা দুর্বল। অবশ্য বিট্টুর মত পরিশ্রমী লোকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু যে ক্যান্ডিডেট ফুলবাবু, সে ফুলবাবুই। এই জন্যই দুটো আসনেই আমরা হেরে গেছি। আসল নির্বাচনের এখনও বার মাস বাকি রয়েছে। পুরো দলটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। হাই কমান্ডের জন্যেও শেষমেষ একটা পরিবর্তন আনার সুযোগ তৈরি হয়েছে এখন।"

"কী পরিবর্তন?" মামা বললেন।

"মুখ্যমন্ত্রী পাল্টাবেন তারা।"

"কী? দুটো আসনে হেরে যাওয়ার জন্য? সর্বমোট সিট সংখ্যা হচ্ছে..."

"একশ আশিরও বেশি," বজরা রাতি'তে কামড় বসাতে বসাতে পারেখজি বললেন, "কিন্তু যেমনটা বলেছি। পাল্টানোর একটা কারণ এখানে তৈরি হয়েছে। আর গুজরাট আমাদের পার্টির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এটা হারালে আমাদের চলবে না।"

খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর একটু দেরি হচ্ছে দেখে পারেখজি বললেন, "দই-টই দেবে না?"

"সাহেবের জন্য আমরস দিচ্ছ না কেন?" ওয়েটারদের উদ্দেশ্যে চিৎকার ক'রে বললেন বিট্টু মামা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৬

"আপনাদের সবচেয়ে ছোট চকলেট কেকটা কই?" নবরংপুরস্ টেন নামে আহমেদাবাদের সেরা কেকের দোকানে আছি আমি। ১৯ নভেম্বর ২০০১-এ বিদ্যার বয়স আঠারো হয়েছে। নিজের সিদ্ধান্ত এখন সে নিজেই নিতে পারে। তবে এ কাজ সে জন্ম থেকেই ক'রে আসছে।

"ব্যাগ লাগবে না।" কেকের বাক্সটা বইয়ের হ্যাভারস্যাক ব্যাগে রেখে বললাম। বিদ্যার কাছে না যাওয়া পর্যন্ত ব্যাগটা ঠিক কোলের মধ্যে রেখে দিলাম আমি।

কেক আড়াল ক'রে বিদ্যার ঘরে যাওয়াটা যথেষ্ট কঠিন। ইশ বাড়ি থাকায় ব্যাপারটা আরো কঠিন হয়ে গেল। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ভারত আর ইংল্যান্ডের ওয়ান-ডে ম্যাচ চলছে আজ। আট ঘণ্টা কাটানোর মত যথেষ্ট খাবার দাবার নিয়ে ইশ সোফার সামনে বসেছে–স্যান্ডউইচ, দুধ, চিপ্স, বিস্কুট ইত্যাদি। ইশের বাবা ডাইনিং টেবিলে বসে ইন্ডিয়ান খবরের কাগজের উপরে পিএইচডি ক'রে ফেলছেন। ইশ আশেপাশে থাকলে কাকার মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুঁটে থাকে সব সময়।

হ্যাভারস্যাক ব্যাগটা শরীরের সাথে অনুভূমিক ক'রে রেখে ঘরে ঢুকলাম।

"ইন্ডিয়া ব্যাট করছে। গাঙ্গুলি আর টেন্ডুলকার। দশ ওভারে সত্তর। কোন উইকেট পড়ে নি," বলে ইশ চিৎকার ক'রে বলল, "আ, চাটনি দাও!"

ডাইনিং টেবিল থেকে চাটনির বোতলটা নিয়ে তার ছেলের সামনের কফি টেবিলে যতটা সম্ভব শব্দ ক'রে রেখে দিলেন ইশের বাবা।

"ধন্যবাদ বাবা," বলল ইশ। "সামনে থেকে সরে দাঁড়াবা? টিভি দেখতে পাচ্ছি না।"

ইশের বাবা ছেলের দিকে শক্ত করে তাকিয়ে সরে গেলেন।

"বসে পড়," ইশ আমাকে বলল।

"টিউশনি আছে," বিদ্যার ঘরের দিকে ইশারা করে বললাম।

"ও আচ্ছা, ওইজন্য এসেছিস। জন্মদিনেও বিদ্যা পড়বে! বাহ্, মনোযোগ তো দেখি বেশ ভাল।"

"সবাই ফাঁকিবাজ হয় না। অনেকেই জীবনের ব্যাপারে সিরিয়াস থাকে," খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই ইশের বাবা কথাগুলো বললেন।

প্রতিবাদ হিসেবে ইশ রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে টিভির ভলিউম যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিল।

"ওর মা ওকে দানব বানিয়ে ফেলেছে," ইশের বাবা বলেই নিজের শোয়ার ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে গেলেন। টেন্ডুলকার চার মারার সাথে সাথে ঐ দানবটা হাত তালি দিয়ে উঠল।

"বাবাকে নিয়ে ভাবিস না," আমার নার্ভাস ভাব দেখে ইশ বলল। "ওকে শুভেচ্ছা জানাস। ও এটা খুব পছন্দ করে। আমি অবশ্য আজ সকালবেলা ভুলে গিয়েছিলাম।"

একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে ইশ তাতে অনেক চিপস আর চাটনি মাখিয়ে তাতে বড় একটা কামড় বসিয়ে আমার বন্ধু স্বর্গসুখ খুঁজে পেল যেন। তার সুখ সে খুঁজে নিয়েছে এখন আমার সুখ আমাকে খুঁজে নিতে হবে।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম, হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। "শুভ জন্মদিন, শ্রীমতি অষ্টাদশী।" বারান্দার দরজা বন্ধ করতে করতে শুভেচ্ছা জানালাম তাকে।

চকচকে লাল কুর্তা আর সাদা প্যান্ট পরেছে সে। জামা-কাপড়গুলো একটু বেশি জমকালো হয়ে গেছে তবে জন্মদিন বলে সেটাকে স্বাভাবিকই মনে হল।

"একটা ব্যাপার জান, আঠারোই হচ্ছে একমাত্র সংখ্যা যে সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফলের দ্বিগুণের সমান?" সে বলল।

কেকটা নিয়ে সাদা প্লাস্টিক টেবিলের উপরে রেখে দিলাম।

"টেন রেস্টুরেন্টের কেক! মনে হচ্ছে কেউ একজন দিন দিন উঁচু জাতে উঠে যাচ্ছে," ঠাট্টা করে বলল বিদ্যা।

"তুমি চকলেট পছন্দ কর। ওই রেস্টুরেন্টেই সবচেয়ে ভাল চকলেট পাওয়া যায়।" বাক্সটা খুললাম। কেকটা দেখার জন্য চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে এল সে।

"ওই জিনিসটায় পর থেকে তুমি পালে গেছ।"

"কোন্ জিনিস?" তার বড় বড় চোখের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম।

"এই জিনিসটা," বলে আমাকে চুমু দেওয়ার জন্য এগিয়ে এল সে। গত মাস থেকে প্রায় প্রতিটি টিউশনির শেষেই আমরা চুমু খাচ্ছি। কাজেই আজকে এটা তেমন কোন বিশাল ব্যাপার নয়। মাঝে মাঝে সে কোন সমস্যা সমাধান করতে পারলেই আমরা চুমু খেতে শুরু করে দেই। অন্য সময় প্রতি পনের মিনিট পরপর আমরা চুমুর জন্য বিরতি নিয়ে থাকি। একবার তার একটা মডেল পরীক্ষা নিচ্ছিলাম, সেজন্য আমরা চুমোচুমি করতে পারি নি। অবশ্য পরের ক্লাসে আমরা সেটা পুষিয়ে নিয়েছি। প্রথম দশ মিনিট শুধু চুমোচুমিতেই কেটেছে, তারপর তার ভুল-ত্রুটিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। ইচ্ছা করলেই আমরা চুমু খাই এখন। অপরাধবোধ জাগলে আবার পড়াশোনায় মন দেই, কোন না কোনভাবে এক ঘণ্টা সময়টাতে গণিত আর রোমান্সের ভেতরে আমরা একটা ভারসাম্য বজায় রাখি।

বারান্দার কিনারে গেলাম আমরা। সর্বশেষ সূর্যালোকটুকুও মিলিয়ে গেছে। আকাশ গাঢ় কমলা। সান্ধ্য বাতাসে ঠাণ্ডা লাগছে। দূরে অমির মন্দির দেখতে পাচ্ছি।

আমার হাত জড়িয়ে ধরে আমার দিকে তাকাল সে। "আমাকে বল," মুখ থেকে এক গোছা চুল সরিয়ে সে বলল, "আমার কি ডাক্তার হওয়া উচিৎ?"

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাহলে আমি এখান থেকে বাইরে বের হব কিভাবে?"

" যে কোন একটা কলেজে দরখাস্ত করে চলে যাও," আমি বললাম।

"কিভাবে" আমার হাত টান দিয়ে বলল সে। "দরখাস্ত করার টাকাটাই বা পাব কিভাবে? মুম্বাইয়ে নিজের খরচ চালাব কিভাবে?"

"আস্তে আস্তে তোমার বাবা-মাও তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে। তোমার পড়াশুনার জন্য টাকা-পয়সা দেবে। ততদিনে..."

মহল্লা জুড়ে তীব্র চিৎকার উঠলে চমকে উঠলাম আমরা। ইন্ডিয়া ছক্কা মেরেছে।

"ততদিন কী?" আওয়াজ কমে এলে সে জানতে চাইল।

"ততদিনে আমিই তোমার খরচ দিতে পারব," বললাম আমি, তার চোখের দিকে তাকালে সে হেসে ফেলল। বারান্দায় চারপাশ দিয়ে হাটতে লাগলাম আমরা।

"তার মানে আমার টিউটর বিশ্বাস করে, অঙ্কের সমস্যা আমার সমাধান করার কোন দরকার নেই?"

"জীবনের যে অঙ্ক, তার সমস্যার সমাধান করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ," বললাম আমি।

"সেটা আবার কি?"

"তুমি কে, তুমি কি চাও তার বিপরীতে লোকে তোমার কাছ থেকে কি চায়। আর লোকজনকে খুব বেশি ক্ষেপিয়ে না তুলে তুমি যা চাও সেটা বজায় রাখা। জীবন একটা অপটিমাইজেশন প্রবলেম। অনেক অনেক চলক আর শর্ত আছে তাতে।"

"বাবা-মা'কে ক্ষেপিয়ে না তুলে কি পালিয়ে যাওয়া সম্ভব?"

"হয়ত কম ক্ষেপবে, কিন্তু একেবারে না ক্ষেপিয়ে তো পালানো যাবে না। আমরা জীবনটাকে শুধু অপটিমাইজ করতে পারি, সমাধান করতে পারি না," একটা কোণায় এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আমি বললাম।

"আমি কিছু অদ্ভুত কথা বলব?"

"কী?"

"তুমি যখন অঙ্কের কঠিন কঠিন কথা বল, যেমন এইমাত্র বলা টার্মগুলোর মতন, সেগুলো আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়," মাথার উপরে হাত উঁচুতে তুলতে তুলতে বলল সে।

"আচ্ছা।"

"আমি উত্তেজনা বোধ করি।"

"বিদ্যা, তোমার সাহস..." অবাক হয়ে বললাম আমি।

"লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছ, তাই না?" বলে হাসল সে।

"তাহলে এই কেকটা কাটি, নাকি?" কথার বিষয় পাল্টানোর জন্য বললাম।

"অবশ্যই, আমার সাথে ক্যাফে বিদ্যাতে আস," সে বলল।

পানির ট্যাংকের নিচে ঢুকে পড়ে মেঝের উপরে বসলাম আমরা। ছয়টা গোলাপী রঙের কুশন আর একটা ছোট্ট কার্পেট এনে রেখেছে সে। "আমার ঘরের জন্য এগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এনেছি। তাহলে এখানে একটা ছোটখাট পার্টি দিতে পারি আমরা," আমার দিকে দুটো কুশন এগিয়ে দিয়ে বলল সে। কুশনগুলোর নিচে একটা স্টেরিও রেখে দিয়েছিল বিদ্যা।

"গান চলবে?" বলল সে। গানের মতই সুন্দর তার চেহারা। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম।

"আমি *বয়জোন* শুনি, আমার প্রিয়," সে বলল। কেকের সাথে আঠারোটা মোমবাতির একটা প্যাকেট আছে, সেটা বের করলাম।

"সবগুলো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিই," বলল সে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। বারান্দার আলো জ্বালানোর জন্য সুইচ অন করতে যেতে চাইলাম আমি।

"অন্ধকারই থাক," সে বলল। আঠার নম্বর বাতিটা জ্বালিয়ে আমার হাতটা টেনে ধরল বিদ্য।

"কেউ যদি এসে পড়ে?"

"আমার বাবা-মা দু'জনেরই হাঁটুতে সমস্যা। উপরের বারান্দায় কখনই তারা আসে না। আর ইশ, এখন তো একটা ম্যাচ চলছে।"

মহল্লায় পরপর দু'বার জোরে চিৎকার শুনলাম। ইন্ডিয়ার ইনিংস জোরালো অবস্থায় পৌঁছে গেছে এখন।

আবার বসে পড়লে আমার হাত ছেড়ে দিল সে। তার মুখে মোমবাতির আলো খেলে বেড়াচ্ছে। সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। 'যা বলে বলুক' গানটা বাজতে শুরু করল। আর সব রোমান্টিক গানের মত এটাও আমাদের কাছে বেশ উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে।

যা বলে বলুক
যা করে করুক
যা শেখায় শেখাক না তারা
আমাদের বিশ্বাস ভুল নয়।

গানের তালে মোমবাতির শিখাও নড়তে শুরু করেছে মনে হল। বাক্সের ভেতরে একটা প্লাস্টিকের ছুরি ছিল, সেটা দিয়েই কেকটা কাঁটল সে। তাকে আবার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে এক ফালি কেক মুখে তুলে দিলাম। কেকটা মুখে রেখেই আমার দিকে ঝুঁকে এল সে। কুশনের উপরে আমাকে ঠেসে ধরে মুখের কেক থেকে আমাকে খাওয়ানোর জন্য তার মুখটা আমার মুখের কাছে নিয়ে এল।

কেভাবে চুমু খেল আমাকে মনে হল আগে আর কখনও এভাবে খায় নি। সে ভিন্ন ধরনের কিছু করল তা নয় কিন্তু সেই চুমুতে অনেক অনুভূতি আছে ব'লে মনে হল। আমার শার্টের গলা দিয়ে তার হাত ঢুকিয়ে বিদ্যা।

ওদিকে গান বেজেই চলেছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা বিশ্বাস করি তা অস্বীকার করতে পারি না
আমি যা নই তা হতে পারব না।
জানি এই ভালবাসা চিরন্তন
এছাড়া এখন আর কিছুরই নেই প্রয়োজন।

মোমবাতির আলো, নাকি জন্মদিনের খোশমেজাজ, নাকি কুশন কিংবা অন্য কিছুর কারণে জানি না, তবে তখনই আমি আমার জীবনের দ্বিতীয় ভুলটা করে বসলাম।

তার কুর্তার সবচেয়ে ওপরের বোতামটা খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। আমার ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর আমাকে থামিয়ে দিলে হাতটা বের করে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু বাকি বোতামগুলো খুলতে খুলতে সে আমাকে চুমুর পর চুমু দিতে লাগলে আমার হাতটা আবারও তার বুকে চলে গেল একটা ঘোরের মধ্যে।

"বিদ্যা..." ততক্ষণে আমার হাত এমন জায়গায় চলে গেছে যে কারো পক্ষেই সেখান থেকে হাত সরিয়ে নেয়া অসম্ভব। অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা কিংবা স্বভাব, লোকে যে নামেই এটাকে ডাকুক না কেন, মানুষের যুক্তিবোধকে সেটা নিঃশেষ ক'রে দেয়। আমিও এতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

কুর্তটা খুলে ফেলল সে।

"তোমার হাতটা একটু সরাও, সেটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।"

"হুহ্?" আমি বললাম।

"নইলে এটা খুলব কিভাবে?" ব্রার দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে। আমি আমার দু'হাত সরিয়ে তার পেটের কাছে নিয়ে এলাম। ব্রা খুলে ফেলে আমার উপরে শুয়ে পড়ল বিদ্যা।

আমার শার্ট ধরে টানতে টানতে বলল, "এটা খুলে ফেল।" এখন যদি সে আমাকে বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়তেও বলে আমি সেটাও করতে পারব। তার নির্দেশ তৎক্ষণাৎ পালন করলাম।

গানটা এখন চলছে, আমরাও চালিয়ে যাচ্ছি। ছোট মোমবাতিগুলো একটার পর একটা জ্বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে আর আমরা কেবলই গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করে যাচ্ছি প্রবল আবেগে। আমাদের শরীরে ঘামের ফোঁটা চকমক করছে। সারাটা সময় ধরে বিদ্যা কিছুই বলল না। শুধু মাঝে একবারই কথা বলেছে সে।

"তুমি কি আমার উপরে উঠতে চাইছ?" আমার উপরে ওঠার পর আমাকে বলল বিদ্যা।

তার উপরে উঠলাম আমি। দু'জনে এক হয়ে গেলাম। তাকালাম একে অন্যের চোখের দিকে। ইংল্যান্ড একের পরে এক উইকেট হারাচ্ছে, মহল্লার চিৎকারও থামছে না যেন।

যখন শেষ করলাম তখন আর মাত্র চারটা মোমবাতি পুড়তে বাকি আছে। ছয়টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুশন একত্রে একটা তোশক বানিয়ে সেটার উপরে শুয়ে পড়লাম আমরা। সবকিছু শেষ হলে তখনই শুধু অনুভব করতে পারলাম, কী কনকনে শীত পড়েছে। আমার জ্যাকেটটা নিয়ে নিজেদের ঢেকে ফেললাম। আর পাগুলো ঢুকিয়ে রাখলাম কুশনের নীচে।

"ওয়াও, আমি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, এখন থেকে আমি আর কুমারী নই, দারুণ! ধন্যবাদ ঈশ্বরকে," বলে ফিক ক'রে হেসে আমার বুকে মাথা রাখল সে। তীব্র উত্তেজনা কমে এলে বোধোদয় হল আমার। মিঃ গোবিন্দ প্যাটেল, কী করলে তুমি?

"দেখ, এখনও আমার গা কাঁটা দিয়ে আছে," বলে হাত উঁচু করল সে। তার নিটোল ফর্সা ত্বকে ছোট ছোট গোলাপী দানার মত ফোটা দেখা যাচ্ছে।

ছি, ছি, ছি গোবিন্দ। কী করছ? তার শরীর ছুঁয়ে দেখছ? আমার ভেতরের কণ্ঠস্বরটা আর জোরালো হয়ে বলল।

"এটা ঘটল বলে আমার খুব খুশি লাগছে। তোমার লাগছে না?" বলল সে।

আমি চুপ থাকলাম।

"কিছু একটা বল?"

"আমাকে এবার যেতে হবে।"

"তুমি জায়গাটা পছন্দ করছ না?"

"এখানে? বুঝতে পারছ, আমরা তোমার বাবা-মা আর ভাইয়ের মাথার ওপরে আছি?"

"এ সব কথা বাদ দাও," সে বলল।

"আমি দুঃখিত, আমি নার্ভাস হয়ে পড়ছি," বললাম আমি।

"নার্ভাস হয়ো না," বলে আমাকে জড়িয়ে ধরল সে, অনুভব করতে পারলাম আমার শরীর কাঁপছে। "তুমি ঠিক আছে তো?"

কেন জানি না, আমার চোখে তখন অশ্রু। কারণ হয়ত ভয় পাওয়ার পরে কেউ আমাকে আগে ওভাবে জড়িয়ে ধরে তারপর জিজ্ঞেস করে নি আমি ঠিক আছি কিনা। হয়ত আগে কখনই জানতাম না, এ ধরনের কিছু অনুভব করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে। আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুর সাথে প্রতারণা করেছি। হয়ত সেটাও কারণ, সাধারণত আমি আগে কখনও কাঁদি নি। কিন্তু এক সাথে এত কারণ জড়ো হওয়ায় না কেঁদে উপায় ছিল না।

"এইযে, আমি হলাম মেয়েমানুষ। কান্নাকাটির ব্যাপারটা আমার জন্য রেখে দাও," সে বলল।

তার ভেঁজা চোখের দিকে তাকালাম আমি। চাঁদের আলোয় বারান্দা ভরে গেছে। উঠে বসে জামাকাপড় পরে নিয়ে ট্যাক্সির নীচ থেকে বেরিয়ে এসে ঘড়িতে সময় দেখলাম। ক্লাসের সময় তিরিশ মিনিট বাড়তি হয়ে গেছে।

বারান্দার দরজাটা খুলতেই আমার পেছন থেকে সে বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শুভ জন্মদিন," বলে চলে এলাম সেখান থেকে।

"আরে, খেলার সবচেয়ে ভাল অংশটা মিস্ করে ফেলেছিস। আমরা জিতে যাব। থেকে যা," নিচের সিঁড়ির কাছে পৌছালে ইশ বলল।

"না, আমি খুব ক্লান্ত, বাড়ি গিয়ে দেখব," বলেই দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

"ডিনার খেয়ে যাও, বাবা," টেবিল গোছাতে গোছাতে ইশের মা বললেন। "বিদ্যার জন্মদিনের জন্য আজ একটু ভাল খাবার তৈরি করেছি।"

"না কাকী, বাসায় মাও রান্না করেছেন," আমি বললাম। তার মেয়ের জন্মদিন তো আমি ইতিমধ্যেই উদযাপন ক'রে ফেলেছি।

"কী ভাল ছেলে তুমি," আদর ক'রে বললেন তিনি। আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৭

"শক্ত করে ধর, নড়ছে তো," অমি বলল। ছাদের নাগাল পাওয়ার জন্য একটা টুলের উপরে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। সিলিং ফ্যানের তিন রঙা ফিতেটা নামাতে চাচ্ছি আমরা। টুলের পায়া ধরে রেখেছি আমি। শিরিষের আঠা আর সেলোটেপ নিয়ে ইশ আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"আমি কিন্তু পড়ে যাব," সতর্ক ক'রে দিল অমি। টুল থেকে তার ডান পা একটু টলে গেল।

"আমার দোষ না। টুলের পায়া ভাঙা," আমি বললাম।

এক সপ্তাহ পরেই প্রজাতন্ত্র দিবস। এই দিনটা আমি কখনও উদযাপন করতে চাই নি। অবশ্য এক বছর আগের ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠাকে উদযাপন করতে চাইছি আমরা। ঐদিনের কথা মনে পড়লে এখনও ভয়ে কেঁপে উঠি। ঋণ সব শোধ করে দিয়ে মুক্ত হয়ে গেছি। এক বছরে আমাদের ব্যবসা তিনগুণ হয়েছে। এতসব হয়েছে এই দোকান থেকেই।

"২৬ শে জানুয়ারির প্রস্তুতি? চালিয়ে যাও," আমার আগমনে আমরা শংকিত হলাম। টুল থেকে অমি লাফিয়ে মেঝেতে নেমে এলে ফিতাগুলো তার মাথার উপরে পড়ল।

"তুই ছেড়ে দিলি!" সে আমাকে দোষারোপ করলে হেসে উঠল সবাই।

মামা টেবিলের উপর সমুচার একটা বাদামী ব্যাগ আর কিছু হলুদ প্যাম্ফলেট রেখে দিলে সেখান থেকে সবাইকে একটা ক'রে সমুচা দিলাম।

AMARBOI.COM

"তুমি কী গুণছ?" আমি আলস্যভরে জানতে চাইলাম।

"কতবার আমরা সেক্স করেছি সেটা," উত্তর দিল সে। "ওয়াও, এর মধ্যেই আমাদের স্কোর আট হয়ে গেছে!"

"তুমি এসবের হিসেব রাখ?" আমি বললাম।

"আমি অনেক কিছুরই হিসেব রাখি।"

"যেমন?"

"যেমন আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি। আমার পিরিয়ড শুরু হতে মাত্র পাঁচ দিন আছে। অতএব, আজ নিরাপদ।"

"যাইহোক না কেন, নিরাপদ তো হবেই কারণ আমি কনডম ব্যবহার করি," একটু আরামের জন্য কুশনের উপর হেলান দিতে দিতে বললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওহ্? তাহলে গণিতের চেয়ে পদার্থবিজ্ঞানের উপরেই তোমার আস্থা এখন বেশি?" বলে ফিক ক'রে হাসল। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে একটু উঠে বসে তার একটা পা আমার দু'পায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল আস্তে করে।

"তোমার কি এখনও কনডম কিনতে বিব্রত লাগে?"

"স্যাটেলাইটের একটা অচেনা কেমিস্টের কাছ থেকে পাই। কিছু দিন ধরে যথেষ্ট সংখ্যক আছে আমার কাছে।"

"ওহ্ তাই," আমার উপরে চেপে বসল এবার, "তাহলে একজোড়া বেশি ব্যবহার করলে তো সমস্যা নেই?"

এই নিয়ে আমাদের স্কোর হল নয়।

"শুভরাত্রি, কাকী," বিদ্যার মাকে বললাম। কাকী যখন আমাকে কিছু খেতে দেন বা কেন এত পরিশ্রম করি এসব জিজ্ঞেস করেন, খুব বিরক্ত লাগে তখন।

ভাবতে ভাবতে হেটে বাড়ি চলে এলাম। দুই মাসে নয় বার। গড়ে প্রতি সপ্তাহে একবার সেক্স করা হয়েছে। নয় বার–তার মানে [illegible] বেনিফিট অব ডাউট পাব না। ঝোঁকের মাথায় দুর্ঘটনাবশত সেক্স ক'রে ফেলেছি একথা আর বলতে পারব না আমি। দুর্ঘটনাবশত কোন জিনিস কেউ নয়বার করে না। যদিও কখনও কখনও অন্য রকম দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে, আর ঠিক পাঁচ দিন পরেই সেটা টের পেলাম।

AMARBOI.COM

*

"একটা ব্যাপার তোমার জেনে রাখা দরকার," সে বলল।

আহমেদাবাদ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের (ATIRA) ক্যাম্পাস লনে এসেছি আমরা। সে আমাকে এসএমএস ক'রে জানিয়েছিল 'জরুরি প্রয়োজনে আমাদের একটু বাইরে যাওয়ার দরকার।' বাসায় আমরা বলেছি, অঙ্কের খুব ভাল একটা গাইড কেনার জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে। এরপরে আর কেউ আমাদের কোন প্রশ্ন করে নি। বস্ত্রপুরের ATIRA-এর লনে সন্ধ্যায় বহু মানুষ হাটতে আসে। কয়েকটা জুটি হাত ধরাধরি ক'রে আছে। আমি ওর হাত ধরতে চাইলাম কিন্তু ধরলাম না। মাটিতে চোখ রেখে আস্তে আস্তে হাটছি আমরা। মোটা কাকীমা'রা শাড়ি আর স্নিকার পরে ওজন কমানোর জন্য হাটাহাটি করছে। আমাদের পেরিয়ে সামনে চলে গেল তারা।

"কী ব্যাপার?" বললাম আমি। এক প্যাকেট চীনাবাদাম কিনলাম। "দেরি হচ্ছে," সে বলল।

এ কথা বলে কিসের ইঙ্গিত করছে বোঝার চেষ্টা করলাম তবে কিছুই বুঝলাম না। "কি?" আমি বললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার পিরিয়ড," সে বলল। প-অক্ষরের এই শব্দটা নিয়ে কথা হলে পুরুষেরা কোন জবাব দিতে পারে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টাসকি খায়।

"সত্যি? কিভাবে?" আমতা আমতা করে বললাম।

"কিভাবে মানে? গতকাল ২৫ তারিখে শুরু হওয়ার কথা, কিন্তু হয় নি।"

"নিশ্চিত তুমি?"

"কি বললে? যদি শুরু হত তাহলে জানতাম না?" বলল সে। এখন আর আমার দিকে তাকাচ্ছে না।

"না, বলছি, ঠিক ২৫শে ফেব্রুয়ারিতেই শুরু হওয়ার কথা সেটা কি নিশ্চিত?"

"আমি অঙ্কে অত খারাপ নই।"

"ঠিক আছে, কিন্তু..." আমি বললাম। সমস্যাটা আমারই তৈরি। এই আলোচনায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু আমার বলার নেই। তাকে চীনাবাদাম দিলাম কিন্তু নিল না।

"কিন্তু কি?" সে বলল।

"কিন্তু আমরা সবসময় প্রোটেকশন ব্যবহার করতাম। মেয়েদের বেলায় কি সব সময় একই সময় ওটা হয়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। পৃথিবীতে কোন কিছুই একেবারে ঠিক ঠিক সময়ে ঘটে না।

"আমারটা ঠিক সময় মতই হয়। সাধারণত এত কিছু খেয়াল করি না। কিন্তু এখন যেহেতু তোমার সাথে আছি, অল্প একটু দেরি হলেই ভয় পেয়ে যাই। আর দুশ্চিন্তার কারণে আরও বেশি দেরি হচ্ছে।"

"ডাক্তার দেখাবে নাকি?" একটা সমাধান দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে বললাম আমি।

"কী বলব? আমি প্রেগন্যান্ট কিনা একটু দেখে দিন তো ডাক্তার সাহেব?"

প-অক্ষরের আরেকটা শব্দ এটা, যেটা শুনে পুরুষেরা ভিমরি খায়। না কথাটা সে বলে নি। "তুমি প্রেগন্যান্ট হতে পার না!" আমি বললাম।

কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে আমার। যেন ATIRA লনের চারপাশে তিনবার দৌড়েছি আমি। দু'হাত কচলে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলাম।

"কেন নয়?" সে প্রতিবাদ করল। উদ্বিগ্ন চেহারা তার। "তুমি কি এরকম দম বন্ধ করা কথা না বলে একটু সাপোর্টিভ হতে পারবে?"

"চলো বসি," বলে একটা বেঞ্চের দিকে ইশারা করে চীনাবাদামের প্যাকেটটা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেললাম। সে আমার পাশে বসল। তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরব কিনা বুঝতে পারছি না। তার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েই তো এই ব্যাপারটা হল। সে চুপ করে আছে। তার চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ভগবান, কিছু একটা করতে হবে আমাকে। কী করা যায় সেই বিকল্পগুলোর কথা আমার মন আলোর গতিতে ভাবতে শুরু করেছে : (ক) তাকে হাসাতে হবে–বাজে আইডিয়া (খ) তাকে ওই অবস্থাতেই রেখে তার থেকে দূরে চলে যেতে হবে–না। (গ) গ-অক্ষরের শব্দটার মতো কোন সম্ভাব্য সমাধান দিতে হবে–ধুর! না (ঘ) তাকে জড়িয়ে ধরতে হবে–এটা হতে পারে। ওকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়িয়ে ধর, আঁকড়ে ধরে বল তুমি তার পাশেই আছ। তাই কর, গাধা।

বেঞ্চে তার আরও কাছে বসে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলাম তাকে। আমার কাঁধে মুখ লুকিয়ে কাঁদল সে। হাত দিয়ে আমার শার্ট খামচে ধরল।

"চিন্তা কোর না, আমি তোমার পাশেই থাকব," বললাম তাকে।

"কেন? কেন এরকম অবিচার হয়? শুধু আমাকে কেন এই ঝামেলা পোহাতে হবে?" চিৎকার ক'রে বলল সে, "তোমাদেরও একইভাবে প্রেগন্যান্ট হতে হয় না কেন?"

বলতে চাইলাম, তার কারণ হচ্ছে আমি শারিরীকভাবে পুরুষ। কিন্তু মনে হয়, কথাটা সেও ভাল ক'রেই জানে।

"শোন বিদ্যা, আমরা রিদম-মেথড ব্যবহার করতাম, প্রোটেকশন ব্যবহার করতাম। এটা যে একশভাগ সুরক্ষার ছিল না তা তো জানতাম কিন্তু সম্ভাবনা খুব কম..."

বিদ্যা না-সূচক মাথা নেড়ে কাঁদতে থাকল। লোকজনকে বোঝানোর জন্য গণিত একটা ভয়ঙ্কর জিনিস, আবেগের মুহূর্তগুলোতে সম্ভাব্যতা কেউ বিশ্বাস করে না।

পাশ দিয়ে একটা পরিবার হেটে গেল। লোকটা কাঁধের উপরে একটা মোটা ছেলেকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটাকে জীবনের সম্ভাব্য বোঝার রূপক ব'লে মনে হল আমার কাছে। চিন্তার রেলগাড়ি আবার চলতে শুরু করল। বাইশ বছর বয়স আমার। ব্যবসা নিয়ে আমার স্বপ্ন অনেক বড়। মাকেও আমার দেখাশুনা করতে হয়। এইবার ভাবো, একই সাথে আমার বন্ধুদের ক্যারিয়ার নিয়েও আমার দেখভাল করতে হয়। আর বিদ্যা? মাত্র আঠারো বছর বয়স তার, আরও পড়াশোনা করতে হবে। PR পার্সন হতে হবে অথবা তার যা হওয়ার ইচ্ছা তাই হতে হবে তাকে। এক বন্দীদশা থেকে আরেক বন্দী দশায় যেতে পারবে না সে। তবে এ মুহূর্তে সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হল, গ-অক্ষরের শব্দটা আমাকে বলতেই হবে।

আমার কাছ থেকে একটু সরে গেল সে। কান্নাকাটির জন্য তার চোখ ভিজে মুখটা গোলাপী হয়ে গেছে, ফলে আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। পুরুষেরা সারা জীবনেও সৌন্দর্য অবলোকন থামাতে পারে না কেন? কয়েক মিনিট পরে হাটাহাটি করার জন্য আবার উঠে দাঁড়ালাম।

"আরও দু'একদিন যাক। তারপর আমরা দেখব কী করা যায়," অটো-স্ট্যান্ডে পৌছে বললাম।

"সম্ভবত তেমন কিছু না। আমি খামোখাই ভুল বুঝছি। বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলছি। তোমার বলার আগে আরও দু'একদিন অপেক্ষা করা উচিৎ ছিল আমার," সে বলল। অটোর ভেতরে আমার আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরল সে। একবার শান্ত আরেকবার উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তাকে দেখে।

অটোর ভেতরে পাঁচ মিনিট ধরে কোন কথা বললাম না আমরা। তারপর আমিই তাকে বললাম কথাটা। "বিদ্যা, ধর, ধর যদি ভুল না হয়ে থাকে, সত্যি সত্যি ঘটনাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটে যায় তাহলে আমরা কী করব? নাকি এটা নিয়ে পরে কথা বলব?"

"তুমিই বল, তুমি কি করতে চাও?"

নারীরা যখন আপনার মত জানতে চায়, মনে মনে একটা মত ঠিক করে তারপরই আপনার মতটা জানতে চায় তারা। আর আপনি যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে চান তাহলে তাদের মনের কথাটাই বলা উচিত হবে।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার কাছ থেকে সে কী জবাব পেতে চায় সেটা বুঝতে চাইলাম।

"আমি জানি না। ব্যাপারটা আমার জন্য একেবারেই নতুন। কী করব বুঝতে পারছি না। প্রেগনেন্সি, গর্ভপাত এসব কিভাবে কাজ করে আমি জানি না।"

"তুমি আমাকে গর্ভপাত করাতে চাইছ?"

"না, না। তা বলি নি। বলেছি, আমি জানি না কী করতে হবে। তাহলে অন্য উপায়টা কি, বিয়ে?"

"আমার বয়স মাত্র আঠার, কথাটা মনে রাখবে। সবে স্কুল পাস করেছি," বলল বিদ্যা।

"তাহলে?"

"আমি জানি না। আমি এখন এসব নিয়ে ভাবতে চাচ্ছি না। দয়া করে এসব কথা এখন বোল না।"

অটোতে বাকি সময়টা আমরা চুপচাপ থাকলাম।

"বাড়িতে দেখানোর জন্য এই বইগাইডটা নাও," বাড়ির কাছে পৌঁছে গেলে বইটা তাকে দিয়ে বললাম।

ওই রাতে বিদ্যা এবং আমি দশবার 'ঘুমিয়ে নাকি' এবং 'এখনও ঘুমাই নি' মেসেজ চালাচালি করলাম।

AMARBOI.COM

*

সকালবেলা ক্যাশবাক্সে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। ইশ বলল, "কি ব্যাপার?"

"কিছু না, ভাল ঘুম হয় নি," আমি বললাম।

"কেন? পণ্ডিতজির মেয়ের চিন্তায়," ইশ হাসল। তার দিকে আমল দিলাম না। প্রতি ঘণ্টায় বিদ্যাকে 'কিছু কি হল' মেসেজ পাঠানোর জন্য তাড়না বোধ করছি। কিন্তু কিছু হলে সে আমাকে বলত। একটা ক্যালেন্ডার খুলে আমাদের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় বিগত দিনগুলো দেখতে লাগলাম। কয়েক মাস আগে প্রথমবার হয়। তারপর থেকে প্রতিবারে আমি প্রোটেকশন ব্যবহার করেছি। এই দেরির কি অন্য কোন কারণ থাকতে পারে? আমার জানা নেই। কাউকে জিজ্ঞেসও করি নি। ইশ আর অমি সম্ভবত প-অক্ষরের শব্দটা জানেও না। বিদ্যা ছাড়া অন্য কোন মহিলাকে চিনিও না আমি। মাকেও জিজ্ঞেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা সম্ভব নয়। ফোনটা আবারও তুলে নিলাম। 'কেমন চলছে?' সাধারণ একটা মেসেজ পাঠালাম। 'এখনও কিছু না,' সে জবাব পাঠাল।

পরের রাতে কিছুটা ঘুম হল। তার কাছে এসএমএস করার জন্য সকাল বেলা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলাম। দেখলাম একটি এসএমএস এসেছে, 'একটু ব্যথা হচ্ছে, আর কিছু না।'

ফোনটা ছুঁড়ে ফেললাম। ওষুধ ঘর থেকে সাপ্লাই বের করার জন্য দোকানে তাড়াতাড়ি যেতে চাইলাম আমি। যাইহোক দোকানে দেরিতে যাওয়াটা আমার কখনই পছন্দ হয় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৮

"রেলগাড়ি কি কখনও সময়মত আসে?" মামার জোর গলা শুনে কাজে ব্যাঘাত ঘটল। কাজে ব্যস্ত আছি আমরা। ইশ গুদামঘর থেকে উইকেটের একটা ভারি বাক্স টেনে বের করল।

"মামা, এত সকালে এসেছেন?" অমি বলল।

মামা উইকেটের বাক্সের উপরে দুটো গোলাপী কাগজের বাক্স রেখে দিলেন। সকালের প্রার্থনার জন্য তার কপালে একটা টিক্কা রয়েছে।

"আমার ছেলে আর অন্য সেবকদের জন্য গরম গরম কাচুরি কিনেছি। সকাল ৫টায় ওদের রেলগাড়ি এসে পৌছানোর কথা কিন্তু পাঁচ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। এখন কী করা? ভাবলাম তোমাদের সাথে খেয়ে নেই," বলে মামা একটা কাচুরি বের করলেন।

"তাহলে আমাদের জন্য উচ্ছিষ্ট নাস্তা রেখে দিয়েছেন?" বলে অমি হাসল।

"এগুলো একদম টাটকা। ওরা আসলে আরও কিনত। গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও। ইশ, গোবিন্দ, আস," মামা বললেন। "তোমরা এত তাড়াতাড়ি আস জানতাম না," মামা বললেন। দোকানের ঘড়িতে তখন সকাল আটটা।

"গুদামঘরে কিছু কাজ ছিল," বলে কাচুরিতে একটা কামড় দিলাম। জিনিসটা খুব সুস্বাদু।

চায়ের অর্ডার দিয়ে দোকানের বাইরে চৌকিতে বসলাম আমরা।

মামা অমির সাথে তাদের আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে কথা বলছে। ইশ আর আমি ওই দিনের মালপত্র বিলি-বণ্টনের কথা আলোচনা করছি। নয়টার আগে দোকান খুলবে না। শান্তিতেই খাওয়া-দাওয়া ক'রে নেওয়া যায়।

"চায়ের তৃতীয় রাউন্ড? ঠিক আছে? হ্যা, ভাল," মামা বললেন। বলে টি-বয়কে ডাকলেন। দুটো কাচুরি রয়েছে আমার। মনে হচ্ছে পেট ভরে গেছে।

৯.৩০-এ চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন মামা। তার জন্য কাকুচির বাক্সটা আবার মোড়ক দিয়ে মুড়ে দিলাম।

"ওগুলো রেখে দাও," মামা বললেন, "আমি কিনে নেব।"

"না না, যথেষ্ট খেলাম তো..."

মামার ফোন বেজে উঠলে আমার কথায় বাঁধা পড়ল। ফোনটা হাতে নিলেন মামা। তার চেহারা কঠিন হয়ে গেল। মুখ হা হয়ে চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে এসেছে।

"কোচের নম্বর জানি না। আমার কাছে জিজ্ঞেস করছেন কেন?" মামা বললেন।

"কী হয়েছে, মামা?" অমি জানতে চাইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোনের মাউথের উপর হাত চাপা দিয়ে অমির দিকে ফিরলেন মামা। "অযোধ্যার এক লোক। পার্টির জুনিয়র অফিসার। গতকাল আমাদের সেবক দলটাকে সে-ই ট্রেনে উঠিয়ে দিয়েছে। এখন কোচের নাম্বার জানতে চাচ্ছে সে। কিন্তু কীজন্য সেটা বলছে না," মামা বললেন।

"দাঁড়ান," বলে অমি দোকানের ভেতরে গিয়ে একটা নোট বুক নিয়ে বেরিয়ে এল।

"বুকিং করার সময় PNR নম্বর এবং অন্যান্য সব কিছুর বিস্তারিত এখানে লিখে রেখেছিলাম," বলল অমি।

নোটবুকটা হাতে নিয়ে মামা আবার ফোনে কথা বললেন।

"হ্যা, শোনেন, ওরা S6-এ ছিল...হ্যা, S6-ই তো, একশ ভাগ নিশ্চিত। হ্যালো, শোনেন...ব্যাপার কী, আমার সাথে কথা বলার সময় আবার প্রার্থনা করছেন কেন? এই যে, হ্যালো..."

অন্য পাশের লোকটা ফোন রেখে দিয়েছে। মামা আবার কল করার চেষ্টা করলেন কিন্তু কেউ ধরল না।

"কী হচ্ছে?" আমি বললাম।

"জানি না। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে...স্টেশনে যাব," মামা বললেন।

"আমি সাথে আসব?" অমি বলল।

"না, ঠিক আছে। আমাকে অবশ্য যেতেই হত। ব্যাপারটা কি দেখে আসি," বলে মামা চলে গেলেন।

দু'ঘণ্টা পরই পুরো দেশই দেখতে পেল সেটা।

"চ্যানেল পাল্টাস না," অমিকে চিৎকার ক'রে বললাম, "সব কটাতেই একই জিনিস দেখাচ্ছে।"

NDTV চ্যানেল খুলে রাখলাম। সংবাদ পাঠিকা এই নিয়ে দশবার সংবাদটা পড়লেন।

"বুধবার সকালে গুজরাটে গোধরা স্টেশনের কাছে সবরমতি এক্সপ্রেসের একটা বগিতে দুষ্কৃতিকারীরা অগ্নিসংযোগ করলে অন্তত পঞ্চাশ জন নিহত এবং এক ডজনেরও বেশি আহত হয়।" চ্যানেলের পক্ষ থেকে ফোনে গোধরায় একটা রেলওয়ে অফিসারের সাথে যোগাযোগ করা হল।

"আসেলেই কী হচ্ছে, আমাদেরকে বলতে পারেন?" সংবাদ পাঠিকা বললেন।

"আমরা এখনও রিপোর্ট পাচ্ছি। কিন্তু সকাল ৮.৩০-এর দিকে সবরমতি এক্সপ্রেস গোধরা স্টেশনে এসে পৌছায়।" অফিসারের গলা ক্ষীণ হয়ে এল।

"হ্যাল, আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন?" কয়েকবার বললেন সংবাদ পাঠিকা।

"হ্যা, এখন শুনতে পাচ্ছি," বলে অফিসার আবার বলতে শুরু করলেন।

এপর্যন্ত চ্যানেলগুলো এটুকুই জেনেছে যে, উচ্ছৃংখল জনতা সবরমতি এক্সপ্রেসের একটা বগিতে পাথর ছুঁড়ে মারে। অযোধ্যা থেকে ফিরতি করসেবকরা ঐ বগিতেই ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাথর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যাত্রীরা ধাতব জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিলে লোকজন বগিতে পেট্রল ছুঁড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়।

"এরা কী ধরনের লোকজন? এটা কি পূর্ব-পরিকল্পিত ব'লে মনে হয়?" সংবাদপাঠিকা জিজ্ঞেস করলেন।

রেলওয়ে অফিসার কোনরকম বিতর্ক এড়িয়ে গেলেন। "পুলিশ এসে পৌছেছে। তারা ব্যাপারটা তদন্ত করছেন। এ ব্যাপারে শুধু তারাই মন্তব্য করতে পারবেন।"

ইশ, অমি আর আমি এক নাগাড়ে টিভি দেখে যাচ্ছি। ঐদিনের সব ডেলিভারি বাদ দিয়ে দিলাম আমরা।

"মামা ফোন ধরছেন না। দশবার চেষ্টা করলাম," বলে অমি তার ফোনটা পাশে ছুঁড়ে রাখল।

টিভি চ্যানেলগুলো গোধরা স্টেশনে পৌছে গেছে। পুড়ে যাওয়া বগি দেখলাম আমরা। বাকি বগিগুলো নিয়ে ট্রেনটা আহমেদাবাদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে। রেলওয়ে অফিসারের চেয়ে একটা চা বিক্রেতাই অনেক বেশি কিছু বলে দিল।

"উচ্ছৃংখল লোকজনের মাঝে মুসলমানরা ছিল। হিন্দু করসেবকদের সাথে তর্কবিতর্ক হওয়ার পরে তারা সবাইকে পুড়িয়ে দেয়-নারী-শিশু সবাইকে," বলল চা বিক্রেতা।

"গোধরা হাসপাতাল থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে, আটান্ন জন লোক নিহত এবং বিশ জনেরও বেশি আহত হয়েছে," সংবাদপাঠিকা বললেন, "এই মাত্র আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি, পুড়ে যাওয়া বগিটা ছিল S6।"

"S6 বলল না?" আমার দিকে ফিরে অমি বলল।

আমি চুপ থাকলাম। খারাপ খবরটা নিশ্চিত করতে চাইলাম না।

"তাই বলল? আমার দাদা ঐ বগিতেই আছে," বলে অমি দৌড়ে বাইরে চলে গেল।

আমরা দোকানের বাইরে এলাম। প্রত্যেক দোকানীর ভাবভঙ্গিতেই দুশ্চিন্তার ছাপ।

"ছোট শিশুদের পুড়িয়ে মারে, কী ধরনের লোক এরা," এক ফুলের দোকানী তার প্রতিবেশী মিঠাই দোকানের মালিককে বলল।

"রেলওয়ে-স্টেশনে একদম সকাল বেলা। সাহসটা দেখেন," আরেক দোকানী বলল।

"আমেরিকায়ও ওরা দিনদুপুরে আঘাত করেছে। চোদনারা এখানে গুজরাটে এসে পড়েছে। দিল্লি এবার ওদের ধন চুষবে," ফুলের দোকানীটা বলল। মন্দিরে গালিগালাজ খুব কমই শোনা যায় কিন্তু আজকের দিনের কথা আলাদা। আমার জীবনের সব দিনগুলোর মধ্যে আজকের দিনটা ভিন্ন।

অমি, তার বাবা-মা এবং মামার স্ত্রীর সাথে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এল সব দোকানী। ইশ আর আমি তাদের চারপাশে ভিড় জমালাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ধীরাজকে এনে দাও, আমার ধীরাজকে এনে দাও," মামার স্ত্রীর বিলাপ মন্দিরের দেওয়ালে বাঁধা পেয়ে ফিরে আসছে যেন।

"আমি স্টেশনে গিয়ে খুঁজে বের করব," অমি বলল। মামার ফোনে আবার চেষ্টা করল সে কিন্তু সংযোগ পেল না।

"যাবেন না, শহরের অবস্থা নিরাপদ নয়," ফুলের দোকানী বললে অমির মা অমির হাত ধরে ফেলল।

"শিগগীর কার্ফু জারি হতে পারে। চলেন, দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাই," একজন ফুলের দোকানী বলল।

দোকানীরা সব চলে গেলেও ধীরাজের মায়ের কান্না থামল না।

"চিন্তা করবেন না। মামা কল করবেন। খবরটা এখনও পরিস্কার নয়। কী হয়েছে জানি না আমরা," আমি বললাম।

"বাড়ি আয়, বাবা," অমির বাবা অমিকে বললেন।

"ওরা দোকান বন্ধ করবে। ওদেরকে সাহায্য করতে হবে," অমি বলল।

আমরা দোকানে ফিরে গেলাম। ঐ দিন সকালে দু'জন খদ্দের এসেছিল, আমরা অবশ্য আর কোন খদ্দের আশাও করি নি।

"আপনাদের কি দস্তানা আছে, ইশ ভাইয়া? আমারগুলো নষ্ট হয়ে গেছে," আলীর গলা শুনে চমকে উঠলাম আমরা। একটার ভেতরেই দোকানের জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে আমাদের।

"এখানে কী করতে এসেছ তুমি?" বলল ইশ।

আলী অবাক হয়ে গেল। একটা হলুদ টি-শার্ট আর পুরনো জিন্স পরে আছে সে। সৌভাগ্যবশত মাথার চ্যাপ্টা টুপিটা পরে নেই।

"প্র্যাকটিস করার জন্য রেডি হচ্ছি। আজকে ৪.৩০-এর সময়, তাই না?"

"খবর দেখ নি তুমি?" আমি বললাম।

"আমাদের টিভি নেই," সে বলল।

"আর তোমার আব্বা?"

"আম্মিকে নিয়ে আম্মির বাবা-মা'র কাছে গেছে, সুরাটে। ছ'টার সময় আসবে।"

"তুমি যাও নি?" ইশ বলল।

"কীভাবে যাব? প্র্যাকটিস ছিল তো। অজুহাত দেখিয়ে প্র্যাকটিস মিস্ করতে চাই না..." বলে আলী হাসল। "কী, দোকান বন্ধ করছেন কেন? আমার দস্তানা..."

"কিছু না, আমাদের সাথে আস। বাড়িতে একা থাকবে না," ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে বলল ইশ।

"আমাদের সাথে?" জোর গলায় বলল অমি।

"তুই যা অমি, তোর বাবা-মা আর কাকার তোকে খুব দরকার," ইশ বলল।

"আর তুই?" বলল অমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আলীকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। ওর বাবা-মা ফিরে এলে ওকে বাড়ি পৌঁছে দেব।"

অমি কিছু বলার জন্য আমার দিকে তাকালে আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

"তুই আমার বাড়ি আসতে চাস?" ইশ আমাকে বলল। মন্দির কম্পাউন্ড থেকে হেটে বাইরে এলাম আমরা।

আমি বিদ্যাকে দেখতে চাচ্ছিলাম কিন্তু দেখা করার উৎকৃষ্ট সময় এটা নয়। আর বিদ্যাও এখন খুব ভাল মেজাজে নেই। ভাবলাম তাকে আবার এসএমএস করব কিনা।

"না, আমার মাও চিন্তায় থাকবেন," বললাম আমি। তিনি রান্না ঘরেই আছেন মনে হয় সন্ধ্যেবেলায় ধোকলার জন্য ময়দা পাকাচ্ছেন হয়ত।

বাড়ি পৌঁছলাম। দুপুরের খাবার শেষে গোধরায় কী হয়েছে মাকে বললাম। আমার মা আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছাড়লেন যে, কখনও কোন মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়ব না। দু'রাত্রি না ঘুমিয়ে, টিভি'তে এসব ঘটনা দেখে ক্লান্ত হয়ে ছিলাম, বিকাল বেলা তাই ঘুমিয়ে নিলাম। জেগে উঠলাম অমির ফোনে।

"কী ব্যাপার, অমি? মামার খোঁজ পেয়েছিস?" বলে চোখ রগড়ালাম। ফোনের ঘড়িতে দেখলাম বিকেল ৫.৩০।

"আমার দাদাকে আর পাব না, গোবিন্দ। ওখানেই মারা গেছে সে," অমি বলল। তার কণ্ঠস্বর ভাঙা। কাঁদতে শুরু করল সে। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

"মামা কল করেছিলেন। তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন," অমি বলল।

"উনি কি বাড়িতেই আছেন?" আমি বললাম।

"না। পার্টি অফিসে গেছেন। সহকর্মীরা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমাকে বললেন, যেন তার স্ত্রী বা অন্য কাউকে কথাটা না বলি। ওরা বোধহয় বুঝতে পারে নি।"

"বীভৎস ব্যাপার অমি, একেবারেই বীভৎস," বললাম। আমরাও তো ওখানে চলে গিয়েছিলাম। কথাটা ভাবতেই কেঁপে উঠলাম আমি।

"বাড়ি যেয়ে কিচ্ছু না বলে চুপচাপ বসে থাকত পারব না আমি। বাইরে যাব," অমি বলল।

"তাহলে আমার বাড়ি আয়," আমি বললাম।

"ইশ কোথায়?" জানতে চাইল অমি।

"জানি না, লাইনে থাকতে পারবি?" আমি বললাম। অমির লাইনটা হোল্ড ক'রে রেখে ইশকে কল দিলাম। দশ বার রিং হওয়ার পরে ধরল মসে। "ইশ, কোথায় আছিস? ফোন ধরতে এত দেরি হয়?"

"ব্যাংকে আছি। আলীর সাথে প্র্যাকটিস করতে এসেছি।"

"এখন প্র্যাকটিসের সময়?"

"কি? সারাদিন বাড়িতে থেকে থেকে অসুস্থ হয়ে গেছি। আর আলী আমার সাথে ছিল বলে বাবা কটমট চোখে তাকাচ্ছিল বার বার। এজন্যেই বললাম, এসব বাদ দিয়ে চল একটু প্র্যাকটিস ক'রে আসি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ইশ, ভয়ঙ্কর খবর। ধীরাজ..." অর্ধেক বলে থেমে গেলাম।

"ওহ্, না," সে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ," অমি আমাকে খবরটা দিল। মামা ওকে বাড়িতে চুপচাপ থাকতে বলেছে। ও বাইরে যেতে চাচ্ছে।"

"তাহলে এখানে চলে আয়," ইশ বলল।

"ঠিক আছে," আমি বললাম। ইশের লাইন বন্ধ ক'রে অন্য লাইনটাতে সুইচ করলাম। "ব্যাংকে আয়। অন্ধকারের আগে আগেই বেরিয়ে পড়," অমিকে বললাম।

"মা, আমার জন্য রান্না কোর না। ব্যাংকে একটা ব্যবস্থা ক'রে নেব," বলে বাড়ি থেকে বের হলাম।

*

"শহরে ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে, শুনলাম। লোকজন জামালপুরে দুটো বাস পুড়িয়ে দিয়েছে," অমি বলল।

পেছনের উঠোনটাতে যেখানে টিউশনি করি, রাতের খাবার খাওয়ার জন্য সেখানে এলাম। অমি আলুর তরকারি আর ভাত রেঁধেছে।

"গুজব, নাকি সত্যি?" আমি বললাম।

"সত্যি, আমি চলে আসার সময় একটা স্থানীয় টিভি চ্যানেলে দেখাল," অমি বলল, "বাড়িতে আজব অবস্থা। মামি এখনও প্রার্থনা করছেন ধীরাজ যেন নিরাপদ থাকে।"

অমির শরীর কেঁপে উঠল, কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। আমাকে জড়িয়ে ধরলে ওর হাতটা ধরলাম আমি।

আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আলী। তার দিকে চেয়ে হাসলাম। একটা ঘরে আমরা বই রাখতাম। সেখানে গিয়ে ভূতের তিনটা কমিক বই নিয়ে এসে বইগুলো আলীকে দিলাম। খাবার খেতে খেতে খুশি মনে বই পড়তে লাগল সে।

আলীর থেকে দূরে বসলাম। সে আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। "জামালপুরে বাস পুড়িয়েছে যারা তারা হিন্দু না মুসলমান?" আমি জানতে চাইলাম।

"জানি না, আসলেই ভয় পেয়ে গেছি আমি," অমি বলল।

রাতের খাওয়া শেষ ক'রে আটটার মধ্যে রান্নাঘর পরিষ্কার ক'রে ফেললাম, চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি এমন সময় ইশের ফোনটা বেজে উঠল। তার বাবা কল করেছেন। ইশ ফোন ধরবে কিনা ইতস্তত করছিল, শেষে আধা মিনিট পরে ধরল।

"রাতের খাবার খেয়ে ফেলেছি। আধা ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি আসছি..." ইশ বলল। "কী?"

আমরা ঘুরে ইশের দিকে তাকালাম। তাদের কথোপকথনে শুধু তার গলাই শুনতে পাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আচ্ছা...আচ্ছা...শোনেন, আমি ব্যাঙ্কে আছি। আমরা এখানে নিরাপদ। হ্যা, কথা দিচ্ছি বাইরে রাস্তায় হাটাহাটি করব না...হ্যা, এখানে বিছানা-পত্তর আছে, ভয় পাবেন না।"

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ইশের দিকে তাকালাম আমি।

"আমাদের মহল্লায় একটা বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে," ইশ বলল।

"ওয়াও, কোন্‌টায়?" আমি বললাম।

"মোড়ের দিকে মুসলমান বাড়িটায়," বলল ইশ।

"আগুন ধরে গেছে? এমনি এমনিই?" আমি বললাম।

"এজন্যেই তো বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। হিন্দুরাই হয়ত আগুন লাগিয়েছে, বাবা বললেন, যেখানে আছিস ওখানেই থাক।"

"আমাদের মায়েরা চিন্তা করবে। গোবিন্দর মাও," অমি বলল।

"তাদের কল দে," ইশ বলল। "আমি আলীকে ওর বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না। ওর বাবা-মা'র তো ফোনও নেই," বলল ইশ।

মাকে কল ক'রে জানিয়ে দিলাম ব্যাংকে নিরাপদেই থাকব। আগেও ব্যাংকে অনেক রাত ঘুমিয়েছি। দুই তলায় ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারের কামরায় মাট্রেসের উপরে অনেক মদের পার্টি দিয়েছি আমরা।

ক্যাশিয়ারের ওয়েটিং এরিয়ায় গদি আঁটা আসনে বসে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে তাস খেললাম। আলী তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। ম্যানেজারের অফিস থেকে একটা লেপ নিয়ে এসে আলাদা একটা সোফায় গিয়ে বসল ইশ।

অমি তিনটা তাস ফেলল। তিনটাই টেক্কা। তাসগুলো আমি ধরলাম। ভাবলাম উল্টাবো কি না, জোর শ্লোগান শুনে আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

"এসব আবার কি?" আমি বললাম। সময় দেখলাম রাত ১০টা।

"হিন্দুরা শ্লোগান দিচ্ছে," অমি বলল।

"রেগে গিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে হিন্দুরা," ইশ বলল।

ঢোল বাজিয়ে শিব আর রামকে ডাকছে তারা। ব্যাংকের ছাদে ওঠার জন্য সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠলাম। গাঢ় শীতের রাতে কমলা রঙে উজ্জ্বল হয়ে আছে শহরটা। এক, দুই, তিন—মহল্লাগুলোতে তিনটা আগুনের কুণ্ডলী দেখতে পেলাম। সবচেয়ে কাছে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা বাড়িতে আগুন দেখা যাচ্ছে। বাইরে লোকজনের ভিড়। জ্বলন্ত বিল্ডিংটাতে পাথর ছুড়ে মারছে তারা। ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু মহল্লার ভেতর থেকে মানুষের চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। চিৎকারের আওয়াজ সমস্বরে শ্লোগানের সাথে মিশে যাচ্ছে। হয়ত বিভিন্ন সময় দাঙ্গার কথা শুনেছেন বা টিভিতে দেখেও থাকতে পারেন কিন্তু চোখের সামনে দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। আমার এলাকা দেখে কোন বিপর্যস্ত সিনেমার সেটি বলেই মনে হবে। একটা লোক আগুনে পুড়তে পুড়তে রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছে আর হিন্দু জনতা তাকে ধাওয়া করছে। একটা পাথরে গোত্তা খেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের থেকে প্রায় দশগজ দূরে লোকটা পড়ে গেলে জনতা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুই মিনিট পরে লোকজন চলে গেলেও লোকটা নিশ্চল শুয়ে আছে। জীবনে প্রথমবার কারো মৃত্যু দেখলাম। আমার হাত, মুখ, ঘাড়, পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ভূমিকম্পের দিন যেভাবে বুক কাঁপছিল আজও সে রকম হল। ওই বিপর্যয়টা তৈরি হয়েছিল প্রকৃতির কারণে, আর এটা হচ্ছে মানুষের কল্যাণে। কোনটা বেশি ভয়াবহ আমি জানি না।

"ভেতরে আয়," আমরা আস্তিন ধরে জোরে টান দিল ইশ। আমরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম। আমার শরীর কাঁপছে।

"চল, ঘুমোতে যাই। শিগগির পুলিশ চলে আসবে। সকাল নাগাদ সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে," হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে বলল ইশ।

"আমরা এক সাথে ঘুমোতে পারব?" আমি বললাম। হ্যা, স্বীকার করছি আমি অতি মাত্রায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

ইশ মাথা নেড়ে সায় দিল। গদি আঁটা আসন থেকে আলীকে তুলল সে। আমরা দুই তলার ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বিছানায় যাওয়ার আগে ফোনটা দেখে দিলাম। বিদ্যা একটা মিস্ কল দিয়েছে। কল করার বা এসএমএস করার মানসিকতা আমার ছিল না। ইশ আমার পাশে কোন রকমে শুয়ে পড়ল। ফোনটা পকেট রেখে দিলাম আমি।

তিনটা লেপ নিয়ে মাঝখানে আলীর পাশে শুয়ে পড়লাম। অমি আর ইশ আমাদের পাশে। রাতে ১০.৩০-এ আলো নিভিয়ে দেয়া হল।

১১.৩০-এ আমি আবার জেগে উঠলাম। ভাঙচুরের শব্দ শুনতে পেলাম আমরা। ব্যাংকের মেইন গেট ধরে কেউ একজন নাড়াচ্ছে।

"কে?" আমি বললাম। ইশ উঠে দাঁড়িয়ে শার্ট গায়ে দিল।

"দেখি কে," বলে ইশ অমির পা ধরে নাড়া দিল। "অমি, আয় তো।"

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে প্রধান প্রবেশদ্বারে আলো জ্বালালাম আমি। তালার ছিদ্রপথ দিয়ে ইশ তাকাল।

"উচ্ছৃংখল লোকজন," ইশ বলল। এখনও তার একটা চোখ ওই ছিদ্রপথে। "মামা লোকগুলোর সামনে আছেন।"

আমরা একে অন্যের দিকে তাকালাম। দরজার নব ঘুরিয়ে খুলে দিল ইশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ১৯

"আমার বাবারা," মামা চিৎকার দিয়ে উঠলেন।

তালা খুলে ব্যাংকের মেইনগেট অল্প ফাঁক করতেই মামা তার দু'হাত মেলে দিলেন। তার এক হাতে মশাল আরেক হাতে ত্রিশূল। অমিকে দেখে তিনি কাঁদবেন বলে আশা করছিলাম। কিন্তু না, মামা তা করলেন না। জড়িয়ে ধরার জন্য আমাদের কাছে এলেন তিনি। আমাদের তিনজনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। "আমার বাবারা, বানচোতেরা আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে," মামা বললেন যেন আমাদের যেতে দেবেন না তিনি।

আমি তার ঠাণ্ডা চোখ দুটোর দিকে তাকালাম। এইমাত্র ছেলে হারানো বাবার মত দেখাচ্ছে না তাকে। তার মুখ থেকে মদ আর গাঁজার তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছে। মামাকে শোকাহতের চেয়ে স্তম্ভিত বলেই মনে হচ্ছে বেশি। "আমার দাদা, মামা," অমি বলল। কান্না চেপে রাখল কোনমতে।

"কাঁদিস না, আজ কেউ কাঁদবে না," মামা চিৎকার দিয়ে আমাদের ছেড়ে দিলেন। লোকজনের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, "আমরা হিন্দুরা শুধু চোখের জল ফেলেছি আর এই মাদাচোদরা শত শত বছর ধরে আমাদের মেরে যাচ্ছে। একটা হিন্দু দেশে, হিন্দু রাষ্ট্রে এসে বানচোতগুলো দিনে-দুপুরে আমাদের ছোট শিশুদের মেরে ফেলছে অথচ আমরা কিছুই করি নি। আমরা শুধু চোখের জল ফেলেছি। আমাদের ধর্ষণ করে, লুট করে, পুড়িয়ে দেয়, ওরা ভাবে এই বালের সারা দুনিয়াটাতে সন্ত্রাস ক'রে বেড়াবে কিন্তু আমাদের কিছু করার সাহস থাকবে না।"

"ওদের মেরে ফেল," জনতার ভেতর থেকে আওয়াজ উঠল। জনতার বিক্ষোভ দেখে ওদের উত্তেজনাটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। সেটা রক্ত নাকি মদের প্রভাবে আমি বলতে পারব না।

"কিন্তু জারজরা একটা বড় ভুল ক'রে ফেলেছে। আজ তারা গুজরাটকে ধর্ষণ করতে চেয়েছে। মাদারচোদরা ভেবেছে, এই নিরামিষভোজী লোকজন কী আর করবে? আসুন, আমরা দেখিয়ে দিই আমরা কি করতে পারি?"

মামা থেমে তার মদের ছোট্ট বোতল থেকে একটা চুমুক দিলেন। আমরা ব্যাংকের ভেতরে পিছিয়ে গেলাম।

"মনে হয় না ওরা আমাদেরকে ওদের সাথে যোগ দিতে বলবে। আমি যাব না," ইশের কানে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললাম।

"আমিও না। চল, অমিকেও ভেতরে নিয়ে আসি," ইশ বলল। অমিকে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছনে আড়ালে থাকতে বললাম। আস্তে ক'রে ইশ ব্যাংকের গেট বন্ধ ক'রে তালা লাগিয়ে দিল।

"ফিস্‌ফিস্ ক'রে কী বলছ তোমরা?" মামা বললেন। প্রায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তার হাতের মশাল মেঝেতে পড়ে গেলে মশালটা আবার হাতে তুলে নিলেন তিনি।

"আমার অন্য ছেলেটা কই? এই গেটটা খোল," অমিকে দেখতে না পেয়ে মামা বললেন।

"আপনি কী চান, মামা? আমরা কালকে কথা বলি?" আমি বললাম।

"কালকে না, আমার আজকেই দরকার।"

"মামা, আপনি জানেন অমির বাড়ি যাওয়া দরকার," আমি বললাম। মামা আমার কথায় গা করলেন না।

"আমি অমিকে চাই না। তোমাদের কাউকে চাই না। জারজগুলোকে মেরে ফেলার জন্য অনেক লোক আছে আমারে সাহায্য করবে।"

ইশ আমার পাশে এসে শক্ত ক'রে আমার হাত ধরে দাঁড়াল।

"তাহলে আমরা যাই, মামা?" ইশ বলল।

"ঐ ছেলেটাকে আমার চাই। ঐ মুসলমান ছেলেটা," মামা বললেন।

"কী?" বিস্ময়ে বলল ইশ।

"চোখের বদলে চোখ। আমি ওকে এখানেই জবাই ক'রে ফেলব, তারপর আমার ছেলের জন্য কান্নাকাটি করব। শালারা ঐ ছেলেটাকে নিয়ে আয়," বলে ইশের বুকে চাপড় মারলেন তিনি। ইশ সোজা দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল।

অনেকগুলো মশাল জ্বলে উঠলে ব্যাংকের সামনে থাকা শুকনো ঘাস আলোকিত হয়ে উঠল। মোটা একটা তালা দিয়ে গেটটা বন্ধ করা থাকলেও ক্ষ্যাপাটে লোকগুলো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

"মামা, আপনি এখন মাতাল। এখানে কেউ নেই," অমি বলল।

"আগে তোমার নিজের একটা ছেলে মারা যাক তারপর মাতাল হওয়া নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলব," মামা বললেন, "আমি জানি, সে এখানেই আছে, কারণ সে তার বাড়িতে নেই।"

"মামা আপনার গণ্ডগোল ওর বাবার সাথে," আগ বাড়িয়ে আমি বললাম।

"ওর বাবার সাথে যা করার তা করা হয়ে গেছে," মামা বললেন, "আর ওর বেশ্যা সৎমার সাথেও। এটা দিয়ে ওদের সবাইকে মেরে ফেলেছি!" মামা তার ত্রিশূল উঁচিয়ে আমাদের দেখালেন। ডগায় তখনও রক্ত লেগে আছে।

ইশ আর অমির দিকে তাকালাম আমি। তৎক্ষণাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম আমরা। ব্যাংকের ভেতরে দৌড়ে ছুটে গিয়ে ঢোকার প্রধান দরজা বন্ধ ক'রে হুড়কা লাগিয়ে দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমি।

"শান্ত হ, শান্ত হ...আমাদেরকে ভাবতে হবে," ইশ বলল।

"আমি তাদের সাথে যোগ দিয়ে এখান থেকে সবাইকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাব," অমি বলল।

"না, তাতে কাজ হবে না," বলল ইশ।

"আলীর বাবা-মাকে ওরা মেরে ফেলেছে?" দ্রুত শ্বাস নিতে নিতে আমি বললাম।

গেটে জোরে জোরে আঘাত করছে লোকগুলো। আমাদের চলে আসাটা ওদের ভাল লাগে নি। ভাবতে লাগলাম তালাটা কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে।

গদি আঁটা আসনে বসে পড়লাম; কানে তালা লাগানো আওয়াজ হচ্ছে গেটে। তারপরও আমাকে ভেবেচিন্তে দেখতে হবে।

"আমাদের সামনে কি কি পথ খোলা আছে?" বললাম আমি। "ওদের সাথে কথা বলে দেখতে পারি," কথাটা আমি বললেও কেউ কোন জবাব দিল না।

"ওদের দু'চোখে উন্মত্ততা দেখেছি। কথা বলবে না বলেই মনে হয়," অমি বলল।

"আমরা পালানোর চেষ্টা করতে পারি। কিংবা ওদের সাথে মারামারি করতে পারি," বলল ইশ।

"চল্লিশ জন লোক যারা কি না মানুষ খুন করার জন্য উন্মত্ত হয়ে আছে তাদের সাথে মারামারি করতে চাস?" আমি বললাম।

"তাহলে কী করব?" ইশ বলল।

তার দিকে তাকালাম আমি। জীবনে প্রথমবারের মত দেখলাম সে ভয় পেয়েছে। তার দিকে তাকিয়েই থাকলাম। সবগুলো উপায় বিবেচনা ক'রে দেখবে সে, সেই আশাই করছি। সবচেয়ে বাজে উপায়টাও ভেবে দেখবে আশা করি।

"আলীকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাববি না," আমার বুকে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে বলল ইশ।

"আর কী করতে পারি ওদের জন্য?" আমি বললাম।

"টাকা-পয়সা?" কাঁপতে কাঁপতে বলল ইশ, "তুই না সব সময় বলিস, টাকা দিয়ে মানুষকে সবসময় কব্জা করা যায়।"

"কিন্তু অত টাকা তো আমাদের কাছে নেই," বললাম তাকে।

"আমরা জোগাড় করে ওদের দিয়ে দেব," অমি বলল।

"তা ঠিক," ইশ বলল। "আমরা যদি বাকি লোকগুলোকে কিনে ফেলতে পারি তাহলে মামা একা একা কিছু করতে পারবেন না। লোকগুলো যেন এদিক ওদিক কেটে পড়ে সেই ব্যবস্থা করা দরকার।"

ঘরের ভেতর পায়চারি করছি আমি। আমাদের টাকা নেই; হ্যা, দাঙ্গাবাজরা এলাকার গরীব লোক। ওদের হারানোর মত কিছুই নেই। কিন্তু তারপরও কাকে কিভাবে পটানো যাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"টাকা নিয়ে তুই-ই সবচেয়ে ভাল কথা বলতে পারবি," ইশ বলল।

"উল্টো ফল হতে পারে। মামাকে ওদের থেকে আলাদা করব কিভাবে?" আমি বললাম।

"তাহলে আমিই কাজটা করব," বলল অমি।

আমরা আবারও প্রধান দরজাটা খুললে সামনের গেটের তালায় আঘাত করা বন্ধ করল লোকজন।

"গেট খোল। তোমরা ছেলেরা চলে যেত পার। বাকি কাজ আমরাই করব," মামা বললেন।

"মামা, আমি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই। শুধু আপনার সাথে," অমি সহানুভূতির স্বরে বলল।

"অবশ্যই, গেট খোল, বাবা," মামা বললেন।

সামনে গিয়ে গেট খুলে দিলাম আমি। লোকজনকে হাত উঁচিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। আত্মবিশ্বাসী দেখানোর চেষ্টা করছি নিজেকে।

"পেছনে যাও। মামা তার আরেকটা ছেলের সাথে কথা বলতে চান," আমি বললাম।

অমি মামাকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে মামা তাকে সান্ত্বনা দিলেন। লোকজনের মধ্যে নেতা গোছের কেউ আছে কিনা দেখার চেষ্টা করলাম। পাগড়ি পরা এক লোকের পেছনে ছয়-সাতজন লোক আছে। একটা সোনার চেইন পরে আছে সে।

"আপনার সাথে কি একটু কথা বলতে পারি?" আমি বললাম।

লোকটা আমার কাছে এল, তার হাতে একটা মশাল। মশালের তাপ গালে লাগছে আমার।

"মশাই, আপনাকে একটা প্রস্তাব দিতে চাই।"

"কী?"

"এখানে আপনার কয়জন লোক আছে?"

"দশ জন," একটু ইতস্তত ক'রে বলল সে।

"যদি আপনাকে দশ হাজার দিতে চাই, তাহলে আস্তে-ধীরে এখান থেকে চলে যাবেন?" আমি আমার প্রস্তাবটা জানালাম তাকে।

"কেন?" সে বলল।

"জিজ্ঞেস করবেন না, প্লিজ। এটাকে একটা উপহার মনে করেন। আর ব্যাপারটা গোপন রাখবেন। কারণ সবাইকে দেওয়ার মত টাকা আমার কাছে নেই।"

"ছেলেটাকে বাঁচাতে চাও কেন?" সে জিজ্ঞেস করল।

"পনের হাজার, এটাই শেষ। মন্দিরের ভেতরেই আমার দোকান। শোধ না করলে দোকান ভেঙে দেবেন।"

সোনার চেইন পরা লোকটা তার দলের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে একটু আড়ালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের সাথে কথা বলল তারপর আমার দিকে ফিরে মাথা নেড়ে সায় দিল সে। আমার সমস্যার শতকরা পঁচিশ ভাগ সমাধান হয়ে গেছে।

মামা অমিকে ছেড়ে আমার কাছে এলেন।

"কী হচ্ছে এখানে?" মামা বলল। মাতাল অবস্থায় খেয়াল করেন নি চল্লিশজনের জায়গায় এখন ত্রিশজন লোক আছে।

"মামা, আবার ভেবে দেখেন। পার্টিতে আপনার একটা ভবিষ্যত আছে। পারেখজি এটা মেনে নেবেন না," আমি বললাম।

মামা হাসলেন। মোবাইলটা বের ক'রে একটা নাম্বারে ডায়াল করলেন তিনি।

"পারেখজি মানবেন না?" মামা বললেন। ফোনটা কেউ ধরবে সেজন্য অপেক্ষা করছেন।

"হ্যা, পারেখজি, আমি ভাল আছি। চিন্তা করবেন না। শোক করব পরে। এখন তো যুদ্ধের সময়। ওহ্, শুনুন একজন ভাবছে আপনি নাকি আমার উপরে খুশি হবেন না...এই যে, কথা বলেন। হ্যা, বল...."

মামা তার ফোনটা আমার হাতে দিলেন। লোকজন আমাদের পেছনে অপেক্ষা করছে।

"হ্যালো, কে?" অন্য পাশ থেকে পারেখজির গলা ভেসে এল।

"গোবিন্দ বলছি, পারেখজি। অমির বন্ধু। আপনার সাথে বিশাল রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম..." আমি বললাম।

"ওহ্, হ্যা বাবা, মনে পড়েছে। আমাদের হিন্দুদের জন্য আজ কঠিন দিন। তো তুমি আমাদের সমর্থন দিচ্ছ তো?"

"এটা ঠিক হচ্ছে না, স্যার," আমি বললাম, কেন তাকে স্যার বললাম জানি না, "একেবারেই ভুল হচ্ছে।"

"কি? ট্রেন পোড়ানোর কথা বলছ?"

"সেটা না, পারেখজি । ওরা একটা ছেলেকে মেরে ফেলতে চাচ্ছে।"

"তো আমি কী করতে পারি?" তিনি বললেন।

"আপনি ওদের থামান।"

"আমাদের কাজ হচ্ছে লোকজনের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা আর তারা যা বলে সেমত কাজ করা। অন্য কিছু না।"

"লোকজন এটা চায় না," আমি বললাম।

"তারা এটাই চায়। আমার কথা বিশ্বাস কর। এতদিনের চাপা ক্ষোভ বের হওয়ার জন্য একটা হুইসেল দরকার শুধু।"

"কিন্তু নারী-শিশু?" আমি বললাম।

"ব্যাপার না, কষ্টের অনুভূতি মেটানোর জন্য যা-ই দরকার হোক না কেন। যন্ত্রণায় থাকলে মানুষ ভাল বোধ করতে চায়। দুর্ভাগ্য, এর চেয়ে ভাল কোন পথ দেখছি না এখন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ভয়ঙ্কর পথ এটা," বললাম আমি।

"দু'একদিন ধরে চলবে এটা। কিন্তু আমরা থামাতে গেলে বিশাল গৃহযুদ্ধ লেগে যেতে পারে।"

"এজন্যে আপনার পার্টির বদনাম হবে," আমি বললাম। তাদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম আর কি।

"কে দোষ দেবে? কিছু ভণ্ডলোক? গুজরাটের লোকজন দেবে না। লোকজন যেন ভাল থাকতে পারে সেই কাজই আমরা করছি। তারা বারবার আমাদের নির্বাচিত করবে। অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে সব।"

"স্যার, এই ছেলেটা। একদিন সে হয়ত জাতীয় দলেও ঢুকতে পারে।"

মামা আমার কাছ থেকে ফোনটা ছিনিয়ে নিলেন।

"চিন্তা করবেন না, পারেখজি। এসব আমি খেয়াল রাখব। কালকে আমার জন্য আপনার খুব গর্ব হবে," বলে মামা ফোনটা রেখে দিলেন।

ভীড়ের মাঝে আরেকটা পাতি নেতার খোঁজ করতে লাগলাম আমি। তার কাছে গিয়ে এক পাশে নিয়ে গেলাম তাকে।

"পনের হাজার দেব, আপনার লোকগুলোকে নিয়ে চলে যান," বললাম আমি।

এবার আমার প্রলোভনে কাজ হল না।

"মামা, সে আমাকে কিনতে চাচ্ছে," গলায় যতটুকু জোর আছে সবটুকু দিয়ে পাতি নেতা চিৎকার করে বলল।

"না, না, আপনি আমার কথা ভুল শুনেছেন। আপনি কি পাগল না অন্য কিছু?" বলে ব্যাংকের দিকে ফিরে গেলাম আমি।

"কী হচ্ছে, অমি? ছেলেটাকে এখানে নিয়ে আস," মামা চিৎকার করে বললেন।

অমি মামার দিকে তাকিয়ে সায় দিয়ে মাথা নেড়ে প্রধান দরজার দিকে এগিয়ে গেল। লোকজন গেটে ভিড় ক'রে আছে। আমাদের মাঝে শুধু বারান্দাটার ব্যবধান এখন। অবশ্য গেটে কোন তালা নেই।

প্রধান প্রবেশদ্বারে অমি কড়া নাড়লে কে নাড়াচ্ছে নিশ্চিত হয়ে ইশ সেটা খুলে দিতেই তারা দু'জনে ভেতরে চলে গেল একসঙ্গে।

আমি একা দাঙ্গাবাজদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারা সন্দেহ করছে আমি ঘুষ দিতে চেয়েছি। আমারও ইচ্ছা হচ্ছে ভেতরে দৌড়ে যাই। অবশ্য লোকজনকে বাইরে রাখার জন্য এখানে একজনকে থাকতেই হবে।

"ওরা কি ওকে নিয়ে আসছে?" মামা আমার কাছে জানতে চাইলেন।

"মনে হয়," আমি বললাম।

এ কথা মামা দু'দুবার জিজ্ঞেস করলেন। আমি ভেতরে গিয়ে দেখে আসার কথা বলে দরজায় কড়া নাড়লাম। এক ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যেই ইশ দরজা খুলে দিলে আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম দ্রুত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ ক'রে নিঃশ্বাস ফেললাম। এত জোরে আর কখনও শ্বাস ফেলি নি আমি। ইশ দরজায় হুড়কা লাগিয়ে ওয়েটিং লাউঞ্জ থেকে সোফা এনে দরজা আঁটকে রাখল।

"ওরা অপেক্ষা করছে। আমাদের কেউ একজন যদি দু'মিনিটের মধ্যে ওখানে না যায়, তারা হামলা চালাবে," আমি বললাম।

"আলী জেগে গেছে," বলল অমি।

"কোথায় সে?" জানতে চাইলাম আমি।

"ম্যানেজারের ঘরে তালা দিয়ে রেখেছি। কতজন আছে বাইরে?" ইশ জানতে চাইল।

"ত্রিশ," আমি বললাম।

"চল, ওদের সাথে মারামারি করব," বলল ইশ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ২০

"ইশ, আমি তোর সাথে কথা বলতে চাই," আমি বললাম।

"আমাদের হাতে সময় নেই," বলল ইশ।

"অমি!" প্রধান দরজার সামনে থেকে মামার চিৎকার ভেসে এল।

"আসছি মামা, পাঁচ মিনিট সময় দেন," অমি চিৎকার ক'রে জবাব দিল।

"ওকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আস," মামা বললেন।

যে সোফা দিয়ে দরজার আঁটকে রাখা হয়েছে সেটাতে ইশকে বসালাম।

"ইশ, এই গেঞ্জামের ব্যাপারে আমি কি যুক্তি দিয়ে কিছু বলতে পারি?" আমি বললাম।

"কী? আমাদের হাতে অত সময় নেই," বলল ইশ।

"জানি। কিন্তু তিরিশ জন লোকের সাথে মারামারি করলে কী হবে, সেটাও আমি ভাল করে জানি। আমরা সবাই মরে যাব। আলীকে পেয়ে তাকেও ওরা মেরে ফেলবে ওরা," আমি বললাম।

"তাহলে তুই কী বলতে চাচ্ছিস?" বলে ইশ উঠে দাঁড়াল।

"একজনের জীবন হয়ত বাঁচতে পারে। সেজন্যে তিনজনের জীবন দিতে হবে! এতে কি অঙ্ক আছে বলতে পারিস?"

"তোর অঙ্ক জাহান্নামে যাক। এটা কোন ব্যবসা না।"

"তাহলে এটা কী? আমরা কেবল মরতে যাব কেন? ছেলেটাকে তুই ভালবাসিস, শুধু এজন্যে?"

"না," কথাটা বলেই আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল সে।

"তাহলে কী?"

"কারণ সে একটা জাতীয় সম্পদ," বলল ইশ।

"ওহ্, আর আমরা সব জাতীয় আবর্জনা? হয়ত ছেলেটা একদিন কয়েকটা ছয় মাববে আর ইন্ডিয়ানরা টিভিতে দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে সারাটা দিন নষ্ট করবে। শালার তাতে হয়েছেটা কি? কী হবে আমার মায়ের? কী হবে অমির বাবা-মার? কী হবে...?" বলে চুপ মেরে গেলাম আমি। আরেকটুর জন্য বিদ্যার কথা বলেই ফেলেছিলাম।

"আমি ওকে ছেড়ে যাচ্ছি না। তোরা পালাতে চাস, দরজা খুলে দৌড় দে। অমি, তুইও যেতে পারিস," ইশ বলল।

"আমি যাচ্ছি না। কিন্তু ওদের সাথে লড়ব কিভাবে, ইশ?" অমি বলল।

ইশ আমাদের দু'জনকে অনুসরণ করতে বলে রান্না ঘরে নিয়ে গেল আমাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাইকে একটা করে কেরোসিনের গ্যালন তুলে নিতে বলল। সে তিনটা বালতিও তুলে নিল। মদ ঠাণ্ডা করার কাজে এগুলো ব্যবহার করতাম আমরা। তার পেছন পেছন আমরা ছাদের দিকে গেলাম।

"ভারি আছে," আমি বললাম।

"একেকটা বিশ লিটার। ভারি তো হবেই," ছাদে পৌছানোর পর ইশ বলল। আশেপাশে জ্বলতে থাকা আগুনের লেলিহান শিখার আলো নজরে এল আমদের। ফেব্রুয়ারির রাতে যে রকম ঠাণ্ডা পড়ে আজকের আবহাওয়া সে রকম মনে হচ্ছে না।

"আমরা আসছি!" মামা বললেন, তার দলের লোকজন মরচে পড়া ধাতব গেটটা ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল। প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে এসে শব্দ ক'রে আঘাত করতে লাগল তারা।

"মামা, চিৎকার থামান," ইশ বলল।

মামা উপরে ছাদের দিকে তাকালেন। "বানচোতের দল, তোরা কোথায় লুকিয়ে আছিস," মামা বললেন। লোকজন আমাদের দিকে মশাল ছুঁড়ে মারছে। দুই তলার উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কোন কিছুই আমাদের গায়ে লাগছে না। একটা মশাল এক দাঙ্গাবাজের গায়ের উপরে গিয়ে পড়লে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল সে। এই ধরনের উচ্ছৃংখল লোকজন খুব আবেগপ্রবণ হতে পারে কিন্তু একই সাথে তারা খুব নির্বোধও হয়ে থাকে। এরপর আমাদের দিকে মশাল ছোঁড়া বন্ধ করল তারা।

ইশ মামাকে ব্যস্ত রেখেছে।

"মামা আমি জন্মানোর সময় কোরভা নিয়ে জন্মাই নি। দেখেন," বলে ইশ ছাদের কিণারায় গিয়ে দাঁড়াল।

লোকজনের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, তা না হলে, প্রধান দরজায় হামলা চালাত তারা। তিনটা হুড়কা আর একটা সোফা রাখা হয়েছে দরজার সামনে। তারপরেও ভেঙে ভেতরে ঢোকা তাদের জন্য দশ মিনিটের ব্যাপার মাত্র। এটার পরে তাদের দুই তালার প্রবেশদ্বার ভাঙতে হবে। তারপরে ছাদে ওঠার পলকা দরজাটা। পনের মিনিটেই আমরা মশালের আগুনে ঝলসে যাব। ইশের পরিকল্পনাই বরং ভাল।

"বলেন, জয় শ্রীরাম," ইশ চেঁচিয়ে উঠল। দারুণ কাজ হল এতে করে। লোকজন বলতে বাধ্য হল সেটা। ওদের বেশিরভাগই জানে না, আমরা তাদের সমর্থন করছি নাকি করছি না। অন্তত এখনও পর্যন্ত জানে না।

এরমধ্যে অমি আর আমি গ্যালন থেকে বালতিতে কেরোসিন ঢাললাম। প্লাস্টিকের গ্যালনেরর সরু গলা ফলে কেরোসিন দ্রুত বের হচ্ছে না। জোরে জোরে ঘা দিতে হচ্ছে।

ছাদের কিণারায় ইশ শিবের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের ভেতর থেকে কিছু লোক তার দিকে তাকিয়ে মাথা পর্যন্ত নুইয়ে ফেলল। সম্ভবত দাঙ্গাবাজদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে শিব আজ রাতে নেমে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওয়ান, টু, থ্রি, গো," আমি ফিসফিস ক'রে বললাম। বালতিগুলো উল্টে দিলাম অমি আর আমি। ব্যাংকের বিল্ডিংয়ে যেন না লাগে সেজন্যে একটু দূরে তেল ছুঁড়ে দিলাম।

দাঙ্গাবাজদের হাতের মশালগুলোতে জ্বলে উঠল আগুন। ব্যাংকের বারান্দায় আগুনের নদী বয়ে গেল নিমেষে। লোকজনের ভেতর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত পরে তারা বুঝতে পারল আমরা তাদের উপরে হামলা করেছি। ইশ ছাদের কিণারা থেকে নেমে এল। ছাদের কিণারার নিচু পাঁচিলের নিচে লুকিয়ে পড়লাম আমরা। নিচের ঘটনা দেখার জন্য মাথাটা একটু তুললাম আমি। দাঙ্গাবাজদের কয়েকজনের গায়ের কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। ব্যাংকের গেট দিয়ে বাইরে দৌড়ে গেল তারা। আমার ধারণা, নিজে পুড়ে যাওয়ার চাইতে অন্য লোককে পুড়ে মারা অনেক বেশি মজার।

"কয়টা পালিয়েছে?" ইশ বলল।

"অনেকগুলো। নিচের তলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।" বাকি লোকগুলো প্রধান দরজায় ত্রিশূল দিয়ে গুঁতা মারছে। কয়জন আছে গোনার জন্য উঁকি দিলাম। মনে হচ্ছে দশ জনের বেশি কিন্তু বিশের কম লোক আছে।

"আমাদের নিচে নামতে হবে," ইশ বলল।

"তুই কি পাগল?" বললাম আমি।

"না, আরও লোকজন ভাগিয়ে দিতে হবে," বলল ইশ।

"ইশ, আমরা লোকজনের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত মারাও যেতে পারে। অনেক কেজোসিন ছোঁড়া হয়েছে," আমি বললাম।

"আমি পরোয়া করি না," ইশ বলল, "আরও লোকজনকে তাড়াতে হবে।"

দুই তলায় নেমে আসলাম আমরা। ইশ পকেটে রাখা চাবির গোছা দিয়ে ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারের অফিসের দরজার তালা খুলে ফেলল। আলী ভেতরে তার জন্য অপেক্ষায় আছে। তাকে জড়িয়ে ধরার জন্য দৌড়ে এল সে।

"আমার ভয় লাগছে," বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল আলী।

"চিন্তা কোর না, সব ঠিক হয়ে যাবে," ইশ বলল।

"আমি বাড়িতে আব্বার কাছে যাব।"

আলীর চুলে আঙুল ঢুকিয়ে বিলি দিয়ে দিলাম। বাড়ি যাওয়ার কথা এখন ভাবাও যায় না।

"আলী, আমার কথা শুনলে তোমার কোন সমস্যা হবে না। শুনবে আমার কথা?" ইশ বললে আলী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। "ভয়ংকর কিছু লোক তোমাকে খুঁজছে। ভল্টের ভেতরে তোমাকে তালা মেরে রাখা দরকার। ওরা তোমাকে এ জায়গায় খুঁজেই পাবে না," ইশ বলল। ছয় বাই ছয় গুমোট ঘরটার দিকে ইঙ্গিত করল সে।

"ওখানে? অনেক অন্ধকার?" বলল আলী।

"এই যে, আমার ফোনটা রাখ। লাইট জ্বালিয়ে রাখবে। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসব," বলে ইশ সেলফোনটা তার কাছে দিয়ে দিল।

আলীকে সিন্দুকের ভেতরে রেখে দিল ইশ। কয়েকটা বালিশ দিয়ে দিল তার সাথে। আলীর ফোনটার লাইট জ্বালানো আছে। দরজাটা বন্ধ করে তালা মেরে দিয়ে জুতোর সুকতলির ভেতরে চাবিগুলো রেখে দিল ইশ।

"তুমি ঠিক আছ তো?" ইশ চিৎকার করে বলল।

"অন্ধকার," জবাবে বলল আলী।

"ওখানেই থাক, ঠিক আছে?" ইশ বলল।

"আচ্ছা, রান্নাঘরে আরেকটা খাবার তৈরি করতে হবে। তাড়াতাড়ি আয়," বলল ইশ।

আলীকে ভল্টের ভেতরে রেখে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ে গেলাম আমরা। প্রধান দরজায় সমানে ধাক্কা চলছেই। হিসেব করলাম দরজা ভাঙার আগে আরও পাঁচ মিনিট সময় আমাদের হাতে আছে।

ইশ LPG সিলিন্ডারটার প্লাগটা খুলে বলল, "মেইন দরজার দিকে নিয়ে যা এটা।"

অমি আর আমি LPG সিলিন্ডারটা নিয়ে গিয়ে সোফার নিচে প্রধান দরজার সামনে প্রতিবন্ধক হিসেবে রেখে দিলাম।

"অমি, আতশবাজিগুলো কই?" ইশ জানতে চাইল।

"উপরের তাকে," বলল সে।

দেওয়ালির যেসব আতশবাজি ফোটানো হয় নি সেগুলোর বাক্সগুলো নিয়ে ইশ ফিরে এল। সাধারণত ইন্ডিয়া ম্যাচে জিতলে আমরা এগুলো ফাটাই। ইশ একটা বাক্স থেকে বোমাগুলো সিলিন্ডারের উপরে রেখে দিল।

দুটো বোমা নিয়ে ফিউজ বলে ফেলল সে, যেন এগুলো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়। লোকজন দরজায় হৈচৈ, ধাক্কাধাক্কি করে চলছে। প্রধান দরজার একটা হুড়কা আলগা হয়ে গেল।

"আমি খুলব, তুই জ্বালিয়ে দিবি, তারপর সবই দৌড়ে উপরে চলে যাব। ঠিক আছে?" ইশ অমিকে বলল।

অমি মাথা নেড়ে সায় দিল। সোফার উপরে উঠে হুড়কা ধরার চেষ্টা করল ইশ। লোকজনের ধাক্কাধাক্কিতে হুড়কাটা কাঁপছে।

অমি একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে ফিউজের কাছে নিল। ফিউজের ডগা কমলা হয়ে গেলে হুড়কা খুলে দিল ইশ। সোফার জন্য দরজাটা খুলতে আরও কয়েক সেকেন্ড লাগবে। ওই সময়ের মধ্যেই আমাদের জীবন বাঁচাতে হবে।

"দৌড়া," সোফা থেকে লাফিয়ে পড়ে ইশ বলল।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে দৌড়ে গেলাম আমরা। দরজাটা যখন আলগা হয়ে গেল তখনও উপর থেকে চার পা দূরে আছি আমি। "মাদারচোদ, তোদের আমরা ছাড়ব না। স্বজাতিকে মারিস," যে পাতি নেতাটাকে ঘুষ দিতে চেষ্টা করেছিলাম সে-ই দরজা খুললে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে এবং আরও তিনজন লোক হুরমুর করে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

"এই থাম," আমি তখন উপরে উঠছি দেখে তারা আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললে পেছন ফিরে তাকালাম। আটজন লোক ব্যাংকের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

উপরে উঠতে আর এক ধাপ বাকি। বিস্ফোরণের কারণে নিচ তলার কাপবোর্ডগুলো কেঁপে উঠল। আমার দু'কানে তালা লাগার যোগার হল যেন। প্রধান দরজাটা উড়ে গেছে। আমার মনে হল সিলিন্ডারের বিস্ফোরণে মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছে ঐ পাতি নেতাটাই। অন্য আটজনের অবস্থাও বেশি ভাল হওয়ার কথা নয়।

জানি না আমরা কী করছি। প্রতিশোধ নেওয়া থেকে কাউকে বিরত রাখার জন্য আমরা নিজেরাই তাদের আক্রমণ করছি। মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কখনও বাতাসে উড়তে দেখি নি। দাঙ্গাবাজরা কেউ এখনও অবশিষ্ট আছে কিনা জানি না। একেবারে উপরের টু-ওয়ে সুইচ দিয়ে নিচ তলার টিউব লাইটটা জ্বালিয়ে দিলাম। ধোঁয়া আর পুরনো নথিপত্রের টুকরো টুকরো কাগজপত্রে ঘর ভরে গেছে। ইশ আর অমি আমার পেছনে এসে দাঁড়াল।

"সব চলে গেছে?" ইশ বলল।

ত্রিশ সেকেন্ডে ধোঁয়া কেটে গেলে দেখা গেল ঘরের চারপাশে কিছু লোক পড়ে আছে। তারা আহত নাকি মৃত বলতে পারি না। প্রধান দরজাটা যেখানে ছিল, এখন সে জায়গাটা ফাঁকা। মামা অন্য পাঁচজন লোক নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। হয়ত তার কপাল ভাল, কিংবা তার দূরদৃষ্টি আছে, যে কারণে দরজা খোলার জন্য প্রথমে অন্যদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাঁচজন লোক ঘরের ভেতরে আহতদের দিকে দৌড়ে গেলে মামা উপরে তাকাতেই তার সাথে আমাদের চোখাচোখি হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় ২১

"বিশ্বাসঘাতক, জারজ তোরা," মামা চিৎকার ক'রে বললেন। তার বাম হাতটা চোখে পড়ল। রক্ত পড়ছে সেখান থেকে। তার কুর্তার বাম আস্তিনের কিছু অংশ কেরোসিনে পুড়ে গেছে।

"ধর ওদেরকে," মামা চিৎকার ক'রে উঠলেন। তিনি এবং অন্য পাঁচজন লোক সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে এলেন। ইশ, অমি এবং আমি দৌড়ে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের অফিসের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে।

"এগুলো ধর," ইশ বলল। ম্যানেজারের অফিসে ক্রিকেটের যেসব জিনিসপত্র রেখেছিলাম সেগুলোর ভেতর দিয়ে পা টেনে টেনে যাচ্ছে সে। তার হাত দুটো কাঁপছে। ইশ একটা ব্যাট হাতে তুলে নিল। মামা এবং তার দল ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের অফিসের দরজায় পৌঁছে গেছে এরইমধ্যে।

"খোল, নইলে ভেঙে ফেলব," মামা বললেন। তারপরও দরজা ধাক্কাচ্ছে না তারা। একের পরে এক হুমকি দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোন কিছু করছে না। সম্ভবত তারা ভয় পেয়েছে, আমরা বুঝি আবারও কোন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসব।

তাদের চিৎকারের মতই আমার বুকটা ওজোরে জোরে ধড়ফড় করছে।

"আমার ফোন আমার কাছে নেই। তোরটা দে, পুলিশ ডাকব," ইশ আমাকে বলল।

"আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না," দরজার ওপাশ থেকে দিয়ে মামার গলা শোনা যাচ্ছে।

আমার ফোনটা ইশকে দিলে পুলিশের নম্বরে ডায়াল করল সে।

"শালা, কেউ ধরছে না," বলে আবার চেষ্টা করল ইশ। কেউ সাড়া দিল না। ইশ ফোন বন্ধ করে হতাশ হয়ে ফোনটা ঝাঁকাতে লাগল। বিপ্ বিপ্। আমার ফোনে শব্দ হল। একটা মেসেজ এসেছে। "একটা এসএমএস এসেছে," বলে ইশ মেসেজটা ওপেন করল।

শোন, আজরাতে নিরাপদে থেকো।
ভাল কথা, আমার পিরিয়ড শুরু হয়েছে!!
হুমমম! খুব স্বস্তি পেলে, না?
খুব জলদিই দেখা হবে, আমার হট শিক্ষক।
ভালবাসা রইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেসেজটা এসেছে সাপ্রায়ার বিদ্যানাথের কাছ থেকে। ইশ হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার ফোনটা নিতে গেলে ফোনটা আমার থেকে সরিয়ে নিল ইশ। রেগেমেগে আমার দিকে তাকাল সে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পুরো মেসেজটা পড়ে ফেলল। নম্বরটা দেখে সেই নম্বরে ডায়াল করল ইশ।

আমার হৃদস্পন্দন থেমে যায় যায় অবস্থা।

"এই, দারুণ না? কখনও ভাবি নি পিরিয়ড নিয়ে সেলিব্রেট করব," আমার নম্বর দেখে অন্য প্রান্ত থেকে বিদ্যা গড়গড় ক'রে বলে গেল। ফোনটা ইশের হাতে, তারপরেও বিদ্যার প্রফুল্ল কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

"বিদ্যা?" ইশ বলল। তার ভ্রু জোড়ায় চিন্তার ছাপ।

"ইশ ভাইয়া?" বলল সে।

ইশ আমার দিকে তাকিয়ে লাইন কেটে দিয়ে ফোনটা তার পকেটে রেখে দিল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা ভুলে গেলাম আমাদের দরজায় খুনিরা দাঁড়িয়ে আছে। ইশ আমার দিকে এগোতে লাগলে পিছু পিছু হটতে হটতে দেয়ালে ঠেকে গেলাম আমি।

"ইশ, আমি তোকে সব খুলে বলছি..." বললাম আমি। যদিও আসলে সবটা খুলে বলতে পারব না। ব্যাটটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে ঠাস ঠাস ক'রে আমার গালে দুটো থাপ্পড় বসিয়ে দিল ইশ। তারপর সজোরে ঘুষি মারল আমার পেটে।

মেঝেতে পড়ে গেলাম আমি। তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু মনে হল কোন কিছু বলার অধিকার আমি হারিয়ে ফেলেছি। এমনকি ব্যাথায় চিৎকার করার অধিকারও। দাঁতে দাঁতে চেপে চোখ বন্ধ ক'রে রাখলাম। এটাই আমার প্রাপ্য। জীবনের দ্বিতীয় ভুলের মাশুল আমাকেই দিতে হবে।

"কি করছিস তোরা?" অমি বলল। যদিও পরিস্থিতিটা ভাল করেই বুঝতে পেরেছে সে।

"কিছু না, স্বার্থপর জারজ। ও একটা কাল-সাপ। পারলে আমাদেরই বেঁচে দেবে। শালার ব্যবসা মারাস," ইশ বলল। বলে আমার জননেন্দ্রিয় বরাবরব কষে লাথি মারল একটা।

"এই ইশ, তুই কী মরতে চাস?" অমি বলল।

"আরে বানচোদ মামা, সাহস থাকলে ভেতরে আয়," চিৎকার ক'রে বলল ইশ। দরজার কাছে চলে গেল সে।

অমি একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে আমি সেটা ধরে উঠে দাঁড়ালাম কোনমতে। মনে হচ্ছে আমার নাড়িভূড়ি সব ফেঁটে গেছে।

"আমি তোকে বলেছিলাম না। প্রোটোকল..." অমি বলল।

"আমি ভুল কিছু করি নি," বললাম আমি। কেন কথাটা বললাম জানি না। মাত্র একজন ছাত্রির সঙ্গে অরক্ষিত সেক্স করেছি। আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুর বোন সে। শীর্ষ দশটা যে নৈতিক ভুল মানুষ করতে পারে এটা নিশ্চয় তার একটা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ মিনিট পরে মামার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি তার চামচাদের দরজা ভেঙে ফেলতে বললেন। দূরত্ব বজায় রেখে দরজায় ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করছে তারা।

"এখন বেঁচে থাকাটাই লক্ষ্য, প্রতিশোধ নেওয়া নয়," অমি বলল।

ব্যাটটা আবার ইশের হাতে দিল সে। আমি আমার উইকেটটা শক্ত ক'রে ধরে রাখলাম। দরজার দিকে চোখ আমাদের, আর কয়েকটা ধাক্কা মারলেই দরজা খুলে যাবে।

"আমি ওদের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছি," অমি বলল। তারপর হুড়কা সরিয়ে নিল সে। "মামা, আপনি আমাকে মেরে ফেলতে চান? ঠিক আছে, আসুন, মেরে ফেলুন আমাকে। অপেক্ষা করছেন কেন," অমি বলল। তারপর দরজা খুলে দিল।

"সরে দাঁড়া, অমি। শুধু বল, ছেলেটা কোথায়," মামা বললেন।

"এখানে কোন ছেলেকে পাবেন না," ইশ গর্জে উঠল।

মামার পাঁচজন লোক ত্রিশূল উঁচিয়ে রেখেছে। আমরা আমাদের ক্রিকেটের অস্ত্র তুলে ধরলাম। একটা লোক ইশকে আক্রমণ করলে ইশ ব্যাট দিয়ে লোকটার হাত, পা, উরু আর কুঁচকিতে আঘাত করতেই লোকটা মেঝেতে পড়ে গেল।

আরেকটা মোটা লোককে সামলাতে গিয়ে কাঁপতে শুরু করল আমার হাত। তার ত্রিশূলের ফলায় আমার উইকেট গেঁথে গেল। আমরা একে অন্যের অস্ত্র ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম। আমাদের সংযুক্ত হাতিয়ার শূন্যে ছুটে গেল। লোকটা আমার ডান হাঁটুতে লাথি মারলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম আমি। এগিয়ে এসে আমাকে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরল সে।

তৃতীয় লোকটা ত্রিশূলের ভোঁতা অংশটা দিয়ে ইশের ঘাড়ে আঘাত করলে ইশ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গেল। তারপর ইশকে ধরে দেয়ালে ঠেসে ধরল লোকটা।

অমি ব্যাট দিয়ে চতুর্থ লোকটার পায়ের আঙুল ভেঙে দিয়েছে। মেঝেতে পড়ে লোকটা ব্যাথায় কুঁকড়ে আছে। অমি তার পেটে লাথি মারল কিন্তু পঞ্চম লোকটা এসে তার পিঠে সজোরে ঘুষি মেরে বসল। পেছন দিক থেকে অমিকে আঁকড়ে ধরল সে।

"বলদ, এবার তুই ছাড়া পাবি না," লোকটা বলল।

"বোকাচোদা, জারজ। আগুন নিয়ে খেলতে খুব ভাল লাগে, অ্যা?" ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের টেবিলের উপরে বসতে বসতে মামা বললেন। আমাদের তিনজনই দেয়ালে ঠাঁসা অবস্থায় আছি। বাকি তিনজন লোক ত্রিশূল দিয়ে আমাদের শরীর আঁটকে রেখেছে।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের টেবিলের উপরে বসে মামা আমাদের দিকে তাকালেন।

"আমি রক্ত চাই। ঐ ছেলেটাকে দিয়ে দে, নাইলে তোদের রক্ত নেব," মামা বললেন। পাইটটা বের ক'রে হুইস্কিতে বড় একটা চুমুক দিলেন তিনি।

"এখানে কোন ছেলে নেই," ইশ বলল, "দেখতেই তো পাচ্ছেন।"

"জানি, তোদের উপরে বিশ্বাস রাখা যাবে না," মামা বললেন। খালি পাইটটা ইশের দিকে ছুঁড়ে মারলে ইশের বুকে গিয়ে লাগল সেটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঝেতে দু'জন আহত লোক পড়ে আছে। মামা তাদের লাথি মারলেন।

"ওঠ! খুঁজে বের কর," মামা বললেন।

লোক দুটো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্যাংকের বিভিন্ন কামরা ঘুরে এসে তারা চিৎকার করে বলল, "এখানে তো কেউ নেই।" তাদের গলার স্বরে কষ্টের ছাপ।

মামা ইশের কাছে গিয়ে তার চুল শক্ত ক'রে টেনে ধরলেন। "হারামজাদা, বল," মামা বললেন।

"সে এখানে নেই," ইশ বলল।

"আমি...." একটা ফোনের রিং বেজে ওঠায় মামার কথায় বাঁধা পড়ল।

ফোনটা আমার বা অমির নয়। মামা বা তার লোকদের কাছ থেকেও রিংটা আসে নি।

মামা শব্দটা অনুসরণ করলেন। ম্যানেজারের টেবিল থেকে এসেছে। ম্যানেজারের টেবিলের পেছনের দিকের দেয়ালের কাছে গেলেন তিনি। ভল্টটা ওখানেই। শব্দটা ভল্টের ভেতর থেকেই আসছে।

"এটা খোল," ভল্টের চাকা আকৃতির তালাটা দেখিয়ে মামা বললেন।

আমরা চুপ থাকলাম। ইশের ফোন আবার বেজে উঠল। ধারণা করলাম বিদ্যা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্য তার দাদার কাছে ফোন করছে।

"বললাম না, এটা খোল," মামা আমাকেও বললেন।

"এটা ব্যাঙ্কের ভল্ট। আমাদের কাছে তার কোন চাবি নেই," আমি বললাম। ইশকে সাহায্য করার জন্য বিজ্ঞের করণীয়টুকু করতে চাইলাম আর কি। নামমাত্র উপকার ক'রে বড় কোন অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করছি–সেরকম কিছু যাতে না হয় সেজন্য যেকোন কিছু করতে রাজি আমি।

"আচ্ছা। স্মার্ট ছেলেটা তাহলে কথা বলছে। চাবি নেই," মামা বললেন।

আমি ইশের দিকে তাকাতেই ইশ আমার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

মামা আমার থুতনি ধরে মুখটা তার দিকে তুলে ধরলেন।

"আমাদেরকে বোকা ভাবছ, তাই তো? চাবি তোমাদের কাছে নেই তাহলে শালার ফোনটা ভেতরে গেল কিভাবে? ওদের সবাইকে তল্লাসী কর।"

মামার সাঙ্গপাঙ্গরা সম্ভাব্য ব্যাপক তল্লাসী শুরু করে দিল। আমাকে যে লোকটা তল্লাসী করল সে আমার পকেট ছিঁড়ে ফেলে আমাকে চড় মেরে ঘুরে দাঁড়াতে বলল। আমার আপদমস্তক হাতড়ানোর সময় তার নখের খোঁচা লাগল আমার। দশবারেরও বেশি তাকে বললাম যে, চাবি আমার কাছে নেই। কিন্তু সে শুনল না। আমার প্যান্টের পকেট খুঁজে দেখল সে। চেক করার জন্য দু'বার আমার কুঁচকি আঁকড়ে ধরল। যতবার শরীর মোচড় দেওয়ার চেষ্টা করলাম ততবার আমাকে ঘুষি মারল সে।

অন্য লোকটাও অমি আর ইশের সাথে একই কাজটা করল। ইশের শার্ট ছিঁড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলল সে। একটা ত্রিশূল নিয়ে ইশের পাঁজরের খাচায় গুঁতা মারল বেশ কয়েক বার।

"এই হারামজাদার কাছে চাবি নেই," আমার লোকটা বলেই আবার আমাকে দেয়ালে ঠেসে ধরল সে।

"এটার কাছেও নেই," অমির লোকটা বলল।

"এটাকে আরেকটু বাজিয়ে নেয়া দরকার," ইশের লোকটা বলল। ইশের প্যান্ট খুলে ফেলার চেষ্টা করল সে। ইশ লোকটার বিচি বরাবর শক্ত করে লাথি মারল। ইশের বুকে রক্ত দেখতে পেলাম আমি।

"আমিও কি হাত লাগাব?" ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের ডেস্ক থেকে মামা বললেন।

"চিন্তা করবেন না, ওকে আমি সামাল দেব," ইশ লোকটার বাহুতে কামড় দিয়েও কথাটা সে বলতে পারল।

মামা ইশের কাছে এসে তার বুকের ক্ষতে ত্রিশূলের ভোঁতা মাথা দিয়ে আবারও আঘাত করলেন।

ব্যাথায় চিৎকার দিয়ে উঠল ইশ। তাকে যে লোকটা তল্লাসী করছে সে কয়েকবার চড় মারল ইশকে। দাঁতে দাঁত চেপে তাকে লাথি মারল ইশ। মামা ইশের পকেটে হাত দিয়ে কিছু একটা অনুভব করলেন। ক্রিকেট প্র্যাকটিসের জন্য প্যান্টের নিচে আবার হাফ-প্যান্ট পরেছে ইশ। মামা প্যান্ট থেকে হাত বের করে ইশের হাফ প্যান্টে হাত ঢুকালেন। চুড়ির আকারের একটা চাবির রিং বের করলেন তিনি। দুটো ছয় ইঞ্চি লম্বা চাবি আছে তাতে।

ইশ মেঝেতে শুয়ে পড়ে মুখ দিয়ে ভারি নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তার চোখ দুটো দেখাচ্ছে অবাধ্য আর তার দেহ কোন রকম সহযোগিতা করতে নারাজ।

মামা চাবির রিংটা হাতে নিয়ে ঘুরালেন।

"আগে কখনও ব্যাংক লুট করি নি," বললেন মামা, "আর কি দারুণ পুরস্কার পেলাম আজকে। বাপ আর ছেলে, পুরো গুষ্টি উজাড় ক'রে দেব।"

ভল্টের চাবি কোন্‌টা বের করতে এক মিনিট সময় লাগল মামার।

"মামা এ কাজ করবেন না। সে শিশু। আমার দোহাই লাগে," অমি বললে মামা ঘুরে আমাদের দিকে তাকালেন।

"আমার ধীরাজও শিশুই ছিল," বলে মামা ভল্টের কাছে গেলেন।

ইশ মেঝেতে বসলে তাকে পাহারা দিচ্ছে যে লোকটা সে তার গলার চারপাশে ত্রিশূলের রড দিয়ে চেপে ধরল।

"ওর গায়ে হাত দেবেন না। ও আমাদের জাতীয় সম্পদ," ইশ গর্জে উঠল। লোকটা আবারও গলা চেপে ধরল তার।

"আমি আপনাদের টাকা দেব। যত টাকাই হোক না কেন," আমি বললাম।

"শালার ব্যবসায়ী। যা, তোর মাকে বেচে দে," ভল্টের চাকা ঘুরাতে ঘুরাতে মামা আমাকে বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই যে হারামজাদাটা" মামা বললেন। আলীকে ভল্টের ভেতর থেকে হ্যাচকা টান দিয়ে বের করলেন মামা। সাদা কুর্তা-পাজামা পরা আলীর হালকা-পাতলা শরীরটা ভীষণ রকম কাঁপছে। তার মলিন মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ভল্টে ভেতরে সে কাঁদছিল। আলীর ঘাড় আঁকড়ে ধরে মামা তাকে উঁচুতে ওঠালেন।

"ইশ ভাইয়া," আলী বলল। তার পা দুটো ঝুলছে।

"আজ তোকে যত নিষ্পাপই মনে হোক না কেন, দশ বছর পরে তুই হবি আস্ত একটা শয়তান," বলে মামা আলীকে নিচে নামিয়ে ছেড়ে দিলেন তাকে।

"মামা থামেন," মামা ত্রিশূল উঁচু করছেন দেখে অমি বলল।

"তুই বুঝবি না," বলে মামা প্রার্থনা করার জন্য দু'হাত এক করে চোখ বুজলেন।

"আলী পালাও," ইশ চিৎকার করে বললে আলী ঘর থেকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করল। মামা চোখ খুললেন। আলীর পিছু পিছু দৌড়ে আলীর পায়ের গোড়ালিতে ত্রিশূল ঢুকিয়ে দিলেন তিনি।

ব্যথায় চিৎকার ক'রে পড়ে গেল ছোট্ট আলী।

মামা মেঝেতে আলীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

"কুত্তার বাচ্চা, পালানোর চেষ্টা করবি না। এক ঘা মেরেই তোকে মেরে ফেলতে পারি। চালাকি করলে এক এক ক'রে তোর সব কয়টা আঙুল কেঁটে ফেলব। বুঝেছিস?" গর্জে উঠলেন মামা। তার চোখ লাল, সাদা অংশটুকু দেখাই যাচ্ছে না এখন।

মামা আবার চোখ বন্ধ ক'রে বিড়বিড় করে নীরবে জপ করতে থাকলেন। তার এক করা হাত দুটো তিনবার কপাল আর বুকে ঠেকিয়ে চোখ খুলে ত্রিশূল উঁচিয়ে ধরলেন। আলী উঠে দাঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করল আবার।

মামা আঘাত করার জন্য ত্রিশূল ওঠালেন।

"মামা, না," গলায় যতটুকু জোর আছে সবটুকু দিয়ে অমি চিৎকার ক'রে উঠল। অমিকে পাহারা দিচ্ছে যে লোকটা তাকে ধাক্কা মেরে দৌড়ে মামা আর আলীর মাঝে গিয়ে দাঁড়াল সে। মামা চিৎকার দিয়ে একটা মন্ত্র উচ্চারণ করে আঘাত করলেন।

"থামেন, মামা," অমি বলল।

মামা চাইলেও থামতে পারতেন না। আঘাতে ভর বেগ চলে এসেছে। ভোঁতা শব্দ ক'রে ত্রিশূলটা অমির পেটে গিয়ে ঢুকল।

"ওহ্...ওহ্," অমি বলল। যা ঘটল সেটা প্রথমে হজম ক'রে পরে ব্যথা টের পেল সে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রক্তে ভেসে গেল মেঝেটা। মামা আর তার লোকজন একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে, কী ঘটল বোঝার চেষ্টা করছে তারা।

"মামা, এটা করবেন না," অমি বলল। ত্রিশূলের ফলা যে তার পেটের পাঁচ ইঞ্চি ভেতরে ঢুকে গেছে এখনও সেটা খেয়াল করে নি।

"অমি, আমার বাবা," মামা বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামা সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশূলটা টেনে বের করতে গেলে অমি ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল।

এত রক্ত আমি আগে কখনও দেখি নি। বমি বমি হবার যোগার হল আমার, মাথাটা অসাড় হয়ে গেছে যেন। যে লোকটা অমিকে ঠেসে ধরে রেখেছিল সে এখন আলীকে শক্ত করে ধরে মামার কাছে নিয়ে এল। মামা অমিকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

"জানোয়ার, কি করেছিস তোরা, দ্যাখ," ইশ আর্তনাদ করে উঠল। পেছন থেকে দৃশ্যটা দেখেছে সে। পেটের ভেতরে ত্রিশূল দেখে নি সে। শুধু আমি দেখেছি সেটা। বহু বছর ধরে সেই দৃশ্যের ছবিটা আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে।

"কুত্তারবাচ্চারা, অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আন," ইশ চেঁচিয়ে উঠল। ইশকে যে ধরে রেখেছে, সে খুব শক্ত করে ধরে রেখেছে তাকে।

আলী তার খোলা হাত অমির বুকে রাখল। অসামঞ্জস্যভাবে উঁচু নিচু হচ্ছে সেটা।

অমি আলীর হাতটা ধরে আমার দিকে তাকাল। তার চোখ দুটো দুর্বল দেখাচ্ছে এখন। আমার গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। যে লোকটা আমাকে ধরে রেখেছে তার সাথে লড়াই করার কোনো শক্তি আমার নেই। কোন কিছু করার শক্তিই নেই আমার।

"হারামজাদারা, আমাদের ছেড়ে দে," শিশুর মত চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

"তুমি ঠিক হয়ে যাবে বাবা, আমি বুঝতে পারি নি," অমির চুল ঠিক করতে করতে মামা বললেন।

"সে খুব ভাল ছেলে, মামা। সে আপনার ছেলেকে মারে নি। মুসলমানরা সবাই খারাপ না," অমি বলল। তার কথা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, হা ক'রে শ্বাস নিচ্ছে এখন।

"তোকে ভালবাসি, বন্ধু," বলে অমি আমার দিকে তাকাল। যদি এটাই তার শেষ কথা না হত তাহলে এটাকে খুব সস্তা কথা ধরে নেওয়া যেত। এ কথা বলার পরই তার দু'চোখ বুজে এল।

"অমি, আমার বাবা, আমার বাবা," মামা তাকে বাঁচানোর জন্য শরীর ধরে ঝাঁকি দিতে লাগলেন।

"কী? কী হয়েছে?" বলল ইশ। পেছন থেকে এই উত্তেজনাকর ঘটনাটা দেখেছে সে।

মামা অমির বুকের উপরে তার হাতটা রাখলেন। যে লোকটা ইশকে ধরে রেখেছে তাকে লাথি আর ধাক্কা মারতে শুরু করল সে। লোকটা কনুই দিয়ে ইশকে গুঁতো মারল। ইশ তার ত্রিশূলের রডটা আঁকড়ে ধরে তার কাছ থেকে মুক্ত হবার জন্য সজোরে পেছনে ধাক্কাতে ধাক্কাতে লোকটার কুঁচকিতে লাথি মেরে বসলে লোকটা নিচে পড়ে গেল। তার একই জায়গায় আরও তিনবার লাথি মারল ইশ। লোকটা অজ্ঞান না পওয়া পর্যন্ত ইশ পা দিয়ে তার মাথায় ধপাধপ মারতেই লাগল, তারপর দৌড়ে অমির কাছে ছুটে গেল সে।

মামা অমির শরীরটা মেঝেতে ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ালে ইশ গিয়ে অমির মুখটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুঁয়ে দেখল। বন্ধুর মৃতদেহ তো দূরের কথা, কোন মরা মানুষের মুখই সে এর আগে কখনও ছুঁয়ে দেখে নি। ইশকে প্রথমবারের মত কাঁদতে দেখলাম আমি, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে সে, কিন্তু চোখের জল আর থামছে না।

"হারামজাদা, দ্যাখ তোর জন্যে আমি একী করলাম," মামা বললেন, "তোর জন্য আমি আমার আরেক ছেলেকে মেরে ফেলেছি। কিন্তু আমার গায়ের জোর কমে নি। দ্যাখ। আমি এখনও কাঁদছি না।"

ইশ মামার কোন কথাই যেন শুনতে পাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত আগে যে অসাড়তা আমি অনুভব করেছিলাম, এখন তারও সেই অবস্থা। অমির শরীরটা বারবার ছুঁয়ে দেখছে সে।

"হিন্দুরা দুর্বল না, আমি কি দুর্বল?" তার লোকদের দিকে তাকিয়ে মামা বললেন। লোকগুলোকে নার্ভাস মনে হচ্ছে। কারণ পরিকল্পনামত কাজ হয় নি। আলীর হাত ধরে আছে যে লোকটা সে মামার দিকে তাকাল। পরের পদক্ষেপ কি হবে সেই নির্দেশনাই যেন খুঁজছে সে।

"ওকে ধরে রাখ, নিজ মাকে দিয়ে বেশ্যার কাজ করাক যে তার পাশে রাখ তাকে," মামা বললেন।

লোকটা আলীকে আমার পাশে নিয়ে এসে একটা ত্রিশূল দিয়ে তাকে আঁটকে রাখল।

ইশকে ধরে রেখেছিল যে লোকটা, ধাক্কার ব্যাথা কাটিয়ে উঠেছে সে। উঠে পেছন থেকে ইশের দিকে ছুটে গিয়ে ইশের মাথায় ত্রিশূলের ভোতা প্রান্ত দিয়ে আঘাত করে বসল সে।

"আহ্!" ইশ ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল। লুটিয়ে পড়ে অর্ধেক সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল সে। লোকটা ইশকে টানতে টানতে পেছনের দেয়ালের কাছে নিয়ে গেল। আলী আর আমার দিকে মুখ ক'রে আছে ইশ।

"আর কোন সুযোগ দেয়া হবে না," আলীর সামনে এসে মামা বললেন। আলীকে ধরে রেখেছে যে লোকটা তাকে আলীকে ছেড়ে দিত বললেন মামা। ইশের দিকে তাকালাম আমি। আমার চেয়ে প্রায় পনের ফুট দূরে সে। তাকে যে ধরে রেখেছে সে বেশি মাত্রায় সতর্ক হয়ে আছে মনে হচ্ছে। ইশ আমার দিকে তাকাল। তার দু'চোখ যেন আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছে।

কী? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করলাম, সে কী বলতে চাচ্ছে?

তীর্যক দৃষ্টিতে ইশের দিকে তাকালাম। চোখের মনি দ্রুত চোখের মাঝখানে থেকে বামে সরাচ্ছে বারবার। সে চাচ্ছে আমি দৌড়ে গিয়ে মামাকে আঁটকে ফেলি। ঠিক অমি যেটা করে সফল হয় নি।

আমাকে যে লোকটা ধরে রেখেছে, তাকে দেখে নিলাম। আমাকে ধরে রাখলেও মামা আর আলীর দিকে তাকিয়ে আছে সে। চোখের সামনে কেউ খুন হয়ে গেলে সেখান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া কঠিন। আমি লোকটার হাত থেকে ছুটে যেত পারতাম কিন্তু এভাবে খুন হওয়ার কোন মানে আছে কি?

"শুয়োরের বাচ্চা তৈরি হ," ত্রিশূল উঁচিয়ে পাঁচ পা পেছনে গিয়ে মামা বললেন।

হয়ত নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি আলীকে আমার দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারতাম, তাতে ক'রে মামার আঘাত গিয়ে দেয়ালের উপরে পড়ত। যে লোকটা ইশকে ধরে রেখেছে তাকে ধাক্কা দিয়ে পেছন দিক দিয়ে এসে আমাদের সবাইকে রক্ষা করতে পারত। ইশ কি এটাই বলতে চাচ্ছিল? তার চোখের নড়াচড়া আর কোন কিছু আমার জানা নেই। এসব বিশ্লেষণ করার মত আমার কাছে অত সময় নেই। আমাকে আগে কাজ করতে হবে, তারপর এসব ভাবতে হবে। বিদ্যার শয্যাসঙ্গী হয়েছিলাম যখন তখনকার ঠিক বিপরীত এটি। তখন আমাকে ভেবে তারপরে কাজ করতে হয়েছে।

মামা আলীর দিকে দৌড়ে গেলেন। আমি জানি, যে লোকটা আমাকে ধরে রেখেছে তার হাত ছাড়িয়ে আলীকে ধরে আমার দিকে টেনে আনতে হবে। আমি কিছু করার জন্য তৈরি হয়ে মামার দিকে তাকালাম। তার বিশাল দেহ আর ধারালো অস্ত্রটা আমার মধ্যে ভীতির সঞ্চার করল। কখন অ্যাকশন নেব তাই ভাবতে ভাবতে আমার মূল্যবান সময় অপচয় করলাম। আরেকবার দৃষ্টি বিনিময় করলাম ইশ আর আমি। আমার আত্ম-স্বার্থ মিশ্রিত ভয়টা সে দেখতে পেল। ত্রিশূলের ফলা যদি আমার পেটে ঢুকে যায় তাহলে কী হবে? এই 'কী হবে' 'কী হবে' ভেবে দোটানায় পড়ে গেলাম আমি। তারপরও নিজেকে এসব কিছু থেকে মুক্ত করে বাম দিকে লাফিয়ে পড়ে আলীকে আঁকড়ে ধরে আমার দিকে টেনে আনলাম। মামা আঘাত করলেও আলীর কবন্ধ ছুঁতে পারলেন না। ত্রিশূলের একটা ফলা আলীর কব্জিতে গিয়ে বিঁধল। আর এক সেকেন্ড আগেও যদি আমি লাফ দিতাম তাহলে আলী কোন রকম আহতই হত না। এই ব্যাপারটা আমি তখন বুঝি নি। এই এক সেকেন্ডের দেরি আমার জীবনের তৃতীয় মস্ত ভুল।

অবশ্য তখনও জানতাম না একটা ভুল ক'রে ফেলেছি।

আমি যা ভেবেছিলাম, ইশ ঠিক তাই করল। নিজেকে মুক্ত করার জন্য লোকটাকে মাথা দিয়ে সজোরে আঘাত করতে লাগল সে। এতে করে ইশই ব্যাথা পেতে পারত তবে আমার ধারণা, ইশ তখন ব্যথার অনুভূতির উর্ধ্বে। ইশ লোকটার ত্রিশূল কেড়ে নিয়ে তার বুকে ঢুকিয়ে দিলে লোকটা একবার চিৎকার করেই চুপ হয়ে গেল।

আমাদের দিকে দৌড়ে এল ইশ।

"ও ঠিক আছে, ও ঠিক আছে," ইশের দিকে ফিরে আমি বললাম। আলীকে আমার কোলের মধ্যে রেখেছি আমি।

*

দু'জন লোক আর মামা তখনও বাকি। এদের কাউকেই মেরে ফেলার ইচ্ছে নেই আমাদের।

"আমরা শুধু এখান থেকে চলে যেতে চাই," মামার দিকে ত্রিশূলটা ধরে ইশ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামার কাছেও একটা ত্রিশূল আছে। তাদের চোখাচোখি হল। মামার লোকেরা আসন্ন দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আলীকে নিয়ে আমি ঘরের অন্য পাশে দৌড়ে গেলে লোকগুলো আমাদের পেছন পেছন দৌড়ে এল।

"হারামজাদারা, থাম," লোকগুলো বলল। আমরা ঘরের শেষ মাথায় চলে এলে একটা লোক গিয়ে দরজার হুড়কা লাগিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

ফ্লোর থেকে একটা ব্যাট তুলে নিল আলী। আমিও একটা তুলে নিলাম। যদিও তখন আসলেই লড়তে পারব কিনা নিশ্চিত ছিলাম না।

ব্যাটটা তুলতে গিয়ে ডান কব্জির ব্যাথায় কুঁচকে উঠল আলী।

"অ্যা? লড়াই করতে চাও?" লোক দু'জন বলল।

মামা এবং ইশ তখনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের চোখের চাহনি বেশ কঠিন। মামা ত্রিশূলটা হাতে নিয়ে ঘুরাচ্ছেন।

লোক দু'জনের একজন মামার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

"ওকে আমি দেখব। আপনি ছেলেটাকে শেষ করেন, মামা," সে বলল।

"অবশ্যই," বলে মামা সরে গিয়ে মামা ইশের পায়ের আঙুলে ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করলেন। ইশ সেটা আগে থেকে ধারণা করতে পারে নি। ভারসাম্য হারিয়ে ম্যানেজারের ডেস্কের পাশে পড়ে গেল সে।

"তুই শালা দুর্বল হয়ে গেছিস। তুইও সেটা জানিস," বলল ইশ।

"আমি তোকে এখনই শেষ ক'রে দিতে পারি। ভাগ্য ভাল হিন্দুর ঘরে জন্মেছিস," ইশের মুখে থু-থু দিয়েই আলীর কাছে গেলেন মামা।

"ওহ্, তুমি খেলতে চাও, আ! আমার সাথে ব্যাট-বল খেলতে চাও?" মামা বললেন। আলী ব্যাট উঠিয়েছে দেখে হেসে ফেললেন মামা।

"সরে যাও," মামা তার লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "ছেলেটা খেলতে চাইছে। হ্যা, খানকির পোলা আমার সাথে খেলবে!" বললেন মামা। আলী আঘাত করার জন্য ব্যাট নাচাচ্ছে, মামাও সেই তালে তালে তার চারদিকে নাচছেন।

মেঝেতে দুটো ক্রিকেট বলে হোঁচট খেয়ে আলী লাফিয়ে উঠল।

"আমি বল করব, তাই চাচ্ছিস? অ্যাহ্? ব্যাট বল খেলবি?" মামা বলে হাসলেন, "মরণের আগে শেষ বলটা খেলতে চাস?"

মামা বলটা তার হাতে ছুঁড়ে দিলেন।

"হ্যা, আপনি আমাকে বল করেন," আলী বলল।

"ও, তাই?" বলে মামা আবারও হাসলেন।

আরেকটা বল আলীর পায়ের কাছে পড়ে আছে, আলী পায়ের পাতা দিয়ে বলটা ইশের দিকে ঠেলে দিলে বলটা গড়িয়ে ইশের কাছে চলে গেল। ম্যানেজারের টেবিলে ঠেস দিয়ে ইশ মেঝেতে বসে আছে। পায়ের আঙুল থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে তার। দাঁড়াতে পারছে না সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার কাছে আসবেন না," মামাকে বলল আলী।

"ওহ্, ব্যাট বল নিয়ে আমার বড় ভয় হয়," মামা বললেন। ঠাট্টা ক'রে কেঁপে ওঠার ভান করলেন তিনি। এক হাত দিয়ে বলটা ছুঁড়ে দিয়ে আরেক হাতে ত্রিশূল ধরে আছেন তিনি।

ইশ বলটা আস্তে ক'রে তুলে নিতেই ইশের সাথে আলীর চোখাচোখি হয়ে গেল। যতটা সম্ভব আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিল আলী।

ইশ বলটা হাতে নিলে যে লোকটা তার দায়িত্বে আছে সে খেয়াল করলেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। সর্বশক্তি দিয়ে বলটা আলীর দিকে ছুঁড়ে মারল ইশ।

দড়াম! আলী ব্যাট দিয়ে বলে আঘাত করল। এক বলের একটাই শট, কিন্তু সেটা মিস্ করে নি আলী। বলটা মামার কপালের এক পাশে গিয়ে আঘাত করলে হাত দিয়ে মাথা ধরার জন্য নিজের হাতের বলটা ছেড়ে দিলেন মামা। বলটা মাটিতে পড়ে গেল। আলী লাথি দিয়ে সেটাও ইশের কাছে পাঠিয়ে দিলে ইশ আবার ছুঁড়ে মারল আলীর দিকে। ব্যাটে চালিয়ে আবারও সজোরে আঘাত করলে মামার কপালের মাঝে গিয়ে লাগল বলটা।

স্টেডিয়ামের বাইরে পাঠানোর জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল আলীর শটদুটো। পাঁচ ফুট দূরে বিস্ফোরক ইটের মত মামার গায়ে আঘাত করতেই মামা পড়ে গেলেন। তার হাতের ত্রিশূলটা পড়ে গেল মেঝেতে। ইশ সেটাকেই লাঠি হিসেবে ব্যবহার করে উঠে দাঁড়াল এবার। বাকি লোকগুলো মামার দিকে দৌড়ে গেলে ইশ পেছন থেকে এসে তাদের একজনের ঘাড়ে ত্রিশূল দিয়ে খোঁচা মারতেই গলগল ক'রে রক্ত বের হতে লাগল তার। ইশের চোখে খুনে দৃষ্টি। দরজার হুড়কাটা খুলে দিল সে।

আলী মেঝেতে হাটু গেঁড়ে বসে পড়েছে। বাম হাত দিয়ে ডান কব্জি ধরে রেখেছে সে।

"হায় আল্লাহ!" বলল আলী। সে যা করেছে সেই বিস্ময়ের চেয়ে বরং ব্যথার কারণেই কথাটা বলল।

মামা মেঝেতে পড়ে রইলেন। তার কপাল ফেঁটে গেছে। ভেতরের রক্ত ক্ষরণের কারণে কপাল কালো হয়ে ফুলে আছে। খুব কমই নড়ছেন তিনি। তার শ্বাস পরীক্ষার জন্য কেউই কাছে যেতে চাচ্ছে না। পাঁচ মিনিট পরে তার চোখ বুজে এলে আমি তার নাড়ি পরীক্ষা করলাম।

"নাড়িসন্দন থেমে গেছে। মনে হয় মরে গেছেন," আমি বললাম। লাশ বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছি আমি।

ইশ হাত দিয়ে আলীকে জড়িয়ে রেখেছে। "খুব ব্যাথা করছে, ইশ ভাইয়া। আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।" ভয়ে এখনও তার শরীর কাঁপছে।

"ওই কব্জিটা নাড়াও। আলী, ওই কব্জি নষ্ট হলে চলবে না। ওটাকে সচল রাখ," বলল ইশ। বের হওয়ার জন্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দরজার দিকে গেল সে। ত্রিশূরে ভর দিয়ে হাঁটছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমরা ওকে বাঁচাতে পেরেছি, ইশ, আমরা ওকে বাঁচাতে পেরেছি," পেছন থেকে ইশের কাঁধ স্পর্শ করে বললাম আমি।

ইশ থেমে আমার দিকে ফিরে তাকাল। বিরক্ত চোখে নয়, বরং তার চেয়েও খারাপ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। উদাস দৃষ্টি তার। যদিও কারণে তার বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রাখতে পারি নি, সে কথা ঠিক। কিন্তু আমাকে যেন চিনতেই পারছে না এ রকম আচরণ সে করছে কেন? যেন আমার সাথে তার কোন কিছুই করার নেই। ইশ ঘুরে আবারও হাটতে শুরু করল।

"ইশ, আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমি তোর জন্য দরজা খুলতে সাহায্য করছি," কথাটা বলেই দরজার কাছে গেলাম।

ইশ হাত দিয়ে আমাকে সরে যেতে ইশারা করল।

"ইশ, দেখ ইশ। ও বেঁচে আছে। আমরা আমরাই ওকে বাঁচিয়েছি," কথাটা আবারও বললাম তাকে।

ইশ কিছু বলল না। আমাকে ছেড়ে বাইরে চলে গেল সে। যেন আমিও একটা মৃতদেহ। আমাকে সাথে নেওয়ার কোন দরকার নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ কথা

হার্টরেট মনিটর দ্রুত বিপ্-বিপ্ শব্দ করছে। গোবিন্দের হৃদস্পন্দন মিনিটে ১৩০ ছাড়িয়ে গেছে এখন। নার্স দৌড়াতে দৌড়াতে ভেতরে এলেন। "কী করেছেন আপনি?" তিনি বললেন।

"আমি ভাল আছি। এই তো একটু কথা বলছি," বলল গোবিন্দ। বিছানার উপরে অল্প একটু উঠে বসল সে।

"তাকে উঠতে দেবেন না," নার্স আমার দিকে আঙুল তুলে ইশারা করলে আমি মাথা নেড়ে সায় দিতেই তিনি চলে গেলেন।

"ওই দিনের পর থেকে কাঁটায় কাঁটায় তিন বছর, দুই মাস এক সপ্তাহ আগে ইশ আর আমার সাথে কোন রকম কথা বলে নি। যতবার আমি কথা বলার চেষ্টা করেছি, সে এড়িয়ে গেছে।" গোবিন্দ তার কাহিনী বলা শেষ করল।

তার গলা কাঁপছিল। এক গ্লাস পানি দিলাম তাকে।

"তো এই তিন বছরে আপনাদের দোকান, বিদ্যা আর আলীর কি হল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দৃষ্টি নামিয়ে বুকের সাথে সংযুক্ত হার্টরেট মনিটরের তার নিয়ে খেলতে লাগল সে। আত্মসংবরণ করার জন্য দু'বার ঢোকও গিলল।

আমি আর খোঁচালাম না। বলতে চাইলে সে-ই বলবে। সময় দেখলাম ভোর পাঁচটা বাজে, ক্যাবিন থেকে হেটে বাইরে চলে এলাম। ভোরের সূর্যালোকে হাসপাতালের করিডোর ভরে আছে। চা কোথায় পাওয়া যাবে একজনকে জিজ্ঞেস করলে সে আমাকে ক্যান্টিনটা দেখিয়ে দিল।

দুই কাপ চা নিয়ে ফিরে এলাম। গোবিন্দ অবশ্য চা খেতে চাইল না। পাকস্থলী ওয়াশের পরে খাওয়া নিষেধ। আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না সে।

"সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের ফোন নম্বরটা খুঁজে পাওয়া দরকার। ফিরতি যাত্রা নিশ্চিত করতে হবে," তার মেজাজ বদলানোর জন্য বললাম।

"অমির মা-বাবার কথা," গোবিন্দ বলল। তার দৃষ্টি নামানো, গলার স্বর নিচু। "আমি বলতে পারব না কিভাবে...ধ্বংস হল তারা। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এলাকার লোকজন মন্দিরে আসত। প্রার্থনা হত শুধু অমি, ধীরাজ আর মামার জন্য। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পুরো আহমেদাবাদ থেকে পাঁচ হাজার লোকের ঢল নেমেছিল। অমির বাবা ওখানে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। এক সপ্তাহ খাওয়া দাওয়া না ক'রে অমির মা অসুস্থ হয়ে যান। এক মাস হাসপাতালে থাকতে হয় তাকে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছানায় বিবর্ণ পড়ে থাকা গোবিন্দের হাতের উপরে আমার হাতটা রাখব কি না সেই চিন্তা করছিলাম।

"দু'মাস আমি দোকানে যাই নি। ইশের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম, কিন্তু ...আমি দেখা করতে গেলেই ও মুখের উপরে দরজা বন্ধ ক'রে দিত।"

"বিদ্যার সাথে কথা বলেন নি?"

গোবিন্দ না-সূচক মাথা নাড়ল। "বিদ্যার সাথে কথা বলা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ওকে গৃহবন্দী ক'রে রেখেছিল। ওর বাবা ওর মোবাইল ফোন আছড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে। গোধরার খবর আর দাঙ্গা শেষ হয়ে গেলে টিভি চ্যানেলগুলো ঠিকই তাদের কাজ ক'রে চলল কিন্তু শেষ হয়ে গেল আমার জীবন। এসব কিছুর ভেতর দিয়ে আমাকে দিন কাটাতে হত। তখন বড়ি খেতাম না। ভাববেন না যে আজ এখানে আছি বলে আমার গায়ে জোর কম।" একটু থামল সে। "ঐ ঘটনার তিন মাস পর অমির মা বাড়ি এসে দোকানটা আবার আমাকে খুলতে বলেন। অমি তাকে বলেছিল দুনিয়ার মধ্যে নাকি এটাই তার প্রিয় জায়গা। মামা বেঁচে নেই, দোকানটা তাই এখন অমির মায়ের। তার ছেলের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি দোকানটা আমাদের দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।"

"তো আপনি রাজি হয়েছিলেন?"

"প্রথম প্রথম তার চোখের দিকে তাকাতে পারতাম না। আমাদের জন্য অমি মারা গেছে, মামার মৃত্যুতে আমার ভূমিকা ছিল, এসবের অপরাধবোধ কাজ করত আমার মধ্যে। কিন্তু তিনি আমার দুঃস্বপ্নের কিছুই জানতেন না। আমারও কোন না কোন ভাবে জীবিকা উপার্জন করতে হচ্ছিল। লোকসান হচ্ছিল ব্যবসায়। অনেক সাপ্লাই কন্ট্র্যাক্ট বাকি পড়েছিল। এজন্য আবার দোকানে ফিরে এলাম। অমির মাকে ইশ বলল যে, সেও আসতে চায়। তবে আমার সাথে কিছু করবে না। অমির মা আমাদের দু'জনকেই চাচ্ছিলেন। কাজেই সমাধান একটাই ছিল।"

"সেটা কি?"

"দোকানটা আমরা দু'ভাগ ক'রে ফেললাম। মাঝখানে প্লাইউডের একটা দেয়াল দিয়ে দিলাম আমরা। ইশ ডান পাশটা নিয়ে স্পোর্টসের দোকান চালিয়ে গেল, আমি বাম পাশটাতে ছাত্র-ছাত্রিদের জন্য মনোহারী আর পাঠ্যপুস্তকের দোকান দিলাম। তার খদ্দেররা প্রায়ই আমার দোকানে আসত। আবার উল্টোটাও ঘটত। একই জায়গায় আমরা স্পোর্টস আর পড়াশুনো দুইয়েরই ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু কখনও একবারও কথা হয় নি আমাদের মাঝে। ২০০৩ বিশ্বকাপে ইন্ডিয়া ফাইনালে উঠলেও কোন কথা হল না। ইশ এখন একা একাই ম্যাচ দেখে। ছক্কা মারলে আগের মত আর লাফায় না।"

"বিদ্যার সাথে তারপরে আর কখনও যোগাযোগ করেছিলেন? আর আলীর কী হল তারপর?" বুঝলাম তার জন্য সহায় হওয়ার চাইতে তাকে বরং বেশি বেশি প্রশ্ন ক'রে ফেলছি। কিন্তু ওগুলো আমার জানার দরকার ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওরা বিদ্যাকে বোম্বে পাঠিয়ে দেয় পি.আর কোর্স করার জন্য। তার জন্য এটা একটা ইতিবাচক জিনিস। ওরা চাচ্ছিল মেডিকেল কলেজে হোক বা না হোক, বিদ্যা আমার থেকে দূরে চলে যাক। কাজেই বিদ্যা তার খাঁচা ছেড়ে উড়ে গেল। তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, আমার সাথে যেন আর কখনও কথা না বলে। অবশ্য নিয়ম ভাঙতে সে খুব ভালবাসে। ওখান থেকেই দু'বার আমার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু আমি কোন জবাব দিই নি। দিতে পারি নি আর কি...প্রতিদিন ওর দাদাকে দেখতাম। শুধু চেষ্টা করতাম যত বেশি সম্ভব টাকা আয় ক'রে আলীর জন্য জমিয়ে রাখতে হবে।"

"তাকে লালন-পালনের জন্য?" বলে চায়ে একটা চুমুক দিলাম। হাসপাতালের চায়ের স্বাদ ডেটলের মতো কেন?

"আলী এখন ইশের বাড়িতে থাকে। কাজেই ভালভাবেই তার লালনপালন হচ্ছে। কিন্তু তার কব্জিতে অস্ত্রোপচারের জন্য আমাদের টাকা দরকার। অনেক টাকা," গোবিন্দ বলল।

সকালের চেকআপের জন্য নার্স কামরায় এলেন। গোবিন্দ টয়লেটে যাবে বললে নার্স সম্মতি দিলেন। তার সাথে লাগানো ড্রিপ আর মনিটরের কর্ডগুলো খুলে নিলেন। দশ মিনিট চিন্তিত হয়ে অপেক্ষা করলাম আমি। সে কতটুকু সুস্থ, আমার সন্দেহ আছে। ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ধরনের অস্ত্রোপচার?"

"আলীর কব্জিতে সমস্যা হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাট ঘুরানোর সামর্থ্য তার চলে গেছে। আমি তার জীবন বাঁচিয়েছি। কিন্তু আমার এক সেকেন্ডের দেরি হওয়ার জন্য তার সহজাত গুণটা হারিয়ে গেছে। আপনাকে বলেছি, এই দেরিটাই হচ্ছে আমার জীবনের তৃতীয় ভুল।"

AMARBOI.COM

"আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এক মুহূর্তের মাত্র দেরি হয়েছে," আশ্বস্ত করে বললাম তাকে।

"কিন্তু ওই মুহূর্তে তো বুঝেছিলাম, আমি আসলে স্বার্থপর ছিলাম। যেমন ধরুন যখন মলে দোকান করতে চাচ্ছিলাম বা বিদ্যার সাথে ছিলাম, তখন যে রকম উঁচু আকাঙ্ক্ষা ছিল, ওই মুহূর্তে সে ধরনের স্বার্থ আমার মাঝে কাজ করছিল। ওরা ঠিকই করেছে, বুঝতেই পারছেন। আমি কোন ব্যবসায়ী নই, স্বার্থপর এক জারজ," বলেই আবার কথা বলার আগে থেমে নিল সে।

"ওর সার্জারি দরকার। ত্রিশূলের জন্য কব্জি থেকে কিছুটা মাংস উঠে গিয়েছিল। এখন উরু থেকে কিছুটা মাংস কেটে ডাক্তারদের সেটা কব্জিতে লাগাবে। তারপর হয়তা ডাক্তার আশা করতে পারে যে কাজ হবে। এটাকে সিনথেটিক সিলিকন গ্রাফট বলে না, এটা হল মাসল ট্রান্সফার। শুধু বিদেশেই এটা করা যায়। ব্যাপক খরচ তাতে।"

"কত?"

"পুরো খরচ কত হবে সেটা নিয়েও আমার সাথে সে কোন কথা বলে নি। কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খরচের জন্য ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার অনেক হাসাপাতালের কাছে চিঠি লিখেছিল ইশ। ইংল্যান্ডের একটা হাসপাতালের কাছ থেকে সবচেয়ে ভাল সাড়া পাওয়া গেছে। পাঁচ লাখ টাকায় অস্ত্রোপচার করে দেবে তারা। অবশ্য এসব কথা ইশ কখনও আমাকে বলে নি। পাতলা সেই প্লাইউডের দেওয়ালের পাশ থেকেই সব কথা শুনেছি আমি।"

"আপনাদের কাছে টাকা আছে?"

"গত তিন বছরে ইশ দুই লাখ জমিয়েছে। আমি জমিয়েছি আরও তিন লাখ। গত সপ্তায় ওর কাছে টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম, বললাম, আমাদের সব টাকা পয়সা এক জায়গায় ক'রে আলীর অপারেশনটা ক'রে ফেলি। হাসপাতালে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতেও নয় মাস লাগবে। বললাম, এজন্য এখনই কাজ শুরু করা দরকার। তখন ও...." গোবিন্দর গলা আবার রুদ্ধ হয়ে এল।

"আপনি ঠিক আছেন তো?" আমি বললাম।

গোবিন্দ মাথা নেড়ে সায় দিল। "জানেন ও কী করল?" আমার টাকা ছুঁতে অস্বীকার করল ও। ক্রিকেটের দস্তানা হাতে পরে তারপর খামটা ফেরত দিয়ে দিল। ওর ক্যাশবাক্সটা আমাকে দিয়ে বলল, আমার লোভ চরিতার্থ করার জন্য টাকার দরকার হলে সে টাকা দিতে পারে। বলল, অসৎ লোকের টাকা দিয়ে আলীর অপারেশন করতে চায় না সে।"

গোবিন্দের কণ্ঠস্বর ভেঙে যেতে লাগল। "আমি অসৎ নই। আমি স্বার্থপর, ভুল ক'রে ফেলেছি। কিন্তু তাই বলে অসৎ না। আর আমি শুধু টাকার চিন্তা করি না। আলীর চিন্তাও আমার মাথায় আছে।"

আমি বিছানায় বসে তার বাহুর উপরে আমার হাত রাখলে সে হাতটা সরিয়ে নিল।

"তিন বছর ধরে একটা একটা ক'রে রুপি জমিয়েছি, আর ইশ কিনা এখন আমার পরিশ্রমকে অসৎ বলছে। এটা আমি সহ্য করতে পারি নি। রাতে ঘুমের সমস্যা হয় বলে ডা: বর্ম আমাকে ঘুমের বড়ি দিয়েছিলেন। ওইদিনই ভাবলাম সারা জীবনের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেই ভাল হয়। হয়ত জীবনের হিসেবে ভুল ক'রে ফেলেছি। অঙ্ক পরিত্যাগ করার সময় ছিল সেটা।" ম্লান হাসল সে।

সকাল ৭টায় ডাক্তার গোবিন্দর ওয়ার্ডে এলেন। বড়ির রাসায়নিক উপাদানগুলো গোবিন্দর দেহ থেকে বের ক'রে ফেলা হয়েছে।

"রোগীর ছয় ঘণ্টা ঘুমের দরকার," পর্দা টেনে দিতে দিতে ডাক্তার বললেন।

আমি ক্যাবিন ছেড়ে বাইরে চলে এলাম। করিডোরে একটা বেঞ্চের উপরে গোবিন্দর মা বসে আছেন। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন তিনি।

"ভাল আছে। একটু বিশ্রাম দরকার," তার পাশে বেঞ্চে বসলাম।

"কী সাহসী ছেলে ছিল আমার, কী হল তার?" তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

"সে ভেবেছে তার অনেক সাহস ছিল," আমি বললাম। "ইশ কি জানে?

তিনি আমার দিকে আঁড়চোখে তাকালেন, "ওরা তো একে অন্যের সাথে কথা বলে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কি হয়েছে সেটা ওকে বলতে পারবেন? হাসপাতালে আসার জন্য ওকে অবশ্য জোর করবেন না," আমি বললাম।

গোবিন্দর মা মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। আমরা এক সাথে হাসপাতাল ছেড়ে এলাম। তিনি একটা অটোয় গিয়ে বসলেন। আমি আবার বললাম, "আচ্ছা, বিদ্যা বোম্বের কোন্ কলেজে আছে জানেন?"

"এত লোকজন আসে? এটা তো কোন ক্লাব না, হাসপাতাল," সন্ধ্যায় গোবিন্দের বিছানার চাদর পাল্টাতে পাল্টাতে নার্স বিড়বিড় ক'রে বললেন।

হাসপাতালে গোবিন্দের কামরাটা লোকজনের কথাবার্তায় মুখর। নার্স বাদেও ইশ, বিদ্যা, গোবিন্দের মা আর আমি আছি। আমরা অপেক্ষা করছি, মিঃ কুম্ভকর্ণ কখন তার দ্বিতীয় দিবানিদ্রা ছেড়ে জেগে ওঠে। তার ঘুমের বড়ির কারণে অনেক মানুষের ঘুম চলে গেছে।

গোবিন্দের চোখের পাঁপড়ি কেঁপে উঠলে সবাই তার বিছানার আরও কাছে এগিয়ে গেল।

"ইশ? বিদ্যা?" গোবিন্দ চোখ পিটপিট ক'রে তাকাল।

"মনোযোগ কাড়ার জন্য আরও ভাল উপায় আছে," বিদ্যা বলল।

"তুমি কখন এসেছ?" গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল। বাকিদের কথা সে ভুলেই গেছে।

"মার্কেটিং ক্লাস অর্ধেক ক'রে চলে এসেছি," বিদ্যা বলল। "কিন্তু তার মানে এই না যে, আমার জবাব না পাঠানো কিংবা এই পিল খাওয়ার ব্যাপারটা জন্য তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। আমি কখনই পিল খাই নি। এমনকি যখন সবচেয়ে ভয়ে ছিলাম তখনও না। তুমি তো জানোই কখনকার কথা বলছি।"

"তোমার বাবা-মা চাইছিলেন তুমি আর কখনও আমার সাথে কথা না বলো। ইশও তাই চাইছিল।"

"তো?" বিদ্যা কাঁধ থেকে কলেজ ব্যাগটা নামিয়ে বিছানার উপরে রাখল। "তোমার মন কি চাইছিল?"

গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে ইশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। গোবিন্দের মাকে মানসিকভাবে আহত মনে হচ্ছে এখন। সম্ভবত একদিন বিদ্যার মত তেজী বউ পাবেন সেই ভয়ই পাচ্ছেন তিনি।

"আমি দুঃখিত, ইশ। আমি কাউকে আঘাত দিতে চাই নি। আমি তাকে ভা... ভালবাসতাম," গোবিন্দ বলল।

ইশ কামরার বাইরে চলে যেতে উদ্যত হলে গোবিন্দের মা তার পেছনে গিয়ে বাহু টেনে ধরলেন। তাকে টেনে এনে ইশের হাতটা গোবিন্দের হাতের উপরে রাখলেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বাবা-মার কথা তোমাদের শোনার দরকার নেই। কিন্তু আমার মনে হয় তোমাদের আবার বন্ধু হয়ে যাওয়া উচিৎ," গোবিন্দের মা বললেন।

ইশ কোন কথা বলল না। গোবিন্দ ইশের হাত আঁকড়ে ধরল। গোবিন্দের মা বলে চললেন :

"জীবনে অনেক বিপদ আসবে। কাছের লোকে আঘাত করবে। কিন্তু ভেঙে পড়বে না। তাদেরকে পাল্টা আঘাতও করবে না। তাদের মনের ক্ষত সারিয়ে তুলবে তোমরা। এটা শুধু তোমাদের জন্যই বলছি না, এই শিক্ষাটা আমাদের দেশের জন্যেও খুব দরকার।"

"শিম্পাঞ্জিদের চুমোচুমির কথা মনে আছে?" গোবিন্দ তার কথার পিঠে কথা বলল।

গোবিন্দের দিকে ফিরে তাকাল ইশ।

"আলীর জন্য টাকাটা নিয়ে যা। আমার জন্য টাকাটা ব্যাপার না। আলীকে পুরোপুরি সুস্থ ক'রে তোল। ওটা আমার কাছেও গুরুত্বপূর্ণ।"

ইশ কান্না থামাতে গিয়ে জোরে নাক টানলো।

"তুই আমাকে মাফ দিতে পারবি। তিন বার বন্ধু হয়ে গেছে কিন্তু?" গোবিন্দ বলল।

গোবিন্দ আর ইশ দু'জনেরই চোখই ভিজে গেছে।

"কাকী, ব্যাপারটা অদ্ভুত না? ওয়ার্ডের সব কয়টা পুরুষ কাঁদছে। আর মেয়েগুলো মনে হচ্ছে, এক সাথে দল পাকিয়ে বসে আছে?" বিদ্যা বলল।

গোবিন্দর মা ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। আত্মবিশ্বাসী নারীরা ভয়াবহ বউ হয়।

পরদিন সকালে এয়ারপোর্টে যাওয়ার ঠিক আগে আগে গোবিন্দের সাথে দেখা করলাম। ওই দিন সন্ধ্যায় গোবিন্দের হাসপাতাল ছাড়ার কথা।

"ধন্যবাদ," আবেগ ভরে বলল সে।

"কী জন্যে?"

"দেখতে আসার জন্য। জানি না এর শোধ কখনও কিভাবে দেব...আসলে উপায় একটা থাকেই," গোবিন্দ অপেক্ষা করতে থাকল।

"আপনার কাহিনীটা অন্যদের সাথে শেয়ার করা দরকার।"

"বই আকারে?"

"হ্যা, ঠিক তাই, আমার তিন নম্বর বই। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?"

"জানি না। যেসব গল্পের মধুর সমাপ্তি আছে শুধু সেগুলোই আমি পছন্দ করি," সে বলল।

"আপনার শেষটা তো যথেষ্ট মধুর।"

"আলীর কী হবে এখনও জানি না। আমরা অপারেশন করানোর জন্য যাচ্ছি, কিন্তু সফলতার সম্ভাব্যতা একশ ভাগ নয়। ওরা বলল পঞ্চাশ-পঞ্চাশ সম্ভাব্যতা আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বিশ্বাস রাখেন। সম্ভাব্যতার ব্যাপারটা বইপুস্তকের জন্য ছেড়ে দেওয়াই ভাল," আমি বললাম।

সে মাথা নেড়ে সায় দিল।

"তাহলে আমি ফিরে যাই। ই-মেইলে আমাদের যোগাযোগ থাকবে," আমি বললাম।

"অবশ্যই, আমরা ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করব। কিন্তু আলীর ব্যাপারটা না জেনে গল্পটা বাজারে ছাড়বেন না। ঠিক আছে? তাহলে হয়তা আপনার পরিশ্রম ভেস্তে যেতে পারে। সে বলল।

"ঠিক আছে," আমি বললাম, এরপরে হাত মিলালাম তার সাথে।

চলে আসার সময় হাসপাতালে ঢোকার পথে বিদ্যার সাথে দেখা। সবুজ লেহাঙ্গা পরে আছে সে। গোবিন্দের মন চাঙ্গা করার জন্য এটাই সম্ভবত তার সবচেয়ে মনোরম পোশাক। তার কাছে একটা ফুলের তোড়া আছে দেখতে পেলাম।

"চমৎকার গোলাপ," আমি বললাম।

"ল গার্ডেনে সবচেয়ে সুন্দর গোলাপগুলো আছে। আহমেদাবাদকে খুব মিস্ করি। ছয়মাস পরে কোর্স শেষ হবে। সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছি না," বলল সে।

"আমি ভেবেছিলাম, আপনি বোম্বের মেয়ে। ছোট শহর বা এরকম কিছুতে আঁটকা পড়ে আছেন।"

"ও! সে আপনাকে সব বলেছে? সবকিছু?" তাকে আহত দেখাচ্ছে।

"অনেক কিছুই বলেছে।"

"আচ্ছা, বোম্বে সুন্দর জায়গা কিন্তু আমার নিজের যেটা সেটা আমার নিজেরই। আহমেদাবাদের পাও-ভাজির স্বাদ অনেক ভাল।"

তার সাথে আরও গল্প করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তখন চলে যাবার সময়। তারা আমাকে তাদের ভুবনে প্রবেশ করিয়েছে কিন্তু সেখানে আর অবস্থান করার মত সময় আমার নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ কথা ২

সিঙ্গাপুরে আমার হোম কম্পিউটারের সামনে বসে আছি। মাঝরাতে আমার স্ত্রী আমার ডেস্কের কাছে এল।

"এই গল্পটা এবার বাদ দেওয়া যায় না? তোমার যা করার তাতো করেছ। কিছু হলে সে তোমাকে জানাবে," সে বলল।

"হ্যা, কিন্তু এখন তারা লন্ডনে আছে। অপারেশন করা শেষ হয়ে গেছে। আলী প্রতিদিন ফিজিও এক্সারসাইজ করছে। যে কোন সময় ব্যাট করার ক্ষমতা ফিরে পাবে সে।"

"এক মাস ধরে বার বার এ কথাটাই বলছ। এখন লাইটটা কি বন্ধ করতে পার না, প্লিজ?"

শুয়ে শুয়ে ওদের কথা ভাবছি। লন্ডনে এখন দিনের বেলা ডাক্তাররা ওকে কি আজকে ক্রিকেট মাঠে গিয়ে খেলতে দেবে? এত দীর্ঘ বিরতির পর বলে আঘাত করলে কী হবে তার? কব্জিতে কি খেলার জন্য যথেষ্ট জোর থাকবে? ঘুমানোর জন্য গড়াগড়ি দিতে দিতে নানা চিন্তা মাথায় আসছে।

পরদিন সকালবেলা তাড়াতাড়ি জেগে উঠলাম। গোবিন্দর কাছ থেকে একটা এসএমএস এসেছে।

ডাক্তার আলীকে খেলতে বলেছে,
প্লিজ, প্রার্থনা করবেন।
আগামীকাল পিচে নামবে।

ডাক্তাররা আলীকে খেলার অনুমতি দিয়েছে সেটাই জানিয়েছে সে। পরদিন অফিসে গলাম। লন্ডন-সিঙ্গাপুরের চেয়ে আট ঘণ্টা পিছিয়ে আছে। বিকেল ৪টায় কফি খাওয়ার সময় ফোনটা চেক করলাম। কোন মেসেজ নেই। রাত ৮টায় অফিস ছেড়ে এলাম। ট্যাক্সিতে করে ফেরার সময় ফোনটা শব্দ ক'রে উঠল।

আলীকে বল করেছে ইশ।
আলী ভালমতই কব্জি নড়াচড়া করতে পারছে।
সোজা ছক্কা মেরেছে...!

• • •

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতিঘর প্রকাশনী

AMARBOI.COM

পুস্তক তালিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতিঘর প্রকাশনীর উল্লেখযোগ্য এবং জনপ্রিয় বইয়ের তালিকা :

দ্য দা ভিঞ্চি কোড : মূল : ড্যান ব্রাউন, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৪৪৮, মূল্য: ৩০০.০০ টাকা

দু'হাজার বছরের পুরনো একটি সত্যকে চিরতরে নির্মূল করার জন্যে প্যারিসে একই দিনে চারজন প্রখ্যাত ব্যক্তিকে হত্যা করা হলো। সত্যটি জনাজানি হয়ে গেলে একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ভিত্তি কেঁপে যাবে, হাজার বছরের ইতিহাস লিখতে হবে একেবারে নতুন ক'রে। হাজার বছর ধরেই সেই সত্যটি লালন ক'রে আসছে একটি গুপ্ত সংঘ—সেই গুপ্ত সংঘের সদস্য ছিলেন আইজ্যাক নিউটন, ভিক্টর হুগো, বত্তিচেল্লি আর লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো ব্যক্তিবর্গ। এ দিকে উগ্র ক্যাথলিক সংগঠন ওপাস দাই সেই সত্যকে চিরতরে ধ্বংস করার আগেই গুপ্তসংঘের গ্র্যান্ডমাস্টার তার ঘনিষ্ঠ একজনের কাছে হস্তান্তর ক'রে দেয় আর ঘটনাচক্রে এরকম একটি মারাত্মক মিশনে জড়িয়ে পড়ে হারর্ভাডের এক অধ্যাপক এবং সিম্বোলজিস্ট।

সাম্প্রতিককালের সবচাইতে আলোড়নসৃষ্টিকারী এই উপন্যাসটি পাঠকের মনোজগৎ নাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে।

দ্য লস্ট সিম্বল : মূল : ড্যান ব্রাউন, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৫৭০, মূল্য: ৪০০.০০ টাকা

হাজার হাজার বছর ধরে একটি সিক্রেট জ্ঞান রক্ষা করে যাচ্ছে সিক্রেট সোসাইটি ফ্রিম্যাসন। সেই জ্ঞান ভুল কারো হাতে পড়লে এ পৃথিবীর অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে যাবে। এক অদ্ভুত শক্তি সিম্বলজিস্ট রবার্ট ল্যাংডনকে ফাঁদে ফেলে নিয়ে আসে ওয়াশিংটন ডিসি'তে; বাধ্য করে তাকে সেই সিক্রেটটা উদ্ধার করে তার হাতে তুলে দিতে। নিরুপায় ল্যাংডন বাধ্য হয় তার কথা শুনতে কিন্তু তারপর—বহুল প্রতিক্ষীত দ্য দা ভিঞ্চি কোড-এর পরবর্তী সিকুয়েল দ্য লস্ট সিম্বল-এ পাঠক খুঁজে পাবেন ভিঞ্চি কোড-এর সুপরিচিত রোমাঞ্চ।

ডিসেপশন পয়েন্ট : মূল : ড্যান ব্রাউন, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩৫২, মূল্য: ২৪০.০০ টাকা

দুনিয়া কাঁপানো এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সারা পৃথিবী যখন উদ্বেলিত পর্দার অন্তরাল থেকে তখন ঘটতে থাকে একের পর এক ঘটনা–খুন হতে শুরু বিজ্ঞানী, রাজনীতিক আর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা। এরই মধ্যে চারজন সিভিলিয়ান বৈজ্ঞানিক আরসিক্রেট সার্ভিসের এক তরুণী অফিসার বিশ্বের সবচাইতে বিপজ্জনক জায়গায় ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। পর্দার আড়ালে থাকা একটি শক্তি সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছে কেন–সেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে কি এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

নিঃসন্দেহে বলা যায় ড্যান ব্রাউনের এই একটি রকেট গতির থ্রিলারটি পড়ে পাঠক অভিভূত হবেন।

গডফাদার : মূল : মারিও পুজো, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩৭৬, মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

দুর্বল যখন আদালতের সুবিচার পায় না তখন হাজির হয় এক গোপন বিচারকের কাছে। রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার স্বাদ নিতে আর ব্যবসায়ীরা সাহায্যের জন্যে ছুটে যান তারই কাছে। নিজেই নিজের নিয়ম তৈরি করে সৃষ্টি করেছেন এক জগৎ। সেই জগতে তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। বন্ধুর জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করতে পিছ পা হন না, শত্রুর কাছে ভয়ঙ্কর এক বিভীষিকা। তিনি বিশ্বাস করেন প্রতিটি মানুষের একটাই নিয়তি থাকে আর সেটা তৈরি হয় ঘটনাচক্রে। সমাজের ভেতর সমাজ আর রাষ্ট্রের ভেতর রাষ্ট্রের যে জগৎ সেই জগতের শক্তিকেন্দ্রে ব'সে সবার অলক্ষ্যে কলকাঠি নাড়েন গডফাদার।

মারিও পুজো'র কালজয়ী এই উপন্যাসটি পাঠকের অবশ্যই পড়া উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্লামডগ মিলিয়নেয়ার : মূল: বিকাশ স্বরূপ, অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ: ২৫৬, মূল্য : ২০০.০০

আঠারো বছরের বস্তির এক ছেলে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কুইজ শো'তে অংশ নিয়ে একশ কোটি রুপি জিতে নিলো। শুরু হলো এক গভীর ষড়যন্ত্র। কি করে এই ছেলে বোরোটি কঠিন প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পালো? সে কি জালিয়াতি করেছে–ভাগ্য কি তার সহায় ছিলো–সে কি অনেক প্রতিভাবান–নাকি...? এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে পাঠককে ভ্রমণ করতে হবে বস্তির সেই ছেলেটার সমগ্র জীবন, আর সেই জীবনটা অসম্ভব রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ। অসাধারণ আর দুনিয়া কাঁপানো একটি উপন্যাস। বর্তমান সময়ের সবচাইতে আলোচিত একটি বই।

দ্য ডে অব দি জ্যাকেল: মূল:ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ:মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন,পৃ: ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০টাকা

লম্বা সোনালী চুলের এক ইংরেজ। পেশায় ভাড়াটে খুনি। পৃথিবীর বড় বড় গোয়েন্দা সংস্থা কিংবা সিক্রেট সার্ভিসের কাছে সে অজ্ঞাত-অপরিচিত। সম্পূর্ণ একা, বিশেষভাবে তৈরি করা একটি রাইফেল নিয়ে ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেবার মিশনে নেমেছে সে। অপ্রতিরোধ্য জ্যাকেলকে থামাবে কে, কিভাবে—কেউ জানে না।

এটি ফ্রেডরিক ফরসাইথ'র কালজয়ী থ্রিলার।

সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্: মূল :টমাস হ্যারিস, অনুবাদ:মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ:৩২০ মূল্য:২৪০.০০ টাকা

অজ্ঞাতনামা এক সিরিয়াল কিলার একের পর এক তরুণীকে বীভৎসভাবে হত্যা ক'রে চলেছে। প্রবল চাপে দিশেহারা এফবিআই সেই খুনির পরিচয় জানতে তাদের এক এজেন্টকে পাঠায় নয়টি নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত মানুষখেকো ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারের কাছে। দূর্বোধ্য আর ধূর্ত লেকটার তার অসাধারণ মেধার সাহায্যে সেই খুনিকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে নাকি চরিতার্থ করবে নিজের উদ্দেশ্য—সেই প্রশ্নের উত্তর পাঠক খুঁজে পাবেন শতাব্দীর সেরা অসাধারণ এই সাইকো থ্রিলারে।

রেড ড্রাগন : মূল : টমাস হ্যারিস, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

ভয়ঙ্কর এক সিরিয়াল কিলারকে ধরার জন্যে মরিয়া এফবিআই তাদের সেরা এজেন্ট উইল গ্রাহামকে কুখ্যাত ডক্টর লেকটারের কাছে পাঠায়। ভয়ঙ্কর সেই খুনির পিছু নিতে গিয়ে উইল গ্রাহাম বুঝতে পারে ধূর্ত খুনি এখন তাকেই টার্গেট ক'রে ফেলেছে আর এ কাজে বন্দী অবস্থায়ও সাহায্য করেছে স্বয়ং ডক্টর লেকটার। বাঁচার একটাই পথ খোলা আছে—সেই ধূর্ত খুনিকে পাকড়াও করা। এক সময় সবাই যখন নিশ্চিত হয় খুনি মারা গেছে তখনই চূড়ান্ত আঘাত হানা হলো—কিন্তু কে, কিভাবে?

এই উপন্যাসের মাধ্যমে ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার চরিত্রটির আর্বিভাব ঘটে। এটি বিশ্ববিখ্যাত সাইকো থ্রিলার *সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্*'র প্রিকুয়েল।

বর্ন আইডেন্টিটি : মূল : রবার্ট লুডলাম, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৫১২ মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

তার কোনো অতীত নেই। সম্ভবত ভবিষ্যৎও নেই। তার স্মৃতিভাণ্ডার একেবারেই শূন্য। সে কেবল জানে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভূ-মধ্যসাগর থেকে একদল জেলে তাকে উদ্ধার করেছে। নিজের শরীরে সংযুক্ত থাকা অদ্ভুত একটি ক্লু উদ্ধার হলে নিজের পরিচয় উদঘাটনের জন্যে মরিয়া ওঠে সে আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী আর হিংস্র একদল লোক তাকে হত্যা করার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। ওদিকে সন্ত্রাসের যুবরাজ কার্লোস দি জ্যাকেলও তাকে খুন করার জন্যে পিছু নেয়—কিন্তু কেন, কিসের জন্যে, তার কিছুই জানে না জেসন বর্ন। একে একে বদলে যেতে থাকে তার পরিচয়, বেরিয়ে আসতে থাকে লোমহর্ষক সব ঘটনা। শেষপর্যন্ত কি জেসন বর্ন এই সব ভয়ঙ্কর লোকের হাত থেকে বাঁচতে পারবে, জানতে পারবে নিজের ভয়ঙ্কর অতীত আর সত্যিকারের পরিচয়—*বর্ন আইডেন্টিটি*'তে পাঠক সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবেন।

বর্ন ট্রিলোজির এই প্রথম পর্বটি পাঠককে অসাধারণ চরিত্র জেসন বর্ন-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ন সুপ্রিমেসি : মূল : রবার্ট লুডলাম, অনুবাদ : রিশাদ হাবীব, পৃ : ৪৪৮ মূল্য : ৩২০.০০ টাকা

জেসন বর্ন আবার ফিরে এসেছে! চায়নার তাইস প্রিমিয়ারকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। জানা গেলো তার নাম ব্যবহার ক'রে আরেক খুনি সুদূর প্রাচ্যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে গভীর এক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে। সেই খুনিকে থামাতে না পারলে পৃথিবীকে চরম মূল্য দিতে হবে। আর এ কাজ করতে পারে কেবল আসল জেসন বর্ন। আবারো তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করা হলো। কিন্তু যারা তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করলো তারা বুঝতে পারলো, তাকে নিয়ে খেলতে যাওয়াটা মোটেও ঠিক হয় নি।

দ্য কনফেসর : মূল : ড্যানিয়েল সিলভা, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ :৩২০ মূল্য : ২৪.০০ টাকা

আর্ট রেস্টোরার গ্যাব্রিয়েল আলোন, দ্বৈত জীবন যাপন করে সবার অগোচরে—বিশেষ এক মিশনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর হত্যারহস্য উদঘাটনে নামে সে। কেঁচো খুঁড়তে বেরিয়ে আসে সাপ। ভ্যাটিকানের এক গোপন সিক্রেট ফাঁস হয়ে যায়; শুরু হয় নতুন এক ষড়যন্ত্রের। মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়ে যান স্বয়ং পোপ। আমেরিকার জনপ্রিয় স্পাই নভেলিস্ট ড্যানিয়েল সিলভার টান টান উত্তেজনার এই থ্রিলারটি পাঠককে ভিন্নধর্মী স্বাদ দেবে।

দান্তে ক্লাব : মূল : ম্যাথিউ পার্ল, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৪৩২ মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

গৃহযুদ্ধের বিভীষিকা শেষ হতে না হতেই বোস্টন শহরে ঘটতে থাকে ভয়ঙ্কর সব হত্যাকাণ্ড—অভিনব আর বীভৎসভাবে হত্যা করা হয় শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিদেরকে। ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে সবগুলো হত্যাকাণ্ডই মহাকবি দান্তের মহাকাব্য *ইনফার্নো*'র অনুপ্রেরণায় করা হয়েছে। মারাত্মক এক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায় দান্তের সাহিত্যকর্ম। এদিকে হারভার্ড কেন্দ্রিক দান্তে ক্লাবের কয়েকজন পণ্ডিতব্যক্তি এবং বিখ্যাত কবি লংফেলো এই রহস্যের জট খুলতে নেমে পড়েন—কে খুন করছে, আর কেনই বা করছে, সেই প্রশ্নের জবাব পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠেন তারা। যারা দান্তে সম্পর্কে জানেন এবং যারা কিছুই জানেন না উভয়ের জন্যে এই বইটি হতে পারে কৌতূহলোদ্দীপক।

মোনালিসা : মূল :ডোনাল্ড সাসুন, অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩০৪ (১৬ পৃ: রঙ্গিন) মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

কী জন্যে মোনালিসা এ বিশ্বের সবচাইতে বিখ্যাত চিত্রকর্ম? কেন? পাঁচশত বছর ধরে ছবিটা রহস্যের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ডোনাল্ড সাসুন অনবদ্য ভঙ্গীতে মোনালিসা'র ইতিহাস, নান্দনিকতা, রহস্য আর আধুনিক বিশ্বে এর প্রভাব বিবৃত করতে গিয়ে শিল্পজগতের যে চিত্র উন্মোচন করেছেন—এক কথায় তাকে অসাধারণ বলতেই হয়। সংগ্রহে রাখার মতো একটি বই।

ওডেসা ফাইল : মূল:ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ২৮৮ মূল্য : ২০০.০০ পরাজিত নাৎসিদের গোপন সংগঠন ওডেসার ক্ষমতাশালী কয়েকজন সদস্য বিদেশের মাটিতে ব'সে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু কাকতালীয়ভাবেই সেই ঘটনায় ঢুকে পড়ে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক পিটার মিলার। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে সে ঢুকে পড়ে ওডেসার অভ্যন্তরে। নিতান্তই কি একটি এক্সক্লুসিভ রিপোর্টিংয়ের জন্যে মিলার এমনটি করছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওডেসার ভেতরে—নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনো ঘটনা!

ফ্রেডরিক ফরসাইথের আরেকটি অসাধারণ থ্রিলার।

ডগস অব ওয়ার : মূল :ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ:মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

আফ্রিকার এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে আবিষ্কৃত হলো প্লাটিনাম সমৃদ্ধ দশ বিলিয়ন ডলারের একটি পাহাড়। বৃটিশ এক ধনকুবের সেই দেশের সরকারকে উৎখাত ক'রে পুরো পাহাড়টি কুক্ষিগত করার জন্যে একদল ভাড়াটে যোদ্ধাকে নিয়োগ করে। কিন্তু ভাড়াটে যোদ্ধাদের দলনেতা ক্যাট শ্যাননের পরিকল্পনা সম্পূর্ন ভিন্ন রকম।

ফরসাইথের এই উপন্যাসটি সত্যিকারের একটি ঘটনা অবলম্বনে যাতে স্বয়ং লেখকও জড়িত ছিলেন ব'লে গুজব রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দি আফগান : মূল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : নাজিম হোসেন, পৃ : ২৮৮ মূল্য : ২২০.০০ টাকা

আল কায়েদা যখন টুইন টাওয়ারের চেয়েও মারাত্মক একটি আক্রমণের পরিকল্পনা করছে তখনই ঘটনাচক্রে তাদের সেই পরিকল্পনার কথা জেনে যায় বৃটিশ-মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা। কিন্তু কবে, কিভাবে, কোথায় সেই হামলা হবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। এসব জানার জন্যে তারা আল কায়েদার অভ্যন্তরে একজন এজেন্টকে অনুপ্রবেশ করায়। এজেন্ট মাইক মার্টিন যখন পুরো ঘটনাটি জানতে পারে তখন তাদেরকে থামানোর জন্যে তার আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্রও সে নয়। কিভাবে থামানো যাবে—সেই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে *আফগান* উপন্যাসে।

শ্যাডো ওভার ব্যাবিলন: মূল:ডেভিড ম্যাসন, অনুবাদ:নাজিম হোসেন, পৃ : ৩৫২ মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

ইরাকী স্বৈরশাসককে হত্যার জন্যে পর্দার আড়াল থেকে একটি শক্তি একদল ভাড়াটে যোদ্ধাকে নিযুক্ত করেছে—আমেরিকা আর বৃটেন অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই সেই খবরটা জানতে পেরে বিস্মিত হয়। তাদের অগোচরে কারা এ কাজ করতে মাঠে নেমেছে? পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়েই তারা নিজেদের টার্গেটকে বাঁচানোর জন্যে সেই ভাড়াটে যোদ্ধাদেরকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয়। ওদিকে ভাড়াটে যোদ্ধারা বিভিন্ন বাধা পেরিয়ে তাদের কাজে সফল হয়, আবার সাদ্দাম হুসেনও জীবিত থেকে যান! এমনই এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

সবশেষে যখন পাঠক জানতে পারবেন সেই আড়ালে থাকা শক্তিটির কথা নিঃসন্দেহে অবাক হবেন।

ফার্স্ট ব্লাড : মূল : ডেভিড মোরেল, অনুবাদ : নাজিম হোসেন, পৃ : ২০২ মূল্য : ১৮০.০০ টাকা

AMARBOI.COM

ভিয়েতনাম যোদ্ধা র‍্যাম্বো। যুদ্ধের বিভীষিকা আর ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় ফিরে এসেছে নিজ দেশে। সন্দেহজনক গতিবিধির কারণে পুলিশ তাকে গ্রেফতার ক'রে থানায় নিয়ে গেলে শুরু হয় এক প্রলয়ংকরী কাণ্ড। অসাধারণ যোদ্ধা র‍্যাম্বোকে আটকে রাখার মতো ক্ষমতা রাখে না কোনো পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনী; একের পর এক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে পুরো রাজ্যে হৈচৈ ফেলে দেয় সে। তাকে ধরার জন্যে মরিয়া ওঠে কয়েকটি রাজ্যের নিরাপত্তাবাহিনী। কিন্তু তাকে ধরা কিংবা হত্যা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। শুরু হয় মানুষ শিকারের এক মহা আয়োজন।

বিশ্বখ্যাত র‍্যাম্বো চরিত্রটি এই উপন্যাসের মাধ্যমেই আবির্ভূত হয়েছিলো। পাঠকের জন্যে দারুণ একটি উপন্যাস।

এ্যাবসলিউট পাওয়ার: মূল:ডেভিড বালদাশি, অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন,পৃ: ৩৫২ মূল্য: ২৫০.০০ টাকা

নিভৃতি রাতে গোপন এক অভিসারে লিপ্ত হয় প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এক লোক। দুর্ঘটনাক্রমে সেখানে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে সেই বাড়িতে চুরি করতে আসা এক চোর পুরো ঘটনাটি দেখে ফেলে। যখন জানা যায় এই কর্মকাণ্ডের একজন সাক্ষী রয়েছে, শুরু হয় সেই চোরকে নির্মূল করার অভিযান। কিন্তু লুথার হুইটনি দমে যাবার পাত্র নয়। সেও এ বিশ্বের সবচাইতে ক্ষমতাশালী লোকটির বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধের সূচনা করে। বেরিয়ে আসতে থাকে একের পর ঘটনা। অবশেষে লুথার হুইটনি তার মিশনে সফল হয়েছিলো কিনা সেই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে পড়ুন *এ্যাবসলিউট পাওয়ার*।

পেলিকান বৃফ : মূল : জন গৃশাম, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

এক রাতে আমেরিকার সুপৃমকোর্টের দু'জন বিচারক খুন হলে তদন্ত কাজ শুরু হয়। আইনের এক ছাত্রি নিতান্তই কৌতুহল আর একাডেমিক কারণে জড়িয়ে পড়ে সেই ঘটনায়। নিজের জীবন বিপন্ন দেখে আত্মগোপনে চলে যায় সে। আরো অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এক সময় মনে হয় খুনির সাথে হোয়াইট হাউজের সম্পর্ক আছে, কিন্তু শেষে গিয়ে পাঠক দেখবেন একেবারেই ভিন্ন একটি ঘটনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রু হিস্টোরি অব দি কেলি গ্যাং: মূল: পিটার ক্যারি, অনুবাদ: রাই শিল্পী, পৃ:৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

উনিশ শতকে অস্ট্রেলিয়ার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে নায়ক বনে যাওয়া কেলি এবং তার দলের সত্যিকারের উপাখ্যান নিয়ে রচিত একটি মর্মস্পর্শি উপন্যাস। লেখক এখানে কেলির বর্ণনায় কাহিনীটি বিবৃত করলেও নিজের দক্ষতারও স্বাক্ষর রেখেছেন। অসাধারণ বর্ণনা আর কৌতূহলোদ্দীপক সব চরিত্র নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনী এগিয়েছে। পিটার ক্যারির এই উপন্যাসটি মর্যাদাপূর্ণ বুকার প্রাইজ এবং কমনওয়েলথ রাইটার্স প্রাইজ লাভ করেছে।

কোমা : মূল : রবিন কুক, অনুবাদ : প্রিন্স আশরাফ, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

বোস্টন মেমোরিয়াল হাসপাতালে একের পর এক রোগী অপারেশন থিয়েটারে কোমায় আক্রান্ত হচ্ছে। সুজান হুইলার নামের এক মেডিকেল ছাত্রি হাসপাতালে তার প্রথম কর্মদিবসেই জড়িয়ে পড়ে সেই ঘটনার রহস্য উদঘাটনে। কিন্তু অদৃশ্য একদল লোক তার জীবননাশের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। এ কাজ থেকে তাকে বিরত রাখতে চায় তারা। অদম্য সুজান যখন সেই রহস্য উদঘাটনে সফল হলো তখন দেখা গেলো তার নিজের জীবনটাই বিপন্ন হতে বসেছে। কিন্তু অন্য আরেকজন শেষ মুহূর্তে সমস্ত হিসেব নিকেশ পাল্টে দেয়।

মেডিকেল থ্রিলারের জনক রবিন কুকের এই উপন্যাসটি বর্তমানে একটি ক্লাসিক হিসেবে স্বীকৃত।

অ্যাভেঞ্জার : মূল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ২৫৬ মূল্য : ২০০.০০ টাকা

এক আশ্চর্য চরিত্র ক্যালভিন ডেক্সটার। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত একজন, নিজের একমাত্র সন্তান মেয়ে আর স্ত্রীকে হারানোর পর বদলে যায় তার জীবন। অ্যাভেঞ্জার নাম নিয়ে শুরু করে নতুন এক মিশন। ওদিকে ধনী এক লোক তার নাতির হত্যাকারী সার্বিয়া-বসনিয়ার এক কুখ্যাত গণহত্যাকারীকে ধরার জন্যে নিয়োগ করে ডেক্সটারকে। শুরু হয় ডেক্সটারের অভিযান।

প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে ভিয়েতনাম, সার্বিয়া থেকে আমেরিকা, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, আল কায়েদা এবং সব শেষে টুইন টাওয়ারের ধ্বংসলীলা—সুবিস্তৃত এক পট বিধৃত হয়েছে *অ্যাভেঞ্জার*-এ। পাঠক ক্যালভিন ডেক্সটারে মুগ্ধ হবেন এবং সত্যিকারের রোমাঞ্চ অনুভব করবেন।

AMARBOI.COM

আইকন : মূল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ২২৪ মূল্য : ১৭০.০০ টাকা

এক সময়কার পরাশক্তি বর্তমানে অরাজকতার দ্বারপ্রান্তে। ক্যারিশম্যাটিক এক নেতা দেশবাসীকে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছেন, বিশ্ববাসীকে শান্তির অভয় বাণী শোনাচ্ছেন, অন্যদিকে এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ঘটনাচক্রে তর পরিকল্পনার কথা জেনে যায় পশ্চিমা বিশ্ব। এই বীভৎস ষড়যন্ত্র থামানোর জন্যে দায়িত্ব দেয়া হয় জেসন মল্ককে। যেকোনো মূল্যে এই ষড়যন্ত্রও থামানোর মিশন নিয়ে মাঠে নামে সে। কিন্তু তারপর...ইতিহাসের এই অনিবার্য গতিপথ কি থামানো যাবে।

বডি অব এভিডেন্স : মূল : প্যাট্রিশিয়া কর্নওয়েল, অনুবাদ : বশীর বারহান, পৃ : ৩৩৬ মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

প্যাট্রিসিয়া কর্নওয়েল-এর অসাধারণ সৃষ্টি স্কারপেট্টাকে মোকাবেলা করতে হয় ভয়ঙ্কর এক খুনির, যেকিনা বিখ্যাত এক সাহিত্যিককে হত্যা করেছে। ঔপন্যাসিকার অতীত জীবনের সাথে এই হত্যা রহস্যের সংযোগ রয়েছে। সুতরাং স্কারপেট্টাকে আগে জানতে হবে নিহতের ব্যক্তি জীবন। আর সেটা জানতে গিয়েই বিপদে পড়ে যায় সে। ভিন্নধর্মী এই মার্ডার থ্রিলারটি পাঠককে বেশ ভালো আনন্দ দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্য মানচুরিয়ান ক্যানডিডেট: মূল : রিচার্ড কনডন, অনুবাদ : নাজিদ হোসেন, পৃ : ৩০৪ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

ভয়ঙ্কর এক পরিকল্পনা—এক সৈনিককে ব্রেনওয়াশ করা হয় অসাধারণ একটি ষড়যন্ত্রের কারণে। তারপর...বাকিটার আস্বাদ গ্রহণ করতে পাঠককে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

রিচার্ড কনডনের এই মাইলস্টোন থ্রিলারটি পাঠকের ভালো লাগবে।

পয়েন্ট অব ইমপ্যাক্ট: মূল : স্টিফেন হ্যান্টার, অনুবাদ : নাজিদ হোসেন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

দক্ষ স্নাইপার বব লি সোয়েগারকে ভাড়া করা হয় গোপন এক মিশনের জন্য; কিন্তু ভয়ঙ্কর সেই মিশনে নেমেই বব বুঝতে পারে ঘটনা অন্য রকম–বিরাটস এক ষড়যন্ত্র ভেদ করে বব লি সোয়েগার কি পারবে নিজের জীবন নিয়ে ফিরে আসতে–জবাবটা নিহিত আছে স্টিফেন হ্যান্টারের অসাধারণ থ্রিলার পয়েন্ট অব ইমপ্যাক্ট-এ।

থ্রি মিসটেক্স অব মাই লাইফ : মূল:চেতন ভগত,অনুবাদ:ইশতিয়াক আহম্মেদ,পৃ:২৪৪,মূল্য: ২০০.০০ টাকা

চেতন ভগতের এই ভিন্নধর্মী উপন্যাসটি ভারতে রেকর্ড সংখ্যক পরিমাণে বিক্রি হয়েছে। আর ভারতীয় লেখকের বই এতো বেশি বিক্রি হয় নি। তিন যুবকের স্বপ্ন আর বাস্তবতা–ক্রিকেট, গণিত আর ব্যবসা। সমকালীন ভারত উঠে এসেছে সহজ সরল ভাষায়। অসাধারণ এই উপন্যাসটি খুব শীঘ্রই চলচ্চিত্র হিসেবে মুক্তি পাচ্ছে। ভিন্নধর্মী এই উপন্যাসটি পাঠকের ভালো লাগবে।

ফায়ার ফক্স : মূল : ক্রেইগ টমাস, অনুবাদ : ইশতিয়াক আহম্মেদ, পৃ : ২২৮ মূল্য : ২২০.০০ টাকা

রাশিয়ার তৈরি অত্যাধুনিক একটি ফাইটার জেট আমেরিকার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। উপায়ন্তর না দেখে তারা ঠিক করলো সেটা হাইজ্যাক করে নিয়ে আসা হবে–ব্যস শুরু হয়ে গেলো শ্বাসরুদ্ধকর এক কাহিনী। অলটাইম ফেভারিট টান টান উত্তেজনার অনবদ্য একটি টেকনো-থ্রিলার।

মে ডে : মূল : ক্লাইভ কাসলার, অনুবাদ : মকসুদ আহমেদ, পৃ : ২১৮ মূল্য : ২০০.০০ টাকা

ক্লাইভ কাসলা'র সৃষ্ট চরিত্র ডার্ক পিট'এর প্রথম অভিযান এটি। পাঠকের ভালো লাগবে।

যুযুধা : প্রিন্স আশরাফ, পৃ : ৩২০ মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

দেশীয় প্রেক্ষাপটে নির্মিত চমৎকার একটি থ্রিলার। নানান ষড়যন্ত্র আর ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে এর কাহিনী। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো একটি সাহসী আর ভিন্নধর্মী থ্রিলার।

অনুবাদ কবিতা : মূর্তালা রামাত পৃ : ৬৪ মূল্য : ৮০.০০ টাকা

ভিন্নধর্মী এই বইটিতে সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের অসাধারণ কিছু কবির কবিতার অনুবাদ ঠাঁই পেয়েছে। পাঠককে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার লক্ষ্যে তরুণ কবি মূর্তালা রামাতের এই কবিতার অনুবাদ কবিতাপ্রেমীদের কাছে বেশ প্রশংসিত হয়েছে।

বৃষ্টির মেয়েটা ব্যাঙের ছেলেটা: ইমরুল ইউসুফ, পৃ : ৪৮(চার রঙা) মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

শিশুদের কল্পনার জগতকে সমৃদ্ধ করার মতো অসাধারণ একটি গল্পের বই। যেকোনো মা-বাবার বইটি পড়লেই বুঝতে পারবেন তার সন্তানদের জন্য কতোটা উপযোগী এই ফ্যান্টাসি ধাঁচের গল্পগুলো। গল্পের সাথে অসাধারণ অঙ্কন প্রতিটি শিশুকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধেক বসন্ত গিয়েছে ভেসে আধেক গেছে স্রোতে : ফরহাদ খান চৌধুরি, পৃ : ৮০ মূল্য : ৮০

তরুণ কবি ফরহাদ খান চৌধুরির প্রেম আর দ্রোহের কবিতা। কবিতা ভালোবাসেন এ রকম পাঠককে আমোদিত করবে।

তোমার চুল আকাশে হেলান দিয়ে নক্ষত্র দেখে : ইমরুল ইউসুফ, পৃ : ৬৪ মূল্য : ৬০.০০ টাকা

এ প্রজন্মের তরুণ কবি ইমরুল ইউসুফের কাব্যগ্রন্থ। কবিতাপ্রেমীদের ভালো লাগবে।

মধ্যরাতে যুবকের ঘুম আসে না : কামাল হোসেন বাবলু, পৃ : ৬৪ মূল্য : ৮০.০০ টাকা

বর্তমান সময়ের প্রেমের উপন্যাস। অনেকটা আত্মজৈবনিক উপন্যাসের মতো এর কাহিনী বিবির্তিত হয়েছে চিরায়ত মানব-মানবীর প্রেম আর বিরহকে ঘিরে।

AMARBOI.COM

আরো যেসব বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে:

■*বর্ন আলটিমেটাম*–রবার্ট লুডলামের বর্ন ট্রিলোজির শেষ উপাখ্যান

■*ওয়ান নাইট এ্যাট দি কলসেন্টার*–চেতান ভগতের আরেকটি অসাধারণ উপন্যাস।

■*হ্যানিবাল*–টমাস হ্যারিসের হ্যানিবাল লিগ্যাসির তৃতীয় পর্ব

■*দি আমেরিকান*–হেনরি জেমসের ক্লাসিক উপন্যাস

■*ভিক্টোরিয়া ভিলা*–আগাথা ক্রিস্টির চমৎকার একটি বই

■*জাস্ট এ্যানাদার সাকার*–রিচার্ড হেডলি চেজের একটি থ্রিলার

■*আফটার দি ফিউনারেল*–আগাথা ক্রিস্টির আরেকটি সেরা কাজ

■*নো ওয়ান হিয়ার গেটস্ আউট এ্যালাইভ*–প্রখ্যাত রক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ক জিম মরিসনের জীবনীমূলক উপন্যাস

■ *রেড অ্যালার্ট*–অ্যালিয়েস্টার ম্যাকলিনের চমৎকার একটি থ্রিলার

শীঘ্রই প্রকাশ হতে যাচ্ছে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন-এর মৌলিক থ্রিলার

■ **নেমেসিস** : দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় লেখক পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলেন। সন্দেহের তীর গিয়ে পড়লো লেখকের যুবতী স্ত্রীর ওপর। বেরিয়ে এলো নানা কাহিনী। একে একে সন্দেহের আওতায় চলে এলো অনেক হোমরা চোমরার নাম। হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ শুরুতে সফলতা পেলেও এক পর্যায়ে ঘটনার কূলকিণারা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে শুরু করলো। পর্দার আড়াল থেকে একটি শক্তিশালী মহল সক্রিয় হয়ে ওঠে তদন্তে বাধা দেবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত জেফরি বেগ যা জানতে পারলো তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কী সেই ঘটনা জানতে হলে পড়ুন *নেমেসিস*।

■ **ম্যাজিশিয়ান** : উঠতি এক ম্যাজিশিয়ান প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম ক'রে যাচ্ছে আর একদল লোক মরিয়া হয়ে উঠছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যে। শুরু হলো ভয়াবহ একটি পরিকল্পনা। তারপর...বিশ্বাসঘাতকতা আর ষড়যন্ত্র। সব কিছু ভেদ ক'রে ম্যাজিশিয়ান কি পারবে নিজেকে রক্ষা করতে? ভিন্নধর্মী একটি থ্রিলার–ভিন্নধর্মী স্বাদ পাবেন পাঠক।

■ **মেডুসা কানেকশান** : ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের দু'দিন আগে সুদূর আফগানিস্তানে একটি ঘটনা ঘটে গেলো; ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই আফগানিস্তানে শুরু হলো গোপন একটি অপারেশন; সেই অপারেশন সূচনা করলো নতুন আরেকটি ষড়যন্ত্রের। দিলান মামুদের জীবনে দশ ঘন্টার এক বিভীষিকাময় অ্যাডভেঞ্চার। শ্বাসরুদ্ধকর গতির একটি থ্রিলার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে ব'সে বাতিঘর প্রকাশনীর বই পেতে চান ?

বাতিঘর প্রকাশনী পাঠকের সুবিধার্থে এবং স্বল্পমূল্যে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বি.পি (বুক পোস্ট) সার্ভিসের মাধ্যমে আপনার কাঙ্খিত বই পৌছে দেবে আপনারই ঠিকানায়। বইয়ের নাম এবং আপনার নাম আর আপনার ঠিকানা বাতিঘর প্রকাশনীর ঠিকানায় মোবাইল ফোনে মেসেজ ক'রে পাঠিয়ে দিন। তিন চার দিনের মধ্যে আপনার ঠিকানায় বই পৌছে যাবে।

বাতিঘর প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ বি.পি যোগে বইয়ের ক্রেতাকে ৩০% কমিশন দিয়ে থাকে।

এই সার্ভিস সমগ্র দেশব্যাপী চালু আছে।

বি:দ্রঃ বি.পি সার্ভিসের সমুদয় খরচ বাতিঘর প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ বহন করে থাকে, এজন্যে ক্রেতাকে কোনো ব্যয় বহন করতে হয় না, সুতরাং পোস্টম্যানকে বাতিঘর প্রকাশনীর বিল ছাড়া বাড়তি টাকা-পয়সা না দেয়ার জন্যে পাঠককে অনুরোধ করা হচ্ছে।

AMARBOI.COM

বাতিঘর প্রকাশনী

৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট, ৩য় তলা)
ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৭১৪৩৯১৩২০

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~